REG: No. C, 87.

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲। জুন। ১৩০৬, আষাঢ়।

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—নূতন বর্ষ, নাম-মাহাত্ম্য, লক্ষ টাকার কথা, অন্তিমে স্বপ্নাবসান, পিপাসার জল, দ্রব্যগুণ-বিচার, স্ত্রীজাতির গুণ, পতি-দেবতা, সদাই মনে রেখো, অগ্নি পরীক্ষা।

"ঋষি"-পত্রিকার নিয়ম।

১। "ঋষি" বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের "ঋষি" না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার জন্য আমরা দায়ী নহি। আকার (অন্যূন) ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা।

২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই কথাটীর উল্লেখ করিবেন।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা } { ১৩০৬ আষাঢ়। জুন।

নূতন বর্ষ।

ঋষির গতি—আমাদের এই পত্রিকার শুভারম্ভ বিগত ১৩০৫ সালের সেই আষাঢ় মাসে—দুরন্ত প্লেগ-দানবের সু-বিষম বিভীষিকার মধ্যে যখন চতুর্দ্দিকে লোক কেবলই হু হু-শ্বাসে পালাইতেছিল; দোকান-কারখানা সব বন্ধ; কম্পোজিটার অভাবে প্রায় সমস্ত প্রেস্ই অচল,—যখন লোকে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, আরব্ধ কার্য্যও সহসা-স্পৃষ্ট অগ্নিগর্ভ অঙ্গারের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিতেছিল, আজ এই পুনরাগত আষাঢ়ে বিশ্ব-পাতার প্রসাদে ইহার একবৎসর পূর্ণ হইল। গ্রাহকগণ অবশ্য জানেন——ঠিক্ মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট দিনে অব্যভিচারিত নিয়মে ভগবৎকৃপায় আমরা এই পত্রিকা খানি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। যদি কেহ ঠিক্ সময়ে পত্রিকা না পাইয়া থাকেন তবে সে ডাকঘর-সংক্রান্ত ত্রুটী বা অন্য দুর্দ্দৈবাধীন ঘটিয়া থাকিবে।

আমরা ঋষি পত্রিকার নিয়মাবলিতে লিখিয়াছি 'পত্রিকার আকার ৩ ফর্ম্মা হইবে'—কিন্তু কার্য্যকালে মধ্যে মধ্যে সাড়ে তিন ও ৪ ফর্ম্মা দিয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায় এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা গ্রাহকগণের অযাচিত অচেষ্টিত সুবহুল অনুগ্রহ পাইয়াছি,—ঋষি, মাসিক পত্রিকার চিরপ্রসিদ্ধ বিঘ্নপুঞ্জ ভেদ করিয়া নির্ব্বাধে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেন। ঋষির এই অবাধ গতির জন্য আমাদের মনে একটু শ্লাঘার সঞ্চার হয়; যেহেতু, এই চাকচিক্যময় বেশ-বিলাসের দিনে—আপাত-প্রমোদ-প্রিয়তার রাজত্বে—ভস্ম-ধূসরিত বিকট

জটা-বেষ্টিত বুড়া বিট্‌কেল ঋষির কথায় কয়জন কাণ দিতে চায়? ঋষি বাছ্‌-বাছা করিয়া নিমন্ত্রণ করিতেছেন বটে, কিন্তু খাইতে দিতেছেন ক্ষেতের সেই দিশি চাউলের অন্ন, পল্‌তার ডাল্‌না, আর ঘি-কাঁচকলা! তিনি না দেন রসগোল্লা, না রাব্‌ড়ী, না একটু রসালো চাট্‌নী। তথাপি সুখের বিষয়—অনেকে ঋষির সকম্প-প্রসারিত আশীর্ব্বাদোন্মুখ হস্তের অস্বাদু প্রসাদের ভক্ত হইয়াছেন।

বিষাদের কথা—কিন্তু তথাপি কালের এমনই দোষ যে, কোনও পরিচিত বন্ধুকে হয় ত বলিলাম "ভাই! আমাদের ঋষির গ্রাহক হও, বছরে একটাকা, মাসে সোয়াপাঁচ পয়সা বই ত নয়?" তিনি বলিলেন "আমার অনেক খরচ, একটাকা বছরে দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।" কিন্তু সেই বন্ধুকেই সময়ান্তরে দেখিলাম—থিয়েটার দেখিয়া তাহার কতগুণ বেশী পয়সা উড়াইতেছেন! আবার হয় ত, কোনও স্থলে মাসে মাসে কাগজ পাঠাইতেছি,—গ্রাহক বাবুর সব কথাই মনে থাকে, কিন্তু মূল্যের টাকাটী পাঠাইতে তিনি ভুলিয়া যান্‌—এ দুরদৃষ্ট মাসিক পত্রিকা মাত্রেরই। এই জন্যই মাসিক-পত্রিকা উঠিয়া যায়—তাই বলি, ধন্য নব্যভারত ও বামাবোধিনী—ধন্য রে তোদের কচ্ছপের আয়ুঃ!

আমাদের কাগজের আয়ুঃ—অনেকে আবার ইচ্ছাসত্ত্বেও গ্রাহক হইতে ভয় করেন; কেন না, তাঁহাদের আশঙ্কা যে, অন্যান্য মৃত পত্রিকার নজীরের অনুসারে কাগজ হয় ত উঠিয়া যাইবে। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে স্পর্দ্ধার সহিত সাহস দিয়া বলিতেছি—সম্পাদকের অকালে জীবনসমাপ্তি বা দুর্নিবার আধি-ব্যাধি ব্যতীত অন্ততঃ ১০ বৎসরের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ আমাদের কাগজ উঠিবে না। যেহেতু ইহাতে যে অকারাদি ক্রমে দ্রব্যগুণ বাহির হইতেছে, তাহা শেষ করিতে দশ বৎসর লাগিতে পারে। উহা শেষ করা সম্পাদকের বদ্ধমূল প্রতিজ্ঞা। দ্বিতীয়তঃ, এই পত্রিকা খানি কোন দূষ্য স্বার্থের জন্য করা হয় নাই। ইহা স্বকীয় ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের জন্য নহে। আর্থিক লাভের জন্যও নহে—লাভ হয়ও না। সম্পাদক চিরকাল যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়াছেন, ব্যবসায়ের কালেও সেই চর্চ্চা কথঞ্চিৎ রাখিবার জন্যই তাঁহার এই সূত্র অবলম্বন। সুতরাং কাগজের অকাল-বিলোপ না হইবারই সম্ভাবনা। তবে ইতঃপর ঈশ্বরের মনে কি আছে তাহা তিনিই জানেন।

ঋষির উদ্দেশ্য—শরীর ও মন প্রথমে এই দুটী জগৎপাতার নিকট হইতে পাইয়াই মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হয়—বিদ্যা ধনাদি পরের কথা। ঐ দুটীই যাবতীয় সুখ-দুঃখ গুণ-দোষের মূল ভিত্তি-স্বরূপ। এই দুয়েরই সদসৎ পরিণামের জন্য মানুষ "মালিকের কাছে" জবাবদায়ী হইবে। শরীরের সৎপরিণাম—স্বাস্থ্যগত, মনের সৎপরিণাম—ধর্ম্মগত। শাস্ত্রে বলে "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূল মুত্তমম্"। ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, আর মোক্ষই বল, সকলেরই মূল নীরোগতা। আরও উক্ত আছে 'এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যৎ তু গচ্ছতি॥' ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ যাহা নিধনেও সঙ্গে যায়। কিন্তু অন্য সকলই দেহ-নাশের সহিত নাশ-প্রাপ্ত অর্থাৎ সম্পর্ক-বিলুপ্ত হয়। ভাল হইবার ও ভাল করিবার কথা জানেন অনেকেই, কিন্তু সে সব জানিয়াও মানুষের মনে জাগরূক থাকে না। সে গুলি জাগ্রৎ রাখিবার একমাত্র সদুপায়—সাধুসঙ্গ। কিন্তু সকলের পক্ষে ত সাধুসঙ্গ সম্ভব হয় না, তজ্জন্য সাধুদিগের উক্তিগুলির সর্ব্বদা স্মরণ ও আলোচনাই তৎপক্ষে প্রশস্ত উপায়।

হঠাৎ হরিবোল বলিয়া সম্মুখভাগ দিয়া একটী শব লইয়া গেলে "আর পাপাচরণ করিব না" বলিয়া কতই না প্রতিজ্ঞা মনে উদিত হয়। কিন্তু সেই দেবভাবটী কতদিন থাকে? ধর্ম্মসভাতে কোনও উপদেশ-পূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা শুনিয়া সভা-ভঙ্গ কালে লোক-সমুদয় যখন বহির্গত হইতে থাকে, তখনও কতজনের মনে (পূর্ব্বের মত) কত ভাবুকতা ও কত ধর্ম্ম-প্রবণতা উদিত হয়। কিন্তু সেই ভাবটীই বা কতদিন স্থায়ী হইয়া থাকে? ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষ যতই কু-প্রবৃত্তির দাস হউক না কেন, সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজক সুতীক্ষ্ণ কথাগুলি কর্ণগোচর হইলে মন একটু না একটু নিশ্চয়ই টলিয়া যায়! কিন্তু তত্তৎ বিষয়ের বিস্মৃতি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ (এবং ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত।) এক কথায় সংসার-ক্ষেত্রে পরিধাবিত, বিষয়-ব্যাকুলিত মানবের সমক্ষে কোন না কোন স্মারক পদার্থ মধ্যে মধ্যে উপনীত হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ সোজা কথায় মানুষকে পুনঃ পুনঃ "তাগাদা" না করিলে কখনই সেই অপরিহার্য্য বিস্মৃতির প্রতিবিধান হইতে পারে না। আমাদের এই পত্রিকাখানি ঐরূপ মাসে মাসে তাগাদা করিবার জন্যই দ্বারে দ্বারে উদিত হইতেছে।

এই এক বৎসর তাগাদায় যদি একজনের মনও উদ্বোধিত ও পবিত্রতার দিকে উন্মুখীকৃত হইয়া থাকে, তবে আমাদের ব্যয় ও শ্রমের যথেষ্ট সার্থকতা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ঋষির প্রবন্ধ—কলিকাতা ও মফস্বল হইতে অনেকে আমাদিগকে লেখেন "মহাশয়! ঋষিতে ধর্ম্মের কথা আর একটু বাড়াইয়া দিন, শুঁঠ, পিপুল মরিচের কথা পড়িয়া কি হইবে?" কেহ বলেন "ধর্ম্মাধর্ম্মির কথা অনেক শুনা আছে, উহাতে প্রয়োজন নাই, আয়ুর্ব্বেদের কথা বেশী করিয়া লিখুন।" কেহ বা লেখেন উহাতে বেশ মিঠা মিঠা গল্প নভেল দিয়া পাঁচ ফুলের সাজী করুন, যেমন অন্যান্য কাগজে দেখিতে পাই।" কিন্তু আমরা জানি, একসঙ্গে সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা বৃথা, সুতরাং আমাদের কাগজের যে সুর, তাহাই থাকুক। বলি, যদি নভেল খুঁজিতে হয়, তবে ত ওরূপ কাগজের অভাব নাই, সব কাগজেই ত সেই এক সুর।

আর আজ কাল যে সমস্ত নিত্য নূতন মাসিক পত্রিকা উদিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশেরই মধ্যে প্রায়শঃ এইরূপ সকল বাজে কথাই লেখা থাকে, যথা—"নাচন্ত নগরে গোবর্দ্ধনকান্ত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার তিনটী পুত্র—নগেন্দ্র, বগেন্দ্র ও জগেন্দ্র এবং তিনটী কন্যা—এ-বালা, ও-বালা আর সে-বালা। কন্যা তিনটী ক্রমে বয়ঃস্থা হইল। সেই বাড়ীর কাছে এক প্রতিবেশীর বাড়ী—সেই বাড়ীতে রসরাজ নামে একটী যুবক ছিল, ক্রমে এতে-ওতে চোখো-চোখি, দেখা দেখি, লেখা-লেখি, মাখা-মাখি, হতাশ! নৈরাশ!! ইহি-ইহি!! উহু-উহু!!! কত কি ঘটন-রটন হইয়া গেল!"—বলুন্ দেখি, এমন সব বাজে কথা শুনিয়া, কবে কাহার স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা হইবে?

একটু বিশেষত্ব—এই পত্রিকায় অভূতপূর্ব্ব রীতিতে অকারাদি ক্রমে দ্রব্য গুণ লিখিত হইতেছে—বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই বলিতেছেন এরূপ সুবিস্তীর্ণ দ্রব্যগুণ এ পর্য্যন্ত কুত্রাপি লিখিত হয় নাই—ইহাতে দ্রব্যের দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম, উৎপত্তি-স্থান, আকৃতি-নিরূপণ, বিচার দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন, পাশ্চাত্য পরীক্ষায় নির্ণীত গুণান্তর, রসবীর্য্যাদি তত্ত্ব, প্রয়োগবিধি ও প্রচলিত লৌকিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতি এক একটী গাছ গাছড়া সম্বন্ধে যত্‌কিছু জানিতে পারা যায় তৎসমস্তই লিখিত হইতেছে। প্রত্যেক গাছ গাছড়া ঘটিত যে

সকল নানা মুষ্টিযোগ লিখিত হয়—সে' গুলি স্ত্রীলোকেরা জানিয়া রাখিলে কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজকে ডাকিতে হয় না, তদ্দ্বারা গৃহস্থালীরও অনেকটা সাশ্রয় ও শান্তি হইতে পারে।

শেষ প্রার্থনা—এই পত্রিকা সকলেরই প্রয়োজনীয়—সকলেই ইহার গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন। সদুক্তি বা সুনীতির কথা যাঁহাদের ভাল লাগে না, আমাদের করপুটে নিবেদন—তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে ইহার গ্রাহক হউন্; যেহেতু অনিচ্ছাক্রমে চোক বুলাইতে বুলাইতেও যদি দু-একটী কথা মনে লাগিয়া যায়, তবে অপ্রিয় তিক্ত ঔষধের ন্যায় পেটে গিয়া নিশ্চয়ই গুণ দিবে—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রাহকগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া ও যথাযোগ্যস্থানে স্নেহাশীর্ব্বাদ দান করিয়া পুনরায় নববর্ষের কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হইলাম। জগদীশ্বর আমাদিগকে স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা দিন।

নাম-মাহাত্ম্য।

ভাই ভাইএ বিবাদ চিরকালই আছে। শুধু আজকালকার ছেলে পিলেদের ভিতর নয়—শুধু অল্পবুদ্ধি মানুষের ভিতর নয়, যুগযুগান্তর পূর্ব্বে দেবতাদিগের মধ্যেও এই বিবাদ দেখা যায়। সে বহুদিনের কথা—যে কথা বলিব মনে করিয়াছি—সে বহুকাল পূর্ব্বের কথা। এক দিন শিবের মালা লইয়া কার্ত্তিক ও গণেশে বিবাদ বাধিয়াছিল। শিব—ভোলা মহেশ্বর—যেখানে যা পান, তাই লইয়াই তাঁর আনন্দ। জানি না, কি জন্য, কি কাজে লাগে তাও জানি না, বিবাদ সেই হাড়ের মালাছড়াটী লইয়া। অনেক শ্মশান ঘাঁটিয়া, হাড় সংগ্রহ করিয়া, পাগল মহেশ—"পাগল" কিনা তাই—শ্মশান হইতে কতকগুলি হাড় কুড়াইয়া মালা গাঁথিয়া আপনার গলায় ধারণ করিয়াছেন। ছেলে দুজনের মধ্যে সেই মালা ছড়াটীর জন্য বিবাদ। তারা শুনিয়াছে যে, সেই মালা ছড়াটীর শক্তি না কি অনন্ত। অনন্ত গুণ যে কি, তা' পাগল ভোলা বোঝেন, আর তাঁর ছেলে দুটী তাঁর কাছে না কি শুনিয়া বুঝিয়াছে। গুণ যাই হোক, তারা কিন্তু আর বোধ মানে না, এ বলে আমার

চাই, ও বলে আমার চাই। শিবের প্রবোধ-বাক্য আর তাহাদিগকে থামাইতে পারে না—শিবও বিব্রত ; কারে রাখিয়া কারে দেন, স্থির করিতেই পারিলেন না। তথন তিনি বসিয়া একটা মতলব স্থির করিলেন ভাল। "পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আজ যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, এই মালা তাহারই প্রাপ্য"। হুকুম শুনিয়া কার্ত্তিক আমোদে আটখানা। তাহার বাহন ময়ূর, বায়ুবেগে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিবে। আর গণেশ ইঁদুরে চড়িয়া কত দিনে যাইবে ?

কার্ত্তিক সহাস্যবদনে তৎক্ষণাৎ তীর্থযাত্রায় বাহির হইল, কিন্তু গণেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। খানিক পরে গণেশ আর সে গণেশ নাই। সে যেন তীর্থ-ভ্রমণের জন্য কি এক আশ্চর্য্য বাহন পাইয়াছে। কিন্তু কৈ তার ত যাত্রার কোন উদ্যোগই দেখিতেছি না ! তবে হইল কি ?

এখন গণেশ আর সে ভাবে বসিয়া নাই ত ! দু'হাতে খোল ও দু'হাতে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন—যে নামে মহেশ পাগল, নারদ বৈরাগী সাজিয়া গান গাহিতে গাহিতে বিভোর—বাহ্যজ্ঞান শূন্য, চৈতন্য চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সহধর্ম্মিণী, বৃদ্ধা জননী ও সমুদায় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী, একদিন যে নামের তরঙ্গে গঙ্গা উজান বহিত, পশুপক্ষী নীরব নিস্তব্ধভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া থাকিত, পাষাণও দ্রবীভূত হইত—সেই হরিনাম, সেই মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছে। স্নান নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, বেলার দিকে লক্ষ্য নাই, বাহ্য জ্ঞান নাই—মুখে কেবল 'হরিবোল' 'হরিবোল'। গণেশের সেই সরল প্রাণের মধুর হরিবোল-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত, তাহার সেই উদ্দণ্ড নৃত্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত।

দিবা অবসান প্রায়। গণেশ বাহ্যজ্ঞানহীন। কার্ত্তিকের সঙ্গে দেখাই নাই। গণেশের হরিধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত। মহেশ্বর মহাভাবে বিভোর—আর থাকিতে পারিলেন না, দৌড়িয়া গিয়া গণেশকে কোলে তুলিয়া লইলেন, আর বারম্বার মুখচুম্বন করিয়া, আপনার সেই অতি যত্নের ধন—শিবের সেই সর্ব্বস্ব সেই মহা-শক্তি মালা গাছটী গণেশের গলায় পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, বৎস ! তোমার তীর্থ পর্য্যটন অনেকক্ষণ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আজ আমি তোমারি মত পুত্ররত্ন পাইয়া ধন্য হইলাম। ধন্য জগন্মোহন হরিনাম, ধন্য হরিনামের অনন্ত শক্তি। আজ একমাত্র হরিনাম প্রভাবে গণেশ জয়ী—কর্ম্মফল নাম-বলের নিকট পরাস্ত।

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥

শ্রীগুরুপদ যোগবিশারদ।

লক্ষ টাকার কথা।

গুরু-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-রচিতম্)

শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
মনশ্চের লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

থাকুক সুন্দর রূপ, সুন্দরী রমণী,
মেরুতুল্য ধন, কীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী,
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
মনশ্চের লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

থাকুক কলত্র পুত্র পৌত্র বহুধন,
থাকুক সুন্দর গৃহ, আত্মীয় স্বজন,
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
মনশ্চের লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

থাকুক ষড়ঙ্গ বেদ মুখে অনিবার,
থাকুক সামর্থ্য গদ্য পদ্য লিখিবার,

গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

থাকুক স্বদেশে আর বিদেশেও মান,
থাকুক মহতী নিষ্ঠা সদা বিদ্যমান,
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

ক্ষমামণ্ডলে ভূপভূপালবৃন্দৈঃ সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

এই ভূমণ্ডলে যত রাজরাজেশ্বর
সেবা করে পাদপদ্ম যাঁর নিরন্তর,
সেই গুরু-পাদ-পদ্মে না রহিলে মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

যশো মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপাৎ জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎপ্রসাদাৎ।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

যাঁহার কৃপায় নিত্য বহুদান করি
ছুটিয়াছে যশ মোর দশদিক্ ধরি,
জগতের উপাদেয় সামগ্রী-সকল
যাঁহার কৃপায় মোর করে অবিরল,
সেই গুরু-পাদ-পদ্মে না রহিলে মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

যোগ ভোগ অশ্বগণ থাকুক আমার,
থাকি বা নারীর সুখে মত্ত অনিবার,
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

অরণ্যে ন বা স্বস্ত গেহে ন কার্য্যে ন দেহে মনো বর্ত্ততে মে ত্বনর্ঘ্যে।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

কিবা গেহে, কিবা দেহে, কিবা বনে আর
কিম্বা কার্য্যে নাহি যায় হৃদয় আমার।
অমূল্য গুরুর পদে না রহিলে মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্ সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

রত্ন-ভোগ-সুখে ছিনু উন্মত্ত হইয়া,
যামিনী কাটায়ে দিনু কামিনী লইয়া।
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী যতি র্ভূপতি র্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেদ্ বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্॥

কিবা পুণ্যবান্ জন, কিবা আর যতি,
কিবা গৃহী, ব্রহ্মচারী, অথবা ভূপতি,
গুরু বাক্যে যদি তাঁর নিত্য রহে মন,
এ স্তব করেন পুনঃ মুখে উচ্চারণ,
তাঁহা হ'লে মহা-পুণ্য এই শ্লোকচয়,
ব্রহ্মপদ মিলাইয়া দিবেক নিশ্চয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি এ।

অন্তিমে স্বপ্নাবসান।

এ কি স্বপ্ন দেখিলাম! তরঙ্গিত হৃদয়ের তরল লহরীলীলা অন্ধকার করিয়া সেই সুখ-শশী কোন্ জলদজালে মুখ লুকাইল? এত আঁধার! এত নির্জ্জন! এত নীরবতার রাজত্ব! এখানে কেহ নাই—আমি একা। এই অন্ধকার রূপ পাষাণ-প্রকোষ্ঠে আমি একা। সঙ্গীহারা পথিকের মত পথ খুঁজিতে খুঁজিতে

কোথায় চলিয়া যাই, ভগ্নহৃদয় প্রণয়ীর মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, শরতের মেঘের মত উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া যাই। আমার স্মৃতি বলিয়া দেয়—আমি একা। ঐ যে স্বর মিলাইয়া যায়, ঐ যে স্বরতরঙ্গের শীকরস্থলভ শৈত্যের মত "হরিধ্বনি" মিলাইয়া যায়, উহা কেমন মধুর! কেমন মনোমদ! কত মধুর গীত শুনিয়াছি, কত বেণুবীণার স্বরতরঙ্গে তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছি, কিন্তু এমন মিষ্ট স্বর ত কোথাও শুনি নাই। ধ্বনি গো, জাগিয়া থাক, এই নীরব নিঃসঙ্গ প্রাণের অন্তরালে থাকিয়া, তরঙ্গিত হইয়া উঠ, "বল হরি হরি বোল"।

এ বার সকলই নীরব হইল। সকলই মিলাইল। এখন আমি একা। আলোকময় উপকূল পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে যেন দিশাহারা সাগরবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছি। সব আলোকই অদৃশ্য, সব স্মৃতিই বিলীন; কিন্তু একটী আলোক যেন মিশাইতে চায় না, কে যেন একটী স্বরকে ভুলিতে দেয় না,—"বল হরি হরিবোল"। কে জানে কেন এই স্বর সদাই কাণের কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদাই প্রাণের দুয়ারে গিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করে। সে স্বপ্নময় রাজ্যের স্বপ্নময়ী কারামুক্তির শেষ দিনে, কি মধুর স্বরই আমাকে মাতাইয়াছে,—"বল হরি হরি বোল"

কে জানে ও নামের ভিতর কি আছে। এই যে এত আঁধার, এই যে এত অবসাদ, ঐ নাম যেন তাহাদের ভিতর বিজুলী খেলাইয়া গেল। এ অশরীরী শরীরে যেন বল পাইলাম। এই অশরণ জীবনে যেন আশ্রয় মিলিল। জীবন্ত পাপের মূর্ত্তি জলধর, ইন্দ্রধনু ধরিয়া, ঈর্ষাবশে যখন হিমাদ্রির হৈম কিরীট আক্রমণে উদ্যত হয়, তখন গিরিরাজ অগ্নিময় বিদ্যুৎবাণে তাহাকে বিদ্ধ করেন। মেঘ কাঁদিতে কাঁদিতে গগণ-প্রাঙ্গনে মিশাইয়া যায়। পাপপুষ্ট ক্ষুদ্রজীব সেইরূপ হরিনামের সুতীক্ষ্ণ শরে আত্মহারা হইয়া পড়ে, সেই অপার অমৃত-সাগর-বক্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকার মত, দুর্ব্বল পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিয়া যায়। ভাসিয়া কোথায় যায় কে জানে? কে জানে সে কোন্ তরঙ্গাঘাতে মরিতে মরিতে অমৃতস্পর্শে আবার অমর হইয়া উঠে।

আমি মরিয়াছিলাম, কিন্তু অমর হইয়াছি সেই নাম শুনিয়া "বল হরি হরি-বোল"। আমি ক্ষুদ্র জীব ছিলাম, কিন্তু শিবত্ব লভিয়াছি সেই নাম শুনিয়া

"বল হরি হরিবোল"। যাহার নামের এত গুণ না জানি সে কেমন! সে বাঁশীর মত কঠোর, কিন্তু তাহার স্বরের মত কোমল। সে বিরহের মত দাহক, কিন্তু বিরহীর মত ব্যাকুল। সে চাঁদের মত সুন্দর, কিন্তু কলঙ্কের মত কৃষ্ণ। সে মনের মত চঞ্চল, কিন্তু ধ্রুবের মত স্থির। আমি তাহাকে ভালবাসি কি না জানি না কিন্তু সে আমাকে ভাল বাসে। ভালবাসা কথাটী কি মধুর! এ কি মায়া না আর কিছু? মায়া বলিলে সংসার বুঝায়— মায়া ও স্বপ্ন একই কথা। স্বপ্ন বর্ত্তমানে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে অসার। কিন্তু ভালবাসা? ভালবাসা স্বপ্ন নয়—অমর্ত্ত্য জাগরণ। ভালবাসা ভগবানের জীবন্ত অনুগ্রহ। সেই আমার প্রাসাদের কথা মনে নাই, কিন্তু সোহাগিনীর কথা মনে আছে। সে আমায় ভাল বাসিত, প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত, প্রাণের প্রাণ প্রেম দিয়া ভাল বাসিত। প্রেম কি অমূল্য রত্ন ভাই! কাহার সহিত প্রেমের তুলনা দিব? রূপ? এ দরিদ্র ত কেবল নেত্রের দ্বারে ভিখারী; যদি নেত্রের কপাট বন্ধ করিয়া দি, তবে তাহার গরিমা আকাশেই ভাসিয়া যায়। বিষয়পঙ্ক, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারস্থ হইয়া মনকে চুরি করিতে কত রূপই ধারণ করে। কিন্তু প্রেম? বাহিরে ভিতরে—ভিতরে বাহিরে একই রূপ। প্রেমিক রাবণ যে দিকেই চাহে, সেই দিকেই রামমূর্ত্তি, চোক বুজিতে চায়, সেখানেও সেই রাম। শেষে সে রাম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, সন্তরণে শান্তির পারে উঠিল। প্রেম ও ভালবাসা একই পদার্থ। সে আমায় ভালবাসে আমি তারে ভালবাসি, "বল হরি হরিবোল।"

এই শেষ দিনে, অভিনয়ের এই শেষ অঙ্কে, একবার উচ্চৈঃস্বরে "বল হরি হরিবোল"। কোলাহলময়ী ধরিত্রীর মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া, যে ব্যোমযান অকূল শূন্যপানে, অপরিচিত সুখ দুঃখের আলোকান্ধকারে ছুটিয়াছে, একবার তাহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া গগণস্পর্শী স্বরে, বন্ধুবান্ধবগণ! "বল হরি হরি বোল"।

নেত্রের সলিল নেত্রে সংবরণ করিয়া, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে বাঁধিয়া, সাবিত্রীর সিন্দূর ললাটে পরিয়া, পতিসোহাগিনি! উচ্চৈঃস্বরে "বল হরি হরি বোল।" নাড়ীর বন্ধন অনেক দিন ছিঁড়িয়াছে, প্রাণের পিঞ্জরে অনেক দিন পুষিয়াছ, মৃত্যুর শঙ্কায় অনেকবার কাঁদিয়াছ, এখন মা, স্নেহের বন্ধন কাটিয়া

"বল হরি হরিবোল"। পিতার পা ছাড়িয়া দাও, আদরের দড়ি দিয়া আর বাঁধিও না। শিশু, মায়ের কোলে উঠিয়া "বল হরি হরিবোল।" অশ্রুজলে চিতা নির্ব্বাণ করিয়া "বল হরি হরিবোল।" গঙ্গার সলিল গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া "বল হরি হরিবোল"। এই সংসার রূপ শ্মশানের সুখময়ী চিতা-শয্যায় শয়ন করিয়া শয়নে স্বপনে জাগরণে "বল হরি হরিবোল"।

(এখন) সাধের স্বপন ভাঙল রে ভাই কোন্ দিকে ধাই
পাই না ভেবে।
বল হরিবোল বল হরিবোল, হরি বিনে কূল
আর কে দেবে।
(এখন) থেমে গেছে মায়ার বাঁশী, থেমে গেছে আশার হাসি,
নৌকা আশে যাচ্চি ভেসে, কাণ্ডারী কি তুলে নেবে।

শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্থ।

পিপাসার জল।

সে অনেক দিনের কথা। আমি আর বড় দাদা এক সঙ্গে থাকি। এক দিন রবিবার; দাদার আফিস বন্ধ। কিন্তু তাতে কাজের কামাই নাই। এক তাড়া আফিসের কাগজ বড় দাদার শয়নঘরে জমা। বেলা দুই প্রহর; চৈত্র মাসের সূর্য্য একেবারে মাথার উপর অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন সেই প্রখর রৌদ্রের জ্বালায় কাতর হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের সাড়া শব্দ নাই; কোন্ এক যাদুকরের মোহিনী মায়ায় যেন সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ হইয়া আছে। দ্বিপ্রহর সময়ে দাদা তাঁর আফিসের কাগজ পত্র খুলিয়া বসিয়াছেন; সরকারী কর্ম্মচারীর আর শনিবার রবিবার নাই।" বড় বৌদিদি সুতরাং দাদার কাছে আসর জমাইতে না পারিয়া পাঁচ বৎসরের মেয়ে সুরোকে লইয়া আমার স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিলেন। মেয়েটী আমার কাছে শয়ন করিয়া নানা প্রকার সৃষ্টিছাড়া প্রশ্ন জুড়িয়া দিল; সে সকল

প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। আমি তার কথার কোনটার বা উত্তর দিতেছি, কোনটা বা 'জানি না' বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন সময়ে আমাদের বাড়ীর পাশেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিগের বাড়ীর উঠানের চাঁপাগাছ হইতে একটা পাখী সেই নীরব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাকিয়া উঠিল—'ফটিক্ জল।' সুবিশাল আকাশমার্গ সেই পাখীর শব্দে যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমন একটা ব্যাপারের উপর প্রশ্ন করিবার জন্য সুযো প্রস্তুত হইল। মাথা তুলিয়া দুই একবার পাখীর করুণ কণ্ঠের 'ফটিক জল' শুনিয়া আমার সেই স্নেহময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রশ্ন করিয়া বসিল 'পাখী কি বলে।' আমি বলিলাম 'ফটিক্ জল'। তাহার পর প্রশ্ন 'কেন বলে?' এ প্রশ্নের উত্তর আমার জ্ঞানভাণ্ডারে ছিল না; সুতরাং বালিকার এ কথার উত্তর দিবার জন্য বড় বৌদিদির শরণ লইতে হইল। তিনি তখন এক অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা জুড়িয়া দিলেন। তাহার মর্ম্ম মোটামুটী এই যে, এক বাঘিনী শাশুড়ী পুত্রবধূকে বড়ই কষ্ট দিত। এক দিন শাশুড়ী-বউ দুই জনে ধান ভানিতে ছিলেন, এমন সময়ে বধূর জলতৃষ্ণা পাইল; বধূ ভয়ে ভয়ে শাশুড়ীর নিকট একটু জল খাইতে যাইবার অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। শাশুড়ী মনে করিলেন, বউ বুঝি একটা ওজর করিয়া বিশ্রাম করিবার ফন্দী করিল, তাই তিনি রাগে অধীরা হইয়া বৌকে একটা ঠোনা মারিলেন। বউ অমনি ঢলিয়া পড়িল, তাহার প্রাণবায়ু তৃষ্ণার জ্বালায় পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে যখনই বড় রৌদ্র হয়, তখনই সেই পাখী 'ফটিক জল' বলিয়া কাতরকণ্ঠে তাহার গভীর তৃষ্ণার কথা ঘোষণা করে। গল্পটা বেশ। কিন্তু যাহাকে শুনাইবার জন্য, যাহার প্রশ্নের উত্তরের জন্য বৌদিদি এই গল্পের অবতারণা করিয়া ছিলেন, সেই প্রশ্নকর্ত্রী তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; আমারও একটু ঘুমের ঘোর হইয়া ছিল। বড় বৌদিদি এমন অসভ্য শ্রোতৃবৃন্দের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আমার কক্ষ ত্যাগ করিয়া আবার দাদার কক্ষদ্বারে উমেদারী করিতে গেলেন।

আবার সমস্ত গগণ শব্দিত করিয়া পাখী ডাকিল 'ফটিক জল'। আমার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল, আমি সুধুই শুনিতে লাগিলাম সেই আর্ত্তস্বর, সেই

তৃষাতুরের আকুল আবেদন! পাখীর কথা ভুলিয়া গেলাম। আমার মনের মধ্যে আর একটী হৃদয়ভেদী দৃশ্য জাগিয়া উঠিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের প্রতিবেশী। তাঁহারই চাঁপাগাছ হইতে সেই করুণ আর্ত্তনাদ আসিতেছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার একমাস পূর্ব্বে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে এক অতি শোচনীয় ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, তাঁহার বয়স প্রায় ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সংসারে কেবল তাঁহার বিধবা ভগিনী রঙ্গিণী, তাঁহার স্ত্রী, এবং তাঁহার ৪টী শিশু সন্তান, এবং সেকেলে একটা বুড়ো চাকর, নাম—গদা। স্ত্রীটী দ্বিতীয় পক্ষের, কর্ত্তার প্রাণের অমূল্যনিধি, তুলো জড়ান বাক্স-বন্ধ মনক্কাবৎ আদরের ধন! আর রঙ্গিণী?—তাহার মত দুঃখিনী জগতে নাই। সংসারের সমস্ত কাজের ভার তাহারই ঘাড়ে, অথচ পরণে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, মরিলে 'আহা' বলিবার লোক নাই! রঙ্গিণী সারাদিন খাটিতে খাটিতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া যখন মরু-বায়ুর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তখন সে নিশ্বাসের প্রতিধ্বনি আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, হয় কেবল বৃদ্ধ গদার ছলছলায়িত বয়োদগ্ধ আঁখি দুটীতে। কেননা গদাধর রঙ্গিণীকে রাঙ্গা খুকী, অরক্ষণীয়া আইবড় মেয়ে এবং পরগৃহলক্ষ্মী—এই তিন অবস্থাতেই দেখিয়াছে—এবং এক রকম নিজ হাতেই মানুষ করিয়াছে। খুব বড় লোকের ঘরেই রঙ্গিণীর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধে পবকুলের সম্বল হারাইয়া আজ সে উদরান্নের জন্য ভ্রাতার গলগ্রহ।

গদা ছেলে বেলার রাঙ্গা খুকীকে এখন রাঙ্গাদিদি বলে, নিশীথকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে ঐ বৃদ্ধ ভৃত্য তাহার রাঙ্গাদিদির সম্বন্ধে কোন কোন দিন এই রূপ ভাবে—আহা এমন রূপ! এই কচি বয়েস! সবে এই ষোল বৎসর! এখনও জীবনের অনেক দিন বাকী আছে, এত কষ্টে দিদির কিরূপে কাটিবে? যাই, কলিকাতায় লইয়া যাই, শুনিয়াছি আমাদের মেজ খোকা যার [illegible]ড়ে (বর্ণ পরিচয়), সে না কি বিধবাদের কষ্ট নিবারণের জন্য কি [illegible] করিয়াছে। তার কাছেই এই হতভাগিনীকে পঁহুছাইয়া আসি। [illegible] ভাবে, ও কি কথা! এ যে বড় সর্ব্বনেশে কথা! ব্রাহ্মণের ঘরের

বিধবা! আর আমি বলিতেছি কি? গদা ভাবিয়া ভাবিয়া শেষ মীমাংসা এই টুকু করে যে—অন্তিম শান্তিনিদান মৃত্যুর কোল ছাড়া রঙ্গিণীর আর জুড়াইবার স্থান নাই। বৈশাখ মাস। ছোট খোকার অন্নপ্রাশনের দিন উপস্থিত। মুখুজ্জে মহাশয় এই সূত্রে গ্রামের দশজন ভদ্রলোককে খাওয়াইবেন। তাই আয়োজন হইতে লাগিল, কিন্তু ব্যাপারবিধানে খাটিবে কে? মুখুজ্জে ঠাকুর পৃথিবীর সব স্ত্রীলোককেই বড় ঝঁগ্‌ড়াটে মনে করেন; তাঁহার স্ত্রী এমন শান্ত সুশীলা ভাল মানুষ; অথচ পোড়া পাড়ার লোক বা অন্ত আত্মীয়া কুটুম্বিনী—ইহার সহিত মিলিয়া-মিশ্রিয়া দুদণ্ডও কাটাইতে পারে না। তাই ঠাকুর মহাশয় মনে করিলেন, কোনও স্ত্রীলোককে বাড়ীতে আনা হইবে না। কাযের লোকের ভাবনা কি? রঙ্গিণী ত ষাঁড়ের মত শক্ত, সে আছে কিসের জন্ত।, সব কাজ সেই করিবে। আর গদা পুরোনো ইট, একাই দশ জনের তুল্য, আর বাজে লোকের আবশুক কি?

এইবার গদা ও হতভাগিনীর হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পালা পড়িল—(আর কবেই বা না পড়ে?) রঙ্গিণীর দু তিন দিন আগে জ্বর হইয়াছিল, সবে অন্ন পথ্য করিয়াছে। আবার দৈবক্রমে অন্নপ্রাশন একাদশীর দিনে পড়িয়াছে। মুখুজ্জে মহাশয়ের বাড়ী দু তলা, অতি পুরাতন, সিঁড়ি উঁচু নীচু, ইট বাহির করা; উঠানে রান্নাঘর দুখানা ঘর পরস্পর হইতে অতি দূরে দূরে। দু এক বার যাতায়াত করিলেই পাহাড় ভ্রমণের পরিশ্রম অনুভূত হয়। রঙ্গিণী একাকিনী এই সীমার মধ্যে উপর-নীচে ছুটাছুটী করিতে করিতে সারাদিন পরে তৃষ্ণার্ত্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া ভূমিশায়িনী হইল। জ্বর আবার ফুটিল। একাদশীর উপবাস, তায় ভয়ানক খাটুনী, তার উপরে সর্ব্বদেহদহনকারী উত্তাপ। ভয়ানক পিপাসা! জ্বরের ঘোরে রঙ্গিণী বলিয়া উঠিল তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গেল—একটু জল দাও! ওগো তোমাদের পায়ে ধরি একটু জল দাও।

তৃষাতুরের এই মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদ শুনিয়া গদাধর জল দিবার জন্ত ঘটী হাতে করিয়া ছুটিল। এ দিকে মুখুজ্জে মহাশয়ের সেই অগ্নিরূপিণী ঘরণী পেছন হইতে রঙ্গিণীর চুল টানিয়া বলিল—ওরে কালামুখী কুলটা, একাদশীর দিনে জল খাওয়া কি না? চণ্ডালিনী তুই কি আমাদের নিকলঙ্ক কুলে কালি দিবি?

গদা আসিয়া দেখিল—জল খাবার লোক ফুরাইয়াছে! পিপাসা-প্রজ্বলিত দেহে প্রাণ-পাখী থাকিতে না পারিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। গত তিরস্কারের শেষাংশ গদার ঘাড়েই পড়িল। গদা চোখ মুছিতে মুছিতে সরিয়া গেল।

দিনে দিনে সে সব কথা ভুলিয়া গেলাম কিন্তু আজ এই দ্বিপ্রহরে যখন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চাঁপা গাছের মধ্য হইতে পাখী ডাকিয়া উঠিল 'ফটিক্ জল' তখন সেই এক মাস পূর্ব্বের হৃদয়ভেদী দৃশ্য আমার নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হইল। আমি শুধুই শুনিতে লাগিলাম হতভাগিনী রঙ্গিণী বলিতেছে—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গেল, একবিন্দু জল দাও, জল দাও। আমার মনে হইতে লাগিল পাখী আর কেহ নহে, পাখী সেই রঙ্গিণী। আজ এই রৌদ্র-তাপে তাপিত হইয়া কাতরকণ্ঠে নিষ্ঠুর স্বজনের কাছে প্রার্থনা করিতেছে 'ফটিক্ জল'। চম্পক বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রের অন্তরাল হইতে যেন সেই তৃষাতুরের আবেদন স্বর্গপথ বিদীর্ণ করিয়া উঠিতেছে 'ফটিক্ জল'। পাখীর কথা ভুলিয়া গেলাম; শুধু দেখিতে লাগিলাম—ব্রাহ্মণকন্যা বালিকা রঙ্গিণী একবিন্দু জলের জন্য ছট্ ফট্ করিতেছে আর বলিতেছে 'ফটিক্ জল'। কি হৃদয়ভেদী সেই স্বর! এখনও আমার মনে আছে। এখনও যদি কোন দিন নিঝুম দ্বিপ্রহরে আকাশমার্গ বিদীর্ণ করিয়া পাখী ডাকে 'ফটিক্ জল', তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণের ভিতরে সেই লুকান বেদনা জাগিয়া উঠে, রঙ্গিণীর সেই তৃষাকাতর মলিন মুখ আমার মনে পড়ে, সেই দীননয়নে একবিন্দু জলের জন্য কাতরতা মনে পড়ে, আর শরীর শিহরিয়া উঠে!

তখন ভাবি—এ কাতরকণ্ঠ কি শুনিয়া ব্যথিত হইবার কেহ নাই? এ দুঃখকাহিনী কি ব্যোমবায়ুতেই মিলাইয়া যায়? কখনই নহে। ইহার অবশ্য শ্রোতা আছে। উপরে বসিয়া এক জন নিত্য নিত্য দুঃখীর আর্ত্তনাদের হিসাব রাখিতেছে।

শ্রীজলধর সেন।

দ্রব্যগুণ-বিচার।

ঈশ-লাঙ্গলা।

বাঙ্গালা নাম—ঈশলাঙ্গলী বা বিষলাঙ্গলা; হিন্দী—করিহারী; ইংরাজী—Gloriosa Superba or Aconitum napellus. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি। বিশল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিবক্ত্রা চ গর্ভনুৎ॥ সংস্কৃত নাম—কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিবক্ত্রা, গর্ভনুৎ। এতদ্ব্যতীত ইহার এই কয়টী নাম দৃষ্ট হয়—বিদ্যুজ্জ্বালা, ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা, অগ্নিমুখী, ঈশ্বরী।

লতা-গাছ হয়, ক্ষুদ্রাবস্থায় স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকে, বড় হইলে অন্য বৃক্ষকে আশ্রয় করে। ইহার পাতা খাট-চওড়া বাঁশপাতার মত, তদপেক্ষা মোটা ও নরম, এবং ফিঁকে সবুজ। আদার পাতা গুলি যেরূপ ডাঁটার দুইপাশ হইতে উঠিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উর্দ্ধে সাজানো থাকে, ইহারও প্রায় সেইরূপ। ইহার ফুল লালবর্ণ, দেখিতে বড় সুন্দর—কতকটা অশোকফুলের মত, কিন্তু তদপেক্ষা একটু বড়; ইহার মূল মোটা শতমূলীর মত, কিন্তু শতমূলী যতদূর শাদা এবং যেরূপ ক্রমে অত্যন্ত সরু হইয়া যায়, ইহা সেরূপ নহে, এক খণ্ড হরিদ্রা বা আদা ঈষৎ বাঁকা হইয়া ৮।১০ অঙ্গুলি লম্বা হইয়া জন্মিলে যেরূপ আকৃতি হইত, ইহা প্রায় তদ্রূপ; ঔষধার্থ এই মূল ব্যবহৃত হয়। ইহা এক-জাতীয় বিষ। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নয় বলিয়া শাস্ত্রে এই জাতীয় বিষের নাম উপবিষ। "অর্ক" দেখুন।

> কলিহারী সরা কুষ্ঠশোফার্শোব্রণশূলজিৎ।
> সক্ষারা শ্লেষ্মজিৎ তিক্তা কটুকা তুবরাপি চ॥
> তীক্ষ্ণোষ্ণা ক্রিমিহৃল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী॥

রস—ক্ষার-তিক্ত-কটু-কষায়; বিপাক—কটু, বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—লঘু, শ্লেষ্মহর, পিত্তকর, তীক্ষ্ণ, কুষ্ঠ শোথ অর্শঃ ব্রণ ক্রিমি ও শূল নাশক। (শূল নাশক অর্থাৎ বাহ্য প্রলেপে স্থানীয় ব্যথা নাশক, আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও উদরাদির শূলনাশক হইতে পারে, যেহেতু বিষমাত্রই

আগ্নেয়, এবং অধিকাংশ আগ্নেয় বস্তুই শূলনাশক; কিন্তু এরূপ প্রয়োগ সচরাচর দৃষ্ট হয় না)। প্রভাব—সারক, গর্ভপাতকারক।

প্রয়োগ—ইহার মূল দেখিতে অনেকটা মিঠা বিষের ন্যায়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদেরা ইহাকে এক প্রকার মিঠা-বিষ (Aconite) মনে করেন; তবে মিঠা-বিষের অপেক্ষা ইহা ঈষৎ মৃদু, ইহার মাত্রা ৵০ আনা পর্য্যন্ত। মিঠাবিষের প্রয়োগ যেমন জ্বর বাত কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে আছে, ইহারও সেইরূপ। আমরা শুনিয়াছি, জারিত তাম্রকে ৭ বার বিষলাঙ্গলার রসের ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় যথাযুক্ত অনুপান সহ ব্যবহার করিলে জ্বর ও শূলরোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শরীরের কোনও স্থানে ব্যথা বা ফোলা থাকিলে, ইহার শিকড় বাটিয়া দিলে অতি শীঘ্র শান্তি হয়। শুধু বিষলাঙ্গলার প্রয়োগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার শক্তি বুঝিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে ফললাভের আশা আছে। ডাক্তার মুদন সরীফ বলেন—"ইহা বিষাক্ত কি না দেখিবার জন্য আমি নিজে ক্রমে ক্রমে ১৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত খাইয়াছিলাম তাহাতে কোনও কু-লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, বরং ক্ষুধাবৃদ্ধি, স্ফূর্ত্তি ও বলবৃদ্ধি অনুভব করিয়া ছিলাম। আমি প্রায় ষোল বৎসর চিকিৎসা প্রসঙ্গে ইহা ব্যবহার করিতেছি; ইহার সাধারণ মাত্রা—৫ হইতে ১২ গ্রেণ, দিনে তিন বার সেব্য।" বোম্বায়ে পশুদিগের ক্রিমি মারিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। মান্দ্রাজে সর্পবৃশ্চিকাদি-দষ্ট স্থানে ইহার প্রলেপ দেওয়া হয়। তথায় ইহা দুই প্রকারের আছে বলিয়া পরিচিত; এক প্রকারের মূল ৩।৪টী হইয়া ভিন্ন ভাবে বাহির হয়, অন্য প্রকারের কেবল একটী মূল নির্গত হয়। বহুমূলযুক্তকে মান্দ্রাজীরা পুরুষ ও একমূলকে স্ত্রীজাতি বলে। এই পুরুষ জাতীয় গাছের মূল তাহারা চাকা চাকা করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোলে ডুবাইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া পরিশেষে সযত্নে শিশিতে রাখিয়া দেয়। কাহাকেও সাপে কাটিলে দু-এক চাকা খাওয়াইয়া দেয়।

জ্বর বিকারের "কালানল" রস ও "প্রতাপলঙ্কেশ্বর রসে," ভগন্দরের "বিষ্যন্দন তৈল" ও "করবীরাদ্য তৈলে" এবং কুষ্ঠের "বৃহৎ সোমরাজী তৈল" ও "বৃহৎ মরিচাদি" প্রভৃতি তৈলে বিষলাঙ্গলা আবশ্যক হয়।

উডুম্বর।

বাঙ্গালা নাম—ডুমুর; হিন্দুস্থানী—গুল্লর, ইংরাজী—Fig tree. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—উদুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধক। সংস্কৃত নাম—উদুম্বর বা উডুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ, হৈমদুগ্ধক। ইহার অন্য নাম—অপুষ্পফল, শীতবল্কল, সদাফল, ক্রিমিকণ্টক, পুষ্পহীনা, ব্রহ্মবৃক্ষ, সুচক্ষু, শ্বেতবল্কল, কালস্কন্ধ, যজ্ঞযোগ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত, পবিত্রক, সৌম্য, জঘনেফল।

ডুমুর গাছ অবশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন—এই গাছ বটাদিবর্গ ও পঞ্চক্ষীরিবৃক্ষের অন্তর্গত। পঞ্চক্ষীরি বৃক্ষ (অর্থাৎ দুগ্ধ বা শাদা রস আছে যাহাদের তাহারা) যথা—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পারীশ (পলাশ পিপুল) ও পাকুড়।

এই গাছ সাধারণতঃ মানুষের ৩।৪ গুণ উচ্চ হয়, পাতা ৪।৫ অঙ্গুলী চওড়া, ৫।৬ অঙ্গুলী লম্বা এবং অত্যন্ত কর্কশ; কিন্তু পশ্চিম দেশে এক একটা প্রকাণ্ড গাছও দৃষ্ট হয়, অত্যন্ত বড় হইলে গাত্র হইতে বটের ন্যায় সরু সরু বোয়া নামে। সংস্কৃত উদুম্বর বা উডুম্বর শব্দের 'উ' খসিয়া গিয়া ক্রমে বাঙ্গালা ডুমুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

ডুমুর দুই প্রকারের আছে, যজ্ঞডুমুর ও সাধারণ ডুমুর। সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা যজ্ঞডুমুরের ফল ৩।৪ গুণ পর্য্যন্ত বড় হয়। এখানে উদুম্বর শব্দের দ্বারা যজ্ঞডুমুরকেই বুঝাইতেছে; সাধারণ ডুমুরের সংস্কৃত নাম কাকোডুম্বরিকা (কাক ডুমুর) ফল্গু, মলপূ, জঘনেফলা। উভয়েরই গুণ বলা হইবে।

বিনাফুলেই এই ফল হয় বলিয়া ইহার পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত নাম—অপুষ্পফল বা পুষ্পহীন। ডুমুর গাছের গায়ে (কিয়দ্দূর উচ্চে) ফল হয় বলিয়া ইহার পূর্ব্বোক্ত অন্য নাম—জঘনেফল। হোমকালে ইহার কাষ্ঠের যূপ (দণ্ড বিশেষ) প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার পূর্ব্বোক্ত নামান্তর—যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞযোগ্য ও পবিত্রক। লৌকিক সংস্কার আছে যে, ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়, ইহা সত্য কি মিথ্যা ভগবান্ জানেন। তবে বোধ হয়, রাজপদ দুর্লভ বলিয়াই পরস্পর তুলনা দ্বারা এ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

উদুম্বরো হিমো রুক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
মধুরস্তুবরো বর্ণ্যো ব্রণশোধনরোপণঃ॥

যজ্ঞডুমুরের রস—মধুর কষায়; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীতল; গুণ—গুরু, রুক্ষ, কফপিত্তঘ্ন, রক্তরোধক ও রক্ত শোধক, ব্রণ শোধক ও ব্রণ-রোপক। ব্রণশোধক অর্থাৎ ইহার ছালের কাথে ঘা ধুইলে পূঁজ ক্লেদ দূর হইয়া ঘা পরিষ্কার হয়। ব্রণরোপক অর্থাৎ ঘা ক্ষয়যুক্ত বা নিম্নতর হইলে ইহার ছালের রসে ঐ ঘায় মাংস গজাইয়া পূরিয়া আসে। প্রভাব—বর্ণশোধক অর্থাৎ পাকা যজ্ঞডুমুর বা অগ্নিসংস্কৃত কাঁচা যজ্ঞডুমুর খাইলে শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং ছাল বাটিয়া লাগাইলে মেচেতা প্রভৃতি বিবর্ণতাকারী রোগ দূরীভূত হয়।

নির্ঘণ্ট রত্নাকর মতে—উডুম্বরঃ প্রমেহঘ্নঃ গর্ভসন্ধানকারকঃ॥

অস্থিসন্ধানকৃদ্ বর্ণ্যং কফপিত্তাতিসারকান্।
যোনিরোগং নাশয়তি বল্কং চৈবাস্ত শীতলম্॥
রক্তরুক্ পিত্তদাহ ক্ষুৎ তৃষা শ্রম প্রমেহকৃৎ।
শোষ মূর্চ্ছা বমিধ্বংসি পক্কং ফলং তু কীর্ত্তিতম্॥

অর্থাৎ যজ্ঞডুমুরের ফল স্রাবযুক্ত প্রমেহঘ্ন ও গর্ভস্থাপক। ইহার ছাল ভগ্নাস্থি যোজক, বর্ণকর, কফপিত্তাতিসার নাশক, যোনিরোগঘ্ন, এবং শীতল। পক্কফল রক্তদোষহর, পিত্ত দাহ ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম প্রমেহ (জ্বালাযুক্ত) নাশক, এবং ক্ষয় মূর্চ্ছা বমি হারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাকোডুম্বরিকা গুণঃ।

কাকোডুম্বরিকা ফল্গু র্মলপূঃ র্জঘনেফলা।
মলপূ স্তম্ভকৃৎ তিক্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ।
কফপিত্ত ব্রণ শ্বিত্র কুষ্ঠ পাণ্ড্বর্শঃ কামলাঃ॥

কাকডুমুর কষায় ও ঈষৎতিক্ত রস, রক্তমলমূত্রাদির স্তম্ভকর, কফপিত্তঘ্ন, ব্রণ, ধবল, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শ ও কামলা রোগীর হিতকারী। ইহার তিক্ত ও কষায় রস সত্ত্বেও ইহা প্রভাব বশতঃ শীতল।

প্রয়োগ—ডুমুরের ঔষধীয় শক্তি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে বলা উচিত যে অস্মদ্দেশে ইহা উৎকৃষ্ট তরকারীর মধ্যে গণ্য। পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থের বাড়ীর

অনতিদূরে অযত্ন-জাত অনেক ডুমুরের গাছ দৃষ্ট হয়; দরিদ্র গৃহস্থেরা দিন-বিশেষে পয়সার অনাটনে বাজারে যাইতে না পারিলে ডুমুর ও তৎসঙ্গে অন্য শাকপাতা সংগ্রহ করিয়া সে দিনের আন্নের নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অথবা রুচি উদ্রিক্ত করিবার জন্য অন্যান্য তরকারীর সহিত মধ্যে মধ্যে ইহা রন্ধন করিয়া থাকে। কচি ডুমুর সুখাদ্য, লঘুপাক ও মুখরোচক। সহরের বাজারে দু পয়সায় অন্ততঃ চারিটী মিলে, সহরে গরিব ভদ্র বাবুরা তাহাই পাইয়াই চরিতার্থ হন। বিশেষতঃ, ইহা নির্দ্দোষ ও উপকারী বলিয়া রোগীর পথ্য রূপে প্রসিদ্ধ, তজ্জন্য সহরের বাজারে ইহার একটু আদর ও টানাটানি লক্ষিত হয়। তরকারী রূপে ব্যবহার করিবার পক্ষে যজ্ঞডুমুর অপেক্ষা ছোট ডুমুরই ভাল। ইহা ভাজা, ঘণ্ট, ছেঁচ্‌কি, মাছের ঝোল বা নিরামিষ ব্যঞ্জন, প্রভৃতি যাহার উপকরণেই প্রযুক্ত হউক, সর্ব্বরূপেই সুস্বাদু হইয়া থাকে। ঔষধাকারে যজ্ঞডুমুরের প্রয়োগই কবিরাজ মণ্ডলী মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু যজ্ঞডুমুরের কাজ ছোটডুমুরেও যে না হয় এমন নয়, বরং রোগবিশেষে এই ডুমুরেই অধিক ফল হয়। উভয় ডুমুরই কষায়রস ও ধারক, প্রধানতঃ এই গুণেই কতিপয় রোগে ডুমুরের ব্যবহার; কিন্তু ছোট ডুমুরের কষায়ত্বের সহিত ঈষৎ তিক্তের আমেজ আছে, অতএব মেহ প্রভৃতি রোগে চোখ বুজিয়া বাঁধা-নিয়মে শুধুই যজ্ঞডুমুরের রস ব্যবহার না করিয়া অবস্থা বিশেষে ছোট ডুমুরও প্রয়োগ করা উচিত। মনে করুন্‌, যদি মেহাদি রোগের সহিত জীর্ণজ্বর, কাস, পাণ্ডু, চর্ম্মরোগ, যকৃদ্দুষ্টি প্রভৃতি উপসর্গ থাকে, তবে নিশ্চয়ই যজ্ঞডুমুরের রস অপেক্ষা সাধারণ ডুমুরের রসেই অধিক উপকারের সম্ভাবনা।

মেহ, বহুমূত্র, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর রোগে যজ্ঞডুমুর উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবিরাজগণ উক্ত রোগ সমুদায়ে রোগীকে যজ্ঞডুমুর পথ্যস্বরূপ ব্যবস্থা দেন; এবং ব্যবস্থেয় বটিকা চূর্ণাদি ঔষধের অনুপানার্থ যজ্ঞডুমুরের রস ব্যবস্থা করেন। বস্তুতঃ উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐ ডুমুর যখন যে ভাবেই ব্যবহার করুন, উপকার পাইয়া থাকেন। ইহা তাঁহারা ছাল ও বীজ ফেলিয়া চাকা-চাকা করিয়া কাটিয়া মিশ্রির গুঁড়া সহ স্নানান্তে জল খাবার করিতে পারেন; ভাতে দিয়া, ঘৃতে ভাজিয়া, ঝোলে, তরকারীতে—নানারূপে ব্যবহার করিতে পারেন। যজ্ঞডুমুরের মোরব্বাও

হইয়া থাকে ; ইহা বড় সুস্বাদু, কিন্তু প্রস্তুত করিবার সময়ে ইহার রস নিংড়াইয়া ফেলা হয় বলিয়া ইহা কিঞ্চিৎ হীনগুণ হইয়া থাকে।

যজ্ঞডুমুরের হালুয়া—বড় উপকারী, ইহা প্রস্তুত করিবার বিধি এই,—যজ্ঞডুমুর অপক্ক অবস্থায় ফিঁকে-সবুজ থাকে, পাকিবার অগ্রে (ডাঁসা অবস্থায়) আরো ফিঁকে ও একটু হরিদ্রাভ হয়। ঐরূপ ডাঁসা যজ্ঞডুমুর সংগ্রহ করিয়া ছেঁচিয়া বা কাটিয়া বীজ ফেলিয়া দিবে, এবং কিয়ৎক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ঐ ডুমুর উঠাইয়া শিলায় উত্তমরূপে বাটিয়া লইবে ; উনানে কড়াই চড়াইয়া তাহাতে গব্যঘৃত দিয়া এই বাটা ডুমুর কিয়ৎ পরিমাণে ভাজিয়া লইয়া, একটু রস টানিয়া গেলে উহাতে ছাগদুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে—পরে পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া এবং ছোটএলাচ, তেজপত্র ও দারুচিনির অল্প গুঁড়া দিয়া পুনরায় নাড়িতে নাড়িতে 'থস্‌থসে' মত হইলে নামাইয়া রাখিবে ; শীতল হইলে খাওয়া উচিত। প্রতিদিন নূতন করিয়া প্রস্তুত করা ভাল ; একটু কড়া-পাক করিলে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে গুণের হানি হয় না। এই হালুয়া ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র ও ক্ষয়রোগীর পক্ষে অমৃতবৎ। প্রতিদিন বৈকালে অন্য 'জলখাবার' পরিবর্ত্তে এই হালুয়া আহার কর্ত্তব্য।

যজ্ঞডুমুরের সরবৎ—যজ্ঞডুমুর পাকিলে সুন্দর লালবর্ণ ও মিষ্টাস্বাদ হয়। ইহার একটা দোষ এই যে, পাকিবার দুএকদিন পরেই উহার মধ্যে পোকা জন্মে, সুতরাং টাটুকা পাকা যজ্ঞডুমুর সংগ্রহ করিতে হয়। অতিপক্ক ডুমুরের পোকা ফেলিয়া দিয়া লইলেও হানি নাই (এ পোকা বিষাক্ত নয়, তবে ঘৃণ্য বলিয়া অনেকের অরুচিকর হয়।) পাকাডুমুর বেশ নরম হয়, বীজ ফেলিয়া দিয়া একটা প্রস্তর পাত্রে উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া উহাতে ছানার জল বা ঘোল দিয়া গুলিবে ; পরে কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ইহাতে অল্প কেওড়ার জল বা গোলাপজল দিতে হয়। এই সরবৎ বায়ুপিত্ত অজীর্ণ ও রক্তপিত্ত রোগীর বিশেষ উপকারী। গরমের দিনে সহজ শরীরে এই সরবৎ পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে। পশ্চিমদেশে বাজারে খুব বড় বড় পাকা যজ্ঞডুমুর বিক্রীত হয়, তথায় এই সরবতের বড় আদর। শুধু পাকা যজ্ঞডুমুরের রস একটু মধু মিশাইয়া খাইলে রক্তপিত্তরোগীর সমধিক উপকার হয়।

(১) যজ্ঞডুমুরের মূলের ছাল ছেঁচিয়া তাহার রস ১ কাঁচ্চা ও যজ্ঞডুমুরের

শুষ্ক বীজ চূর্ণ ৵০ আনা একত্রে দিনে ৩ বার সেবন করিলে মেহের শুক্রবৎ-স্রাব ও মূত্রাধিক্য এবং স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর আরোগ্য হয়। (২) যজ্ঞডুমুরের ছালের কাথে যোনি ধৌত করিলে, শুক্রত্য ক্ষত আরোগ্য হয়; শরীরের অন্যস্থানের ক্ষতেও এই ধৌতি উপকারী। (৩) ডাঃ য়্যাট্‌কিন্‌সন বলেন "ইহার পাতার উপরে যে মসুরের মত উদ্গম হয়, তাহা বাটিয়া দিলে বসন্তরোগের ব্রণ গভীর ও দূষিত হইতে পারে না।" (৪) তিল-তৈলের সঙ্গে যজ্ঞডুমুরের আঠা ফেনাইয়া দিলে পোড়া-ঘা সারে। (৫) ম্যাকান সাহেব বলেন—"ডুমুর গাছে অনেক সময় লাক্ষাকাট অবস্থিতি করে।" এই গাছের লাক্ষা রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মায় ফলপ্রদ। যজ্ঞডুমুরের আঠায় পাখী ধরিবার একপ্রকার আঠা প্রস্তুত হয়।

রক্তপিত্তরোগের 'উশীরাসব' বহুমূত্রের 'কদলাদি ঘৃত' ও প্রসিদ্ধ অমৃতপ্রাশ ঘৃত, প্রভৃতি ঔষধে যজ্ঞডুমুর আবশ্যক হয়।

এরণ্ড।

বাঙ্গালা—রেড়ী বা ভ্যারাণ্ডা; হিন্দী—রেঢ়ী; ইংরাজী—Castor oil plant. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—শুক্ল এরণ্ড আমণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্ব্বহস্তকঃ। বাতারি স্তরুণশ্চাপি রুবূকশ্চ নিগদ্যতে। রক্তোঽপরো রুবূকঃ স্যাদুরুবূকো রুবুস্তথা। ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারি শ্চঞ্চু রুত্তানপত্রকঃ। সংস্কৃত নাম—শুক্ল এরণ্ড, আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, বাতারি, তরুণ, রুবূক; (অপর) রক্ত এরণ্ড, রুবূক, উরুবূক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু, উত্তানপত্রক। এরণ্ডের অন্যান্য নাম—ত্রিপুটীফল, পঞ্চাঙ্গুল, শূলশত্রু, বর্দ্ধমান, কান্ত, চিত্রবীজ, ইষ্ট, স্নেহপ্রদ।

এরণ্ড গাছ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইহা মানুষের মত উচ্চ, স্থান বিশেষে, মানুষের দেড়গুণ বা দ্বিগুণ উচ্চ হয়। পাতা মানুষের হাতের থাবার মত, পাঁচ ছয়টা শির বাহির করা, ঐ শির যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে ক্রমে সরু হওয়ায় পাতার চেহারা খাঁজ-কাটামত। ইহার গুঁড়ী-কাঠ দু তিন অঙ্গুলী মোটা ও বড় হাল্কা, ডালগুলি ফাঁপা; এই বৃক্ষকে সংস্কৃতকবিরা অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাই এই উক্তি—"নিরস্তপাদপেদেশে এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে" অর্থাৎ যে দেশে বৃক্ষ নাই, সেখানে রেড়ী-

গাছও গাছ বলিয়া গণ্য হয়। এরণ্ড গাছ, শাদা ও লালভেদে দুই প্রকারের আছে, লালগাছগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, গাছ ঘোর লালবর্ণ নহে, কেবল লালের আভাযুক্ত। দুইএর গুণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

শ্বেত এরণ্ডের গুণ।

শ্বেতোরুবূকঃ কটুক স্তীক্ষ্ণশ্চোষ্ণো গুরু স্তথা।
মধুর স্তিক্তকো বৃষ্যো স্বাদুপাকঃ সরঃ স্মৃতঃ ॥
বাতোদাবর্ত্তকফহৃৎ জ্বরকাসোদরাপহঃ।
শোথশূল কটীবস্তি শিরোরুগ্ নাশনঃ স্মৃতঃ ॥
শ্বাসানাহ কুষ্ঠ ব্রধ্ন গুল্ম প্লীহামপিত্তহা।
প্রমেহোষ্ণবাতরক্ত মেদোহন্ত্রবর্দ্ধন প্রণুৎ ॥

শ্বেত এরণ্ডের রস—কটু-মধুর-তিক্ত ; বিপাক—মধুর ; বীর্য্য—উষ্ণ ; গুণ—তীক্ষ্ণ, গুরু, বায়ুনাশক, উদাবর্ত্ত (বায়ুতে পেটের ভিতর উর্দ্ধদিক্ টানিয়া রাখা, যাহাতে কিছুতে বাহে প্রস্রাব হয় না), কফহর, জ্বর, কাস, উদর রোগ, শোথ ও শূল প্রশমক, কটী, বস্তি ও মস্তকের ব্যথা নাশক ; শ্বাস, আনাহ, কুষ্ঠ, ব্রধ্ন, গুল্ম, প্লীহা ও আমঘ্ন (সঞ্চিত আম নিষ্কাশিত করে) পিত্তনাশক, উষ্ণতা (দেহের জ্বালা বা উত্তাপ) নিবারক, বাতরক্ত, মেদ ও অন্ত্রবৃদ্ধি হারক। প্রভাব—প্রমেহ নাশক, বৃষ্য।

রক্ত এরণ্ডের গুণ।

রক্তোরুবূক স্তুবরো রসে কটুর্লঘুঃ স্মৃতঃ।
তিক্তো বাত কফ শ্বাস কাস ক্রিম্যর্শো ব্রধ্নহা ॥
রক্তদোষ পাণ্ডুরুজ ভ্রান্ত্যরোচক নাশনঃ।
প্রায়স্তস্তে গুণাশ্চান্য শ্বেতবচ্চ সমীরিতাঃ ॥

রক্ত এরণ্ডের রস—কটু-তিক্ত-কষায় ; বিপাক—কটু ; বীর্য্য—উষ্ণ ; গুণ—লঘু, বাতকফহর ; শ্বাস, কাস, ক্রিমি, অর্শ ও ব্রধ্ন নাশক, রক্তদোষ, পাণ্ডুরোগ ও অরুচি হারক ; শ্বেত এরণ্ডের অন্যান্য গুণও ইহাতে আছে ; প্রভাব—ভ্রান্তি (ভ্রমী বা শিরোঘূর্ণন) নিবারক।

স্ত্রীজাতির গুণ

আমরা কিয়দ্দিন পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির কতকগুলি দোষ ঋষির পাঠিকাগণকে দেখাইয়াছি, এক্ষণে স্ত্রীজাতির কতকগুলি গুণ পাঠিকা ভগিনীগণকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। স্ত্রীজাতির গুণ গুলি অতুল্য, এই অমূল্য গুণাবলীতে অলঙ্কৃতা বলিয়াই হিন্দু-সংসারে রমণী দেবীবৎ পূজনীয়া। কিন্তু পূর্ব্বে যে দোষগুলি দেখাইয়াছি, তাহাও বড় ভয়ানক। সেই দোষ গুলির জন্যই অনেক-সংসারে স্ত্রীজাতিকে দেবীর পরিবর্ত্তে প্রেতিনীরূপে দেখিতে পাই। সেই দোষ গুলি সংশোধিত করিয়া রমণী যাহাতে নিজ দেবীনামের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা সকল রমণীরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখান যাউক স্ত্রীজাতিতে কি আছে।—

যে অমূল্য প্রেম রত্নের শীতলস্পর্শে জীব জুড়ায়, ধন্য হয়, হিন্দুরা যাহাকে বলেন "যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর" সেই পবিত্র প্রেমরত্নের আবাস-ভূমি রমণী হৃদয়। রমণী-হৃদয় প্রেমের প্রস্রবণ, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতি সাজিয়া জীবকে শ্রীভগবৎ সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। এ জগতে স্ত্রীজাতি না থাকিলে কেহই প্রেমের পবিত্র সম্মিলনানন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন না। উহা কবির কল্পনায় পরিণত হইত মাত্র। স্ত্রীহৃদয় স্বর্গীয় আলোকে প্রভাসিত। লম্পট সুরাপায়ী পতি, অবিরত অনাদর অপমান লাঞ্ছনা যন্ত্রণায় সরলা সহধর্ম্মিণীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বারবিলাসিনীর চরণ রূপ মহাবৈতরণী পার হইতেছেন, তবুও স্ত্রীজাতি সর্ব্বজন-ঘৃণ্য সেই স্বামীকে অশ্রদ্ধা করেন না। তবুও সেই মুখখানি চাহিয়া তাঁহারা আত্মহারা হন। সেই কুক্রিয়াসক্ত পতির একটু মাথা ধরিলে, তাঁহারা জগত অন্ধকারময় দেখেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্য কত দেব দেবীর নিকট প্রতিনিয়ত মাথা কুটিতে থাকেন। স্ত্রীজাতি সর্ব্বাবস্থাতেই জানেন "পতিরেক গতিঃ সদা"।

সন্তান পালন স্ত্রীজাতির একটি বিশেষ গুণ। সন্তানের মঙ্গলার্থে স্ত্রীজাতি না করিতে পারেন এমন কোন কার্য্যই নাই। কুক্রিয়াসক্ত পুত্রের চরিত্রে বিরক্ত হইয়া পিতা পুত্রকে নানারূপ নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন, সেই পুত্র-

কেই স্নেহময়ী জননী "যাদুধন" বলিয়া বুকে টানিয়া লইয়া রমণী হৃদয়ের অসীম স্নেহবত্তা দেখাইয়া, দর্শকের চিত্ত বিমোহিত করেন। সন্তানের কিঞ্চিন্মাত্র পীড়ার সঞ্চার হইলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে পীড়িতের শিরোদেশে বসিয়া অনবরত শুশ্রূষা করিতে একমাত্র জননীই সক্ষম। জননী আছেন বলিয়াই জগত পালন হইতেছে, বলিতে গেলে জননী জগদ্ধাত্রী-স্বরূপা। এই জন্যই "মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী"। যে মাতা জগদ্ধাত্রী স্বরূপা সেই মাতা স্ত্রীজাতি। সুতরাং বলিতে হয় স্ত্রীজাতির গুণেই বিশ্বময়ের বিশ্বরাজ্য চলিতেছে।

আধুনিক কর্ত্তারা ভৃত্যবর্গকে কুক্কুর বা তদপেক্ষা কোনও নিকৃষ্ট জীব বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু গৃহিণীরা ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে দাসদাসী-গণকে প্রতিপালন করেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে মাতার ন্যায় স্নেহদান করিয়া তাহাদিগের যন্ত্রণার লাঘব করিয়া দেন; স্ত্রীজাতির স্নেহ কারুণ্যেই তাহারা তীব্র পরাধীনতা-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পরগৃহ বাস করিতে সমর্থ হয়।

দ্বারে অতিথি উপস্থিত হইলে কর্ত্তাদিগের ব্যবস্থায় অনেক স্থলে মুষ্টির বদলে যষ্টির ব্যবস্থাও হইয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীজাতি কত আদর যত্নের সহিত অতিথির সন্তোষ বিধান করেন। শাস্ত্র পুনঃপুনঃ অতিথি সেবার আদেশ দিয়াছেন, স্ত্রীজাতিও বলেন "অতিথি রুষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ হয়"। রমণীজাতির ধর্ম্মপ্রাণতাই আজিও হিন্দুধর্ম্মকে জীবিত রাখিয়াছে। আজিও যে হিন্দু-সংসারে অতিথি সেবা, ভগবৎ সেবা, গুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও কারণ স্ত্রীজাতির গুণ। ধর্ম্মপ্রাণতাই সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। যে হৃদয় ধর্ম্মভাবহীন সে হৃদয় নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষাও ঘৃণিত। ঘোর স্বেচ্ছা-চারী ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা হইতেই সমাজে অশান্তি-অনল ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিয়া পরিণামে সেই অনলে সকলে দগ্ধ হয়। নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমাজের ইষ্টানিষ্টের দিকে চাহিয়া দেখিবার বড় একটা সময় পান না, তাঁহারা পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুকরণের জন্য স্বতঃই ব্যস্ত। প্রত্যেক প্রদেশের রুচি ও রীতি-নীতি বিভিন্ন। এক দেশে যে আহার্য্য স্বাস্থ্যকর, অন্য দেশে তাহাই অস্বাস্থ্য-কর হইতে দেখা গিয়াছে, এইরূপ প্রতিকার্য্যেই এক দেশের সহিত অন্য দেশের বিভিন্নতা আছে ও তাহা থাকা স্বভাবসিদ্ধ তাহা কেহ বুঝেন না। তাঁহারা কিরূপে বিধবা বিবাহ ও যৌবন বিবাহ প্রচলিত করিবেন, সেই

চিন্তাতে তাঁহারা সর্ব্বদা জর্জ্জরিত। এখনও কচিৎ "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নব বর্ষে চ রোহিণী" যে দেখা যায় তাহা স্ত্রীজাতির ধর্ম্মপ্রাণতারই পরিচয় মাত্র। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্ত্রীজাতির হস্তে স্বাধীনতার জয়পতাকা তুলিয়া দিয়া কিরূপে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বদা সেই চিন্তাতে অস্থির। তাঁহাদের কল্পনা যতই কার্য্যে পরিণত হইতেছে, সমাজ ততই অশান্তিময় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও স্ত্রীজাতির গুণেই এখনও হিন্দুসমাজ টিকিয়া আছে। বায়ুবিতাড়িত তরণীর নাবিকের ন্যায় এখনও ধর্ম্মপ্রাণতা রজ্জু দ্বারা উচ্ছৃখল সমাজরূপ মত্ত হস্তীকে স্ত্রীজাতি, অতি সতর্কতার সহিত ধরিয়া আছেন। এখনও যে দীন দরিদ্র-পালন, ব্রাহ্মণসজ্জনদিগকে দান, কাশী শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন হইতেছে তাহাও স্ত্রীজাতির গুণ। এই ঘোর বিপ্লবের সময়ও স্ত্রীজাতির গুণেই এখনও মানবহৃদয়ে ধর্ম্মের ছায়া নিপতিত রহিয়াছে।

কোনও ইংরাজ মহাপুরুষ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন "স্ত্রীলোক ধীরভাবে প্রত্যহ যে যন্ত্রণা সহ্য করে, পুরুষদিগকে যদি তাহার শতাংশের একাংশ সহ্য করিতে হইত, তবে তাঁহারা পাগল হইয়া যাইতেন। তাহারা অবিশ্রান্ত-দাসত্বের কোন পুরস্কার পায় না। অবিচল ধীরতা, সহৃদয়তার বিনিময়ে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর ব্যবহারই লাভ করে। তাহাদের ভালবাসা, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, সতর্কতা, এমন কি একটা ভাল কথার দ্বারাও স্বীকৃত হয় না। কত স্ত্রীলোক এই সকল স্থির ভাবে সহ্য করে এবং বাহিরে প্রফুল্ল ভাব দেখায় যেন তাহাদের প্রাণে কোনই কষ্ট নাই"। বস্তুতঃ এবম্বিধাচরণ একমাত্র স্ত্রীজাতিতেই সম্ভবে।

দয়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, ঈশ্বরে প্রীতি, পরলোকে বিশ্বাস প্রভৃতি মহাত্ গুণাবলীর, স্ত্রীহৃদয়ে যেরূপ একাধিপত্য সেরূপ আর কোথাও নাই। অনেক স্থলে দেখা যায় কোন দীন খাতক বা প্রজা তাহাদের দেয় প্রদান করিতে না পারিয়া খাতক বা জমীদারের কোপানলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, তৎকালে সেই বাটীর গৃহিণীর অনুকম্পাতেই সে দায় উদ্ধার হইয়াছে।

কোন শত্রু পক্ষের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, রমণী আজন্ম সঞ্চিত শত্রুতা

বিস্মৃত হইয়া দিনে দশ বার খবর লইয়া থাকেন। পীড়িতের সেবা করিতে স্ত্রীজাতি স্বতঃই মুক্তপ্রাণ। এমন কি যাহার সহিত কখনও পরিচয় নাই ঈদৃশ দীন বৃক্ষতল-শায়ী পীড়িত-পথিকের নিকট স্ত্রীজাতিকে সুশীতল পানীয়-পাত্র হস্তে উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

শাস্ত্র বলেন "শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ"। যে সংসারে স্ত্রী নাই সে সংসার কত বিশৃঙ্খলাময় তাহা বোধ হয় সহজেই সকলে অনুমান করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় আধুনিক শিক্ষা বলে দেবীবৎ এই অমূল্য হৃদয় খানিও পুরুষের কঠিন চরিত্রানুকরণ করিয়া কলঙ্কিত হইতে বসিয়াছে। আমাদের বিনীত নিবেদন, ভগিনীগণ! বিদেশীয় রীতিনীতির অনুকরণ না করিয়া, প্রাচীনা আর্য্য-মহিলাগণের চরিত্রানুকরণে যত্নবতী হও, তাহা হইলে আবার ভারত-ভাগ্যে সৌভাগ্যরবি উদিত হইয়া তাহাকে প্রভাসিত করিবে, ভারত আবার সীতা-সাবিত্রীর ছবি অঙ্কে লইয়া ধন্য হইবে। নিজ ভাণ্ডারে রত্ন থাকিতে পর দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাওয়া নিশ্চয়ই ঘৃণা ও মূর্খতার বিষয়। হিন্দু সংসারে রমণীই "শ্রী", (লক্ষ্মী) এই জন্যই হিন্দু সংসারে রমণী দেবীবৎ পূজনীয়া। রমণীর আদর হিন্দুজাতি যেমন বুঝিয়াছেন এমন আর কোনও সমাজে কোনও জাতির মধ্যে কেহই বুঝেন নাই। তাই বলি ভগিনীগণ এ হেন অতুল্য গুণরাশি নষ্ট করিয়া নিজের গৌরব হারাইও না। নিজ নিজ দোষগুলির সংশোধন পূর্ব্বক গুণরাশির বিকাশ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল কর!!!

মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা রচয়িত্রী—বোলপুর।

পতি-দেবতা। (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলে রমণীরা বুঝে যে, "স্ত্রীলোকও মানুষ, আর পুরুষও মানুষ, তাহারা উভয়েই এক ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী, অথচ কেবল পুরুষেরাই যে সকল পার্থিব সুখ ভোগ করিবে আর তাহারা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া পুরুষের সুখ দুঃখের উপর নিজ সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া থাকিবে ইহা কখনই পরম কারুণিক সমদর্শী জগৎপিতার অভিপ্রায় হইতে পারে না।" পুরুষগুলা তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া দমনে রাখিবার জন্যই ঐরূপ একটা নিয়ম করিয়া লইয়াছে, অতএব একেবারে "ভাতারের দাসী

হয়ে থাকা কি পোষায়”. এখন তাহারা বুঝিয়াছে—স্বামিও যা’ স্ত্রীও তা’। এখন তাহারা স্বামীকে কি নারায়ণ বলিয়া ভাবিতে পারে? না, স্বামীর হুকুমটীর অপেক্ষা করিয়া যাত্রা মহোৎসব না দেখিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে পারে? আর যাত্রামহোৎসব দেখিলেই কি স্ত্রীলোকের সব যায়? স্ত্রীলোক কি এতই হতভাগা জাত”? স্বামীর কথায় উত্তর না দিয়া কি এখন মেয়েরা থাকিতে পারে? এখনকার কালে কি আর তা চলে? সেকালের মাগীগুলা দাঁতে মিসি, নাকে নথ, পায়ে আল্‌তা, ৫ ছেলের মা হ’লেও মাথায় এক হাত ঘোমটা দিত, কাজেই তাহাদের পক্ষে ও সকল শোভা পাইত, কিন্তু এখনকার কালে তা’ চলে কি? এখন এরা শিখ্‌ছে যে দম্পতী একটী বোঁটায় দুটি ফুল, তাহাদের মধ্যে আবার উচ্চ নীচ কি, সম্ভ্রম অসম্ভ্রম কি? একজনের উপর আর একজন প্রভুত্ব করিবে, আর একজন নীরবে তাহা সহিয়া যাইবে, তাহা হইলে কি একপ্রাণতা জন্মে?

যেখানে ভয় ও মান্যের সম্বন্ধ, গুরুজনের ন্যায় ব্যবহার, সেখানে কি ভালবাসা—প্রাণে প্রাণে মিশামিশি ভালবাসা—দাঁড়াইতে পায়? বরং উভয়ে উভয়কে সমান চক্ষে দেখিয়া সমান ভাবে চলিতে পারিলে সমানভাবে দুজনে দুজনের ভালবাসা পাইবে। স্বামী রাগিয়া তাড়না করিলেও স্ত্রীতে কথা কহিতে পাইবে না, এরূপ একটা পক্ষপাতপূর্ণ নিয়ম সেকালে ছিল, আর মাগীগুলার জ্ঞানবুদ্ধি থাকিতে তাহাই মানিয়া চলিত, এ কথা এখন কেহ বিশ্বাসই করিতে পারে না। স্বামী স্বচ্ছন্দে ন্যায় অন্যায় দু কথা বলিয়া যাইবে আর স্ত্রীলোকে রক্তমাংসের শরীর লইয়া তাই সহ্য করিয়া থাকিবে, এ কি হয়! দুটা মুখের কথা কহিয়া স্বামীকে বুঝাইবে না, কি নিজের নির্দ্দোষিতা দেখাইয়া দিবে না? সেকালে নিয়ম ছিল, পতি দোষ করিলেও পতিকে কিছু বলিতে পাইবে না, যদি পতির অত্যাচার সহ্য করিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিবে তবু পতিকে কিছু বলিতে পাইবে না।—এখন এ শিক্ষা কোথায়? এখনকার কালে এ শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দেয় এমন শিক্ষকই বা কোথায়—এ রকম আজগুবি নিয়ম যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল, আর লোকে তাহা পালন করিত, তাহা হয় ত এখন মাথা কুটিয়া ফেলিলেও কোন রমণীর ধারণাই হইবে না।—এখন ইহা বলিতে

শিখিয়াছে, বাপ্‌ রে! অমন স্বামী মাথায় থাকুন, আমার কাজনেই স্বামীর ভাত খেয়ে! জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।—ইত্যাদি।—অবশ্য একালে যে সকলেই এরূপ করে, এমন নয়; তবে শিক্ষার দোষে অধিকাংশের প্রাণে স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা ও স্বাবলম্বনের ভাব বেশী জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা ঠিক।

সেকালের রমণীরা কিরূপে "পতি-দেবতা"র শুশ্রূষা করিতেন ও তাহার ফল কতটা আশা করিতেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

নারদ যমকে পতিব্রতার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করায়, যম বলিতেছেন "হে বিপ্র! হে মহামতে! পতিব্রতা নারীর নিয়ম, তপস্যা, উপবাস, দান ও দম নাই (অর্থাৎ স্বামীসেবাই তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ের ফল দিয়া থাকে।) হে বিপ্র! পতিব্রতা নারী যেরূপ ব্যবহার-যুক্তা হইয়া থাকেন, তাহা শুন।—পতিব্রতা, স্বামী নিদ্রা গেলে পর নিজে নিদ্রা যান, স্বামী জাগিলেই জাগরিতা হন, স্বামীকে ভোজন করাইয়া শেষে নিজে ভোজন করেন, কাজেই তিনি যমকে জয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার যমযাতনা হয় না। পতি নিস্তব্ধ থাকিলে পতিব্রতা নিজে কথা কহেন না; স্বামী থাকিলে, তিনি থাকেন; হে বিপ্র! কাজেই তিনি যম জয় করিয়া থাকেন, নারীগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা যমযাতনা এড়াইবার সহজ উপায় আর কিছু দেখিতেছি না। পতি-ব্রতা রমণী (পুরুষের মধ্যে) পতিকেই দর্শন করেন, পতিতেই তাঁহার মন নিযুক্ত থাকে ও পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন, হে তপোধন! আমরা এইরূপ পতিব্রতাকে ভয় করিয়া থাকি, অন্য সকলেও ভয় করে; এরূপ পরম শোভনা সাধ্বী, দেবতাগণেরও পূজ্যা। পতি যদি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে পতিব্রতাকামিনী প্রণতি পূর্ব্বক (নম্রভাবে) তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। হে বিপ্রেন্দ্র! পতিব্রতারমণী যদি পতির নিকটে থাকিয়াও তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন তবুও তিনি পতিকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন কখনও অন্যকে, আশ্রয় করেন না। পতিব্রতারমণী একান্ত ভক্তিতে স্বামীর অনুগতা থাকেন, কাজেই হে ব্রহ্মনন্দন! তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। এইরূপে যে রমণী পতিশুশ্রূষা করিয়া থাকেন তিনি আমাকে জয় করিয়া থাকেন, আর তাঁহার নিকট আমাকেও কৃতাঞ্জলি হইয়া

থাকিতে হয়। যে রমণী স্বামীকে ধ্যান করেন, তাঁহার অনুগতা থাকেন, এবং তাঁহার বিষয়ই আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা (পতি কথা বা পতি রূপ ব্যতীত) গীত, বাদ্য নৃত্য ও অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু শুনেন না বা দেখেন না সুতরাং তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা রমণী যখন স্নান করেন, কেশসংস্কার করেন বা অন্য কর্ম্মে নিযুক্তা থাকেন, তখনও মনে মনে অন্যের কথা চিন্তা করেন না। দেবতার্চ্চনকালে বা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার সময়েও পতিব্রতা রমণী পতিকে চিত্ত বহির্ভূত করেন না সুতরাং তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। হে তপোধন! যে নারী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহ-মার্জ্জনা করেন তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। যে রমণীর চক্ষু, দেহ ও স্বভাব সংযত হয় অর্থাৎ যাহার চক্ষু পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে দেখেনা, যাহার দেহ পতিভিন্ন অন্যপুরুষে দেখিতে পায় না ও যাহার স্বভাব পতি-ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে না সে সদাচারিণী রমণীকে যমালয়ে আসিতে হয় না। যে নারী পতিরই মুখ দেখিয়া থাকেন (অপরের দেখেন না), পতির মনোমত কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং স্বামীর মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্তা থাকেন তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। হে বিপ্র! পতিব্রতার এই সকল কার্য্য কলাপ ও নিয়মাদি আমি পূর্ব্বে সূর্য্যদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম একণে সেই গোপনীয় পতিব্রতা চরিত্র তোমাকে কহিলাম সকল ধর্ম্মাপেক্ষা রমণীর পক্ষে এই পাতিব্রত্যধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি পতিব্রতাকে দেখিলেই পূজা করি।"

এইত স্বয়ং যমের কথা। এ কথায় বিশ্বাস না করিবার অন্য কোন কারণ দেখিতে পাই না কিন্তু বিশ্বাস করিবার কারণই যথেষ্ট আছে, কারণ যিনি যমালয়ের অধিশ্বর নরকাদি দণ্ডদাতা তিনিই স্বয়ং নারদকে বলিতেছেন যে এই সকল কার্য্য করিলে রমণীকে যমালয়ে আসিতে হয় না—ইহা অপেক্ষা অভয় বাক্য আর কি হইতে পারে? সেকালের রমণীরা বুঝিত, এ কথায় বিশ্বাস করিত কাজেই তাহারা এরূপ কার্য্য করিয়া হিন্দুর সংসার সুখের-সংসার করিয়া তুলিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

সদাই মনে রেখো।

নাকে ছুঁইয়ে কোনো ফুল উচিত নয়কো শোঁকা।
নাকের ভিতর ঢুক্‌তে পারে ফুলের মাঝের পোকা॥
মুখের থুতু দিয়ে বইয়ের উল্টাইওনা পাতা।
অজানা বিষ থাক্‌লে কিছু বড়ই ভয়ের কথা॥
ছুরী কাঁচি কথার ভুলেঃ দিওনাক মুখে।
কাণে কাটী দিবার সময় যায়না যেন ঢুকে॥
পরের বাড়ী যেতে দেখো চৌকাঠ উঁচু নীচু।
অজানা পথ যেতে হলে যাওয়া ভাল পিছু॥
ভিজা বস্ত্রে অনেকক্ষণ থেকো নাক বসে।
নিমন্ত্রণের বাড়ী কভু খেয়োনাক ঠেসে॥
গাড়ী হতে নামিবে বা উঠিবে যখন।
দেখো যেন নাহি ঘটে দৈব দুর্ঘটন॥
খেতে বসে হলে পরে অধিক অন্যমনা।
বিষম্ লেগে কষ্ট পাবে স্বাদও বুঝিবে না॥
শোবার আগে বিছানাটী ভাল করে দেখো,—
চট্ করে চিৎ হওয়া দোষ সদাই মনে রেখো॥

অগ্নি পরীক্ষা।

দূরে ওই কে সতী রমণী, পতি পাশে দাঁড়া'য়ে নীরবে?
বিনত কপোল-পরে, শত আঁখি-নীর ঝরে,
হৃদয়ের ব্যথা কত, অবলা কেমনে ক'বে!

চারিদিকে জনতা প্রচুর, দূরে রহে বাহক-শিবিকা,
সম্মুখে দেবর-পতি; চিন্তায় আকুল সতী,
হৃদয়ে নিরাশ-বহ্নি দেখাই'ছে প্রহেলিকা!

পতি-মুখে, জনক-দুহিতা, ভীম রব শুনিলা আবার,—
"রাক্ষস-আবাসে রহি, এতকাল গেল বহি',
বুঝাও কেমনে, সীতা! বহিছে সতীত্ব-ভার?

"কহ এবে, নাশিতে সংশয়, আছে তব কোন্ নিদর্শন?
নাহি পারো—যাও ফিরে, মিছে ভাস অশ্রু-নীরে,
করিওনা মায়া-মোহে, আর তিক্ত এ জীবন।"

সেই বাণী বজ্রনাদ সম, মৈথিলীর পশিল মরমে;
কাতর সরলা বালা, নিরাশায় বাড়ে জ্বালা;
স্তব্ধ যত সভাসদ, শোক-অশ্রু সমাগমে।

কহিলেন রঘুপতি পুনঃ— "বৃথা বহ কি চিন্তা হৃদয়ে?—
নাহি যদি নিদর্শন, মিছে অশ্রু বিসর্জ্জন,
অনলে পরীক্ষা দেহ, নহে তা'র বিনিময়ে!

"ওই জ্বলে বিকাশি' রসনা, বহ্নিরাশি অনন্ত হুতাশে,
পরীক্ষার স্থল সীতা, তব তরে ওই চিতা;
আজি তব ভাগ্য-লিপি গ্রথিত, অনল পাশে!"

শুনি, বাণী এহেন কঠোর, রহে সবে নীরব-বিষাদে,
কি তীব্র বিষাদ-রেখা, চারিদিকে যায় দেখা,
সবারি হৃদয়ে ভীতি, কি দারুণ অবসাদে!

এ পরীক্ষা নহে ত কখন, রাম-চিত্ত বিনোদন-তরে;
নহে কভু জানকীর এ পরীক্ষা, জানি স্থির,
আজি এ পরীক্ষা শুধু, শিখাইতে চরাচরে;

দেখাইতে জগত-সাক্ষাতে, সতীত্বের প্রভাব-মহিমা;
তাই, ত্যজি, অশ্রু-নীরে, যান সতী ধীরে ধীরে,
প্রদীপ্ত সে-চিন্তা-পাশে,— হৃদে প্রীতি-মধুরিমা।

স্বামী-পদ সেবিতে যতনে, যেইমত অযোধ্যা নগরী—
শূন্য ক'রি হাসি মুখে, আসিলা মনের সুখে,
দুঃখময় বনবাসে, পতি-পদ বুকে স্মরি ;

আজো সতী তেমনি আহ্লাদে, হৃদে ল'য়ে তেমনি উল্লাস,
সেই হাসিটুকু নিয়ে, পতি-পদ রাখি' হিয়ে,
পশিলা অনল-মাঝে ; সবে করে হা হুতাশ !

জলে বহ্নি প্রচণ্ড হুতাশে, শিখা উঠে ভেদিয়া গগন !—
সীতা তার মাঝে থাকি, অমরের কীর্ত্তি মাখি',
রাখিলা সতীত্ব নাম, উজলিতে ত্রিভুবন।

রঘুপতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, সমাদরে দিলা তারে স্থান ;
সতী-পূত পদ-পাশে, চারিদিক হ'তে আসে,
ভকতি-অঞ্জলি-রাশি, হইতে ভকত-প্রাণ।

জগতের প্রতি থরে থরে, তাই প্রতি হৃদয়ের তলে,
আদিত্য-কিরণ-মত, সতীত্বের রশ্মি শত,
আজো গো উজলে ধরা, আজো রহে মর্ম্মস্থলে।

আজো শুনি তাই শত মুখে, সতীত্বের মহিমা প্রচুর।
স্মৃতি-পথ দিয়ে যেতে, সতী-গাথা মরমেতে,
কে যেন শুনায় আজো দূর হ'তে কি মধুর !
বাঁচে হেথা' আজো তাই প্রেমিক-পিপাসাতুর !!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

ঋষি।

১ম বর্ষের সূচীপত্র।

(১৩০৫ সালের আষাঢ় হইতে ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত)

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ঋষি-বাক্য	১
দ্রব্যগুণ-বিচার	৩
আয়ুর্ব্বেদে প্লেগের কথা ...	১০
কৌশলে উপদেশ	১৪
পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা (পদ্য) ...	১৬
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান	১৭
প্লেগ-সঙ্কট (পদ্য) ...	১৯
তান্ত্রিক পূজার সৃষ্টি ...	২০
উন্নতি	২১
লক্ষ টাকার একটী কথা ...	২৫
গার্হস্থ্য ধর্ম্মোপদেশ... ...	২৫
সংসার (পদ্য)	২৬
ঋষিবাণী	২৭
প্রাতঃকৃত্য	২৯
জল	৩৫
দ্রব্যগুণ বিচার (অগস্তি) ...	৩৯
কোমলে-ক্লেশ	৪১
পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা	৪৩
মৃত্যু শয্যা	৪৪
জগদ্ বশীকরণ	৪৭
গার্হস্থ্যধর্ম্মোপদেশ	৪৮
লক্ষ টাকার এক একটী কথা	৪৯
দশ অবতার	৪৯
হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু চিকিৎসা ...	৫১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কোমলে ক্লেশ	৫৪
আয়ুর্ব্বেদ প্রচার	৫৭
দ্রব্যগুণ-বিচার	৫৯
(অগস্তি পুষ্পম্, অগুরু, অঙ্কোট, অজমোদা, অজশৃঙ্গী, অতসী)	
সংসার-নাট্য	৬৭
স্বয়ংলক্ষ্মী	৬৮
বুড়া ঠান্‌দিদি	৭০
লক্ষটাকার এক একটী কথা	৭৩
নবজ্বরে পথ্য	৭৩
ঋষিবাক্য	৭৫
বিশুদ্ধ বায়ু	৭৮
রসায়ন ও বাজীকরণ ...	৮০
দ্রব্যগুণ-বিচার	৮৩
(অতিবিষা, অনন্তমূল, অপরাজিতা)	
অজীর্ণ-অতিসারে পথ্য ...	৯১
শিষ্যদিগের উপযোগী বিষয়	৯২
পরমায়ুঃ	৯৫
লক্ষটাকার কথা (মণি-রত্নমালা)	৯৬
উন্নতি না অবনতি? ...	৯৮
মা ও মেয়ে	১০২
শ্রীশ্রীচণ্ডী—সমালোচনা ...	১০৪
বিজয়া-সম্মিলন ...	১০৭
ভিতরে ও বাহিরে ...	১০৮

ঋষির ১ম বর্ষের সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সকলই আপনার	১১২
চিকিৎসা	১১৪
ঋষি	১১৫
জগদীশ্বর মঙ্গলময়	১১৭
মেয়েলী আইন	১২০
বুড়া ঠাঁনদিদি	১২২
পুরন্ধ্রী (পদ্য)	১২৭
লজ্জা (পদ্য)	১৩০
লক্ষটাকার কথা (মণি-রত্নমালা)	১৩১
দ্রব্যগুণ-বিচার	১৩৯
(অপামার্গ, অম্ললোণিকা, অম্লবেতস, অম্লিকা,)	
শ্রীশ্রীচণ্ডী—সমালোচনা ...	১৪৭
চরকীয় নীতি	১৫৫
যমরাজের সান্ত্বনা	১৫৬
দ্রব্যগুণ-বিচার (অর্ক, অর্জ্জুন)	১৬৩
আকাঙ্ক্ষা ও সন্তোষ ...	১৭১
আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির একটী উপায়	১৭৫
(মণি-রত্নমালা)	
লক্ষটাকার কথা	১৭৯
শ্রীশ্রীচণ্ডী—সমালোচনা ...	১৮১
সৌন্দর্য্য	১৮৭
সেফালিকার দুঃখ ...	১৮৮
স্ত্রীজাতির দোষ	১৯২
মণি-রত্ন মালা	১৯৮
দ্রব্যগুণ-বিচার	২০১
(অশোক, অশ্বগন্ধা, অশ্বথ)	
ভক্তি	২১১
কোমলে ক্লেশ	২১৬

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
রাজা ও প্রজা	২১৯
চরকীয় নীতি	২২৪
লক্ষ টাকার কথা	২২৫
দ্রব্যগুণ-বিচার	২২৭
(অস্থিসংহার, অহিফেন,)	
আকুল রোদন	২২৮
দরিদ্র দুয়ার ভিখারী ...	২৩০
লক্ষ টাকার কথা	২৩৩
দ্রব্যগুণ বিচার	২৩৫
(অক্ষোট, আকনাদি, অচ্ছুক, আতৃপ্য, আনারস, আমলকী আর্দ্রক, আলোক-লতা, আম্র)	
শ্রীশ্রীচণ্ডী—সমালোচনা ...	২৫১
পতি দেবতা	২৫৫
আদর্শ—	২৬০
মদন-গোপাল	২৬৪
লক্ষটাকার কথা	২৬৮
দ্রব্যগুণ-বিচার	২৭১
(আম্র, আরগ্বধ, ইঙ্গুদী)	
মূক রাজকুমার	২৮৩
বিশ্বাসের বল	২৮৫
লক্ষ টাকার কথা	২৮৬
দ্রব্যগুণ-বিচার	২৯১
(ইন্দুরকানী, ইন্দ্রবারুণী, ইন্দ্রযব, ইরিমেদ, ইক্ষু)	
পতি-দেবতা	২৯৯
আদর্শ	৩০২ হইতে ৩০৬ পর্য্যন্ত

REG : No. C, 87.

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। মূল্য বার্ষিক সডাকে ১৲। জুলাই। ১৩০৬, শ্রাবণ।

ঋষি

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

---

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—জগন্নাথ স্তোত্রম্, রাজা ময়ূরধ্বজ, দ্রব্যগুণ-বিচার, পাগলের নালিশ, পতি-দেবতা, সমালোচনা।

"ঋষি"-পত্রিকার নিয়ম।

১। "ঋষি" বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের "ঋষি" না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার জন্য আমরা দায়ী নহি। আকার (অনূ্ন) ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা।

২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই কথাটীর উল্লেখ করিবেন।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। } { শ্রাবণ, ১৩০৬। জুলাই, ১৮৯৯।

জগন্নাথ-স্তোত্রম্

(শ্রীচৈতন্যদেব-রচিতম্)

যিনি মীন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয়-জল-নিমগ্ন বিলুপ্তপ্রায় চতুর্ব্বেদের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন; যিনি কূর্ম্ম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই অনন্ত-দুঃখ-প্রপীড়িত ত্রিভুবন পৃষ্ঠে বহন করিয়া তাহার স্থিতি সম্পাদন করিয়াছিলেন; যিনি বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই প্রলয়-জল-নিমগ্ন অনন্ত ধরণীকে দন্তে করিয়া উর্দ্ধদেশে উত্তোলন করিয়াছিলেন; যিনি নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ নখ দ্বারা সেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ পূর্ব্বক ভক্ত-কুল-চূড়ামণি নিঃসহায় বালক প্রহ্লাদের পরম সহায় হইয়াছিলেন; যিনি বামন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিপাদ-ভূমি-ভিক্ষা-চ্ছলে সেই গর্ব্বিত বলি-রাজের দর্প নষ্ট করিয়া তাহাকে পাতালপুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; যিনি পরশুরাম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তেজঃপুঞ্জশালী সমরকুশল ক্ষত্রিয়গণের বধসাধন পূর্ব্বক পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন; যিনি শ্রীরাম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্জ্জয়-প্রতাপ ভূভার-স্বরূপ লঙ্কাধিপতি রাবণের প্রাণসংহার পূর্ব্বক দেবতাগণের অশান্তচিত্তে শান্তি-সুধা-রস সেচন করিয়া-ছিলেন; যিনি বলরাম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রনষ্টপ্রায় পৃথিবীর উপর হল-চালন করিয়া তাহার উৎকর্ষসাধন ও মহারাজ জরাসন্ধকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন; যিনি বুদ্ধ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লুপ্তপ্রায় বেদবিহিত ধর্ম্মকার্য্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; যিনি কল্কি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সনাতন-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী দুর্বৃত্তগণের বধসাধন হেতু দেবগণ-প্রদত্ত অশ্ব ও অসির সাহায্যে তাহাদিগের প্রাণসংহার পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে পুনর্ব্বার সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন; যাঁহাকে দোলমঞ্চে দর্শন করিলে মানবের পুনর্জ্জন্ম হয় না; যাঁহাকে রাসমঞ্চে নিরীক্ষণ

করিলে এই অসার সংসারে আর আসিতে হয় না; যাঁহাকে রথমঞ্চে অবলোকন করিলে গর্ভবাস-জনিত ভীষণ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে হয় না, সেই পরম পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন জগন্নাথ দেবের শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে, এস ভাই! অদ্য আমরা একবার তাঁহার স্তুতিগান করিয়া জীবন সার্থক করি:—

(১) কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতকরবো
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মামরপতিগণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

প্রস্ফুটিত-পদ্ম-মুখী যত গোপীগণ
বসতি করিত বৃন্দাবনে অনুক্ষণ,
তাহাদের মুখ-মধু ভ্রমর হইয়া
আহ্লাদে করিব পান বিরলে বসিয়া,
ইহা ভাবি একদিন যিনি মনে মনে
যমুনার তীরবর্ত্তী কোন এক বনে,
একবার সুমধুর করি বংশীধ্বনি
আনিয়াছিলেন যত গোপের রমণী;
ব্রহ্মা, শম্ভু, ইন্দ্র, লক্ষ্মী আর গণপতি
সেবেন শ্রীপদ যাঁর হয়ে একমতি,
সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন!

(২) ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

নিত্য শোভা পায় বেণু যাঁর বাম করে,
শিখিপুচ্ছ শোভে যাঁর মস্তক উপরে,
কটিতটে শোভে যাঁর দুকূল সুন্দর,
নয়নে কটাক্ষ যাঁর শোভে নিরন্তর,

বৃন্দাবনে যিনি নিত্য গোপীগণ সনে
করেন বিবিধ লীলা অতি হৃষ্টমনে,
সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন !

(৩) মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা ।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

মহাসমুদ্রের তীরে সুবর্ণ সমান
নীলাদ্রিশিখর-গৃহে যাঁর অধিষ্ঠান,
রাখি যাঁরে এক পার্শ্বে অন্য পার্শ্বে হলী
রহেন সুভদ্রা দেবী হয়ে কুতূহলী,
পাইবেন অবসর পূজার কারণে
ইহা ভাবি যিনি তাহা দেন দেবগণে,
সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন !

(৪) কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখৈঃ ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

কৃপাসিন্ধু বলি যাঁরে গণে ত্রিভুবন,
সজল জলদ সম যাঁহার বরণ,
লক্ষ্মী আর সরস্বতী উভয়েরি সনে
বিহার করেন যিনি অতি হৃষ্টমনে,
অমল-কমল-সম-মুখ-চক্ষু-যুত
দেবগণ সেবিছেন যাঁরে অবিরত,
চতুর্ব্বেদ-চূড়ামণি যে বেদান্ত ধন
তাহারি মহিমা যিনি করেন কীর্ত্তন,

সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন!

(৫) রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

রথে আরোহিয়া যাঁর গমনের কালে
পথিমধ্যে মিলি যত ব্রাহ্মণ সকলে
স্তুতিগান করে যাঁর হইয়া তন্ময়,
যিনিও শুনেন তাহা হইয়া সদয়,
জগতের বন্ধু যিনি, দয়ার সাগর,
লক্ষ্মী সনে অবস্থিতি যাঁর নিরন্তর,
সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন!

(৬) পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

যিনিই পরম-ব্রহ্ম, নেত্র দুটী যাঁর
প্রস্ফুটিত-পদ্ম-সম রম্য অনিবার,
নীলাদ্রি-পর্ব্বতে যাঁর বাস অনুক্ষণ,
অনন্ত মাথায় ধরে যাঁর শ্রীচরণ,
রাধার সরস দেহ যিনি আলিঙ্গিয়া
পড়ে রন্ প্রেমভরে বিভোর হইয়া,
সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন!

(৭) ন যাচেঽহং রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং নিখিলজনকাম্যাং বরবধূম।

সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
রাজ্য-ভোগ-সুখ, মণি, স্বর্ণ-অলঙ্কার,
এ সবার তরে মন না যায় আমার;
যে নারীর তরে ব্যস্ত এই ত্রিভুবন,
তাহারেও পেতে মোর নাহি যায় মন;
উন্মত্ত হইয়া গিয়া দেব দিগম্বর
স্তুতিগান করিছেন যাঁর নিরন্তর,
সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন!

(৮) হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহং দীনানাথো নিরতমচলো'নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
অসার সংসারে আর আসিতে না হয়,
এইটী করিয়া দাও, ওহে দয়াময়!
করেছি কতই পাপ সংসারে সদাই,
আর না করি হে তাহা, এই ভিক্ষা চাই!
আমি অতি দীন হীন, জড়পিণ্ড-প্রায়
সত্য সত্য কহিতেছি, ওহে কৃপাময়!
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন,
সে দিকেই পাই যেন তব দরশন!

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
পরম সংযত শুচি হইয়া যে জন
এই জগন্নাথ-স্তব করে উচ্চারণ,
যত কিছু পাপ তাঁর সকলি পলায়,
বিষ্ণুলোক সেই জন অনায়াসে পায়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ

রাজা ময়ূরধ্বজ।

অতিথি-প্রত্যাখ্যান মহাপাপ। অতিথিসৎকার হিন্দু গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইলে গৃহস্থকে নিরয়গামী হইতে হয়। "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ" অর্থাৎ অতিথি সর্ব্বদেবময়। যে গৃহে এই অতিথির অপমান বা প্রত্যাখ্যান হয়, সে গৃহ হইতে সুখ শান্তি চিরবিদায় গ্রহণ করে।

ব্রাহ্মণ বড় বিপদগ্রস্ত। তাই বড় আশায় বুক বাঁধিয়া রাজার সুযশঃ শুনিয়া অতিথি হইয়াছেন। অতিথির মনোরথ পূর্ণ হইবে কি? রাজার দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি অক্ষত থাকিবে কি? আজ রাজার অতিথি-সৎকারের বিষম পরীক্ষা; এ ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কি?

ময়ূরধ্বজ অন্তঃপুর মধ্যে পূজাচর্য্যায় নিযুক্ত। এমন সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে রাজদ্বারে উপস্থিত। রাজার নিকট তাঁহার প্রয়োজন, একমাত্র তাঁহার নিকটেই তিনি ভিক্ষাপ্রার্থী। ভিক্ষা শীঘ্রই চাই, বিলম্বে ব্রাহ্মণের অমূল্যধন ধর্ম্মধনের হানি হইবে। অন্তঃপুর মধ্যে সংবাদ দেওয়া হইল। পূজা সমাপনান্তে শীঘ্র আসিয়া রাজা ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়া পাঠাইলেন। শ্রবণ মাত্র ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণগোচর করিবামাত্র রাজা শশব্যস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বহু অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণের ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিলেন,—প্রাণপণে তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আজ প্রাতঃকালে অদূরবর্ত্তী বনপ্রদেশ দিয়া আগমন কালে তিনি এক সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন। সে সত্য রক্ষা করিতে রাজারই অনুকম্পা আবশ্যক। রাজাই সেই সত্য-সাগর পার হইবার একমাত্র তরণী।

আহারাদি সমাপনান্তে অতিথি প্রাতঃকালের ঘটনা প্রকাশ করিলেন। বলিলেন,—মহারাজ! এই শিশু আমাদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম। ইহার বিচ্ছেদে আমরা ক্ষণকালও জীবন-ধারণ করিতে পারি না। ইহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শতশত বিপদ, ভীষণ দারিদ্র্যযন্ত্রণা প্রভৃতি অক্লেশে সহ্য করিয়াছি। রাজন্! বলিতে কি, ইহার অমঙ্গলে তিনটী প্রাণীর অমঙ্গল, ইহার মৃত্যুতে তিনটী জীবের মৃত্যু, ইহার

হিংসায় তিনটী প্রাণীহিংসা। রাজন্! আজ এই শিশু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্ধা-ব্রাহ্মণী এই তিনটী প্রাণীর জীবন রক্ষা করিয়া অতুলকীর্ত্তি লাভ করুন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

প্রাতঃকালে বন মধ্য দিয়া আগমন কালে এক সিংহ আমার এই শিশুটীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। আমার কাতর প্রার্থনায় শিশুর জীবন রক্ষা হইল বটে কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে সিংহ রাজার অর্দ্ধশরীর প্রার্থনা করিল। কি করিব, সেই বিষম দুর্দ্দৈবের সময় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া "তাহাই হইবে" বলিয়া ইহার প্রাণ বাঁচাইলাম। রাজন্! এখন যথাকর্ত্তব্য-বিধান করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন। ময়ূরধ্বজ প্রফুল্লবদনে তাহাতেই সম্মত হইলেন। তাঁহার সেই অসার অনিত্য পরিণাম-ভস্ম দেহ আজ পরোপকারে লাগিবে ভাবিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন।

সিংহের প্রার্থনা অনুরূপ সমস্তই তৎক্ষণাৎ আয়োজন করা হইল। রাজপুত্র ও রাজপত্নী উভয়ে অস্ত্রহস্তে দুই দিকে দণ্ডায়মান, মধ্যস্থলে ময়ূরধ্বজ প্রফুল্লবদনে শয়ান। রাজ-আজ্ঞা পাইবামাত্র স্ত্রীপুত্র উভয়েই অস্ত্র ধরিয়া কাটিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ রাজার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে প্লাবিত হইল! দেখিয়াই ব্রাহ্মণের ক্রোধানল আবার জ্বলিয়া উঠিল। "রে পাপিষ্ঠ নরাধম! যদি নশ্বর শরীরের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিবি, তবে এ কপটতার প্রয়োজন কি?" বলিয়া ব্রাহ্মণ শাপার্থ জল গ্রহণ করিলেন। রাজা করযোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন "দেব! আমার এই শরীরার্দ্ধ পরোপকারে ব্যয়িত হইবে, কিন্তু অপরার্দ্ধ বৃথা হইল এই ভাবিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি, তজ্জন্য আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছি না।" শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন না,—নিজরূপ পরিগ্রহ করিলেন।

কি ভীষণ পরীক্ষা! এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনি, যিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়াছেন। দেহ মনঃ প্রাণ স্ত্রী পুত্র পরিবার ধন জন যৌবন—সমস্ত তাঁহারই, আমার কিছুই নহে, এইরূপ ভাবিয়া নিজ কর্ত্তব্যবোধে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। তাঁহার জিনিষ, তিনিই এই সমস্তের অধিকারী, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই;

আমরা উপলক্ষমাত্র তাঁহার আদেশই একমাত্র অবলম্বনীয়। তৎপ্রদর্শিত পথ ভিন্ন অন্যপথ অবলম্বন করিবার অধিকার আমাদের কিছুমাত্র নাই। সে পথ-প্রদর্শয়িতা তৎস্বরূপ "শ্রীশ্রীগুরুদেব"। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও মূলে এক, তাহা জানিবার জন্য শ্রীগুরুচরণাশ্রয় কর্ত্তব্য।

ময়ূরধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণাশ্রিত; নিস্পৃহভাবে তিনি সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহারই শ্রীচরণে অর্পণ করেন, তাই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন।

কেহ কহে মৌরধ্বজ দানশীল হয়,
কেহ কহে জ্ঞানী কেহ তপস্বী কহয়।
অতএব যার যতদূর দৌড় হয়,
যথার্থ না জানি নিজ মত সেই লয়।
মৌরধ্বজ কৃষ্ণ ভক্ত জানিহ নিতান্ত,
"পর উপকারে যথা দধিচি মহান্ত॥ শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ॥

আসন্ন সময় উপস্থিত। স্ত্রী পুত্র উভয়ে অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। ব্রাহ্মণের জন্য প্রাণ দিতেছেন, ক্ষণকাল পরেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে তথনও "অর্দ্ধ শরীর বিফল গেল কাহারও উপকারে আসিল না!" এই ভাবিতেছেন আর তজ্জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন! কি মহৎ পরোপকার ব্রত! কি মহান্ উচ্চভাব! আবার শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষা শেষ হইলে যখন বর দিতে উদ্যত হইলেন তখন ময়ূরধ্বজ বলিলেন "প্রভু! যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, যদি নিজগুণে দাসের প্রতি এতই কৃপা হইয়াছে, তবে এই বর দিন যেন এরূপ পরীক্ষা আর কাহাকেও না করেন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ শিশুরূপী অর্জ্জুনকে বলিলেন "সখে! একবার দেখ ভগবদ্ভক্তের কি সুন্দর অন্তঃকরণ! কিরূপ পরার্থজীবন! ময়ূরধ্বজ আজ ভক্ত হৃদয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।" "প্রিয়তম ময়ূরধ্বজ! তোমার ভক্তিরজ্জুতে আমি অনেক দিন বাঁধা পড়িয়াছি, আজ জগৎ শিক্ষার জন্য, ভক্তের হৃদয় জগৎকে দেখাইবার জন্য তোমার হৃদয় সর্ব্বসমক্ষে একবার পরীক্ষা করিলাম। বৎস! এখন নিশ্চিন্ত চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন কর, ভবলীলায় সমাধান হইলে তোমার চির অভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

শ্রীগুরুপদ যোগ-বিশারদ।

দ্রব্যগুণ-বিচার।

এরণ্ড পত্রের গুণ।

এরণ্ডপত্রং বাতঘ্নং কফক্রিমিবিনাশনম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি পিত্তরক্তপ্রকোপণম্॥
বাতারিপত্রদলং গুল্মবস্তিশূলহরং পরম্।
কফবাতগদান্ হন্তি বৃদ্ধিং সপ্তবিধামপি॥

এরণ্ড পত্র—বাতঘ্ন (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগে), কফ ও ক্রিমিঘ্ন (কাথ সেবনে), মূত্রকৃচ্ছ্রহর, পিত্ত ও রক্তের প্রকোপ কারক। কচিপাতা—গুল্ম ও বস্তিশূলের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক, বাতশ্লেষ্ম জনিত সমস্ত রোগ এবং সপ্তপ্রকার বৃদ্ধিরোগ নিহত করে।

এরণ্ড বীজের গুণ।

এরণ্ডফলমত্যুষ্ণং গুল্মশূলানিলাপহম্।
যকৃৎপ্লীহোদরার্শোঘ্নং কটুকং দীপনং পরম্।
তদ্বন্মজ্জা চ বিড়্ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ॥

এরণ্ডফল (খোসা সহিত বীজের কাথ) অত্যন্ত উষ্ণ, গুল্ম শূল ও বায়ুনাশক, যকৃৎ, প্লীহা, উদররোগ ও অর্শঃপ্রশান্তিকর, কটু ও পরম দীপন; ইহার মজ্জা (বীজের শাঁস) মলভেদক, বাতশ্লেষ্মা ও উদর রোগনাশক।

এরণ্ড তৈলের গুণ।

রাজবল্লভ মতে—এরণ্ডতৈলং মধুরং গুরু শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্।
বাতাসৃগ্ গুল্ম হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বরহরং পরম্॥

অর্থাৎ এরণ্ড তৈল মধুর, গুরু, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাতরক্ত, গুল্ম, হৃদ্রোগ ও জীর্ণজ্বর নাশক।

মতান্তরে—

এরণ্ডতৈলং কৃমিদোষনাশনং বাতাময়ঘ্নং সকলাঙ্গ-শূলহৃৎ।
কুষ্ঠাপহং স্বাদু রসায়নোত্তমং শ্লেষ্মপ্রকোপং কুরুতেঽতিদীপনম্॥

এরণ্ড তৈল কৃমিদোষ নাশক, বাতব্যাধিঘ্ন, সকলাঙ্গের শূলহর, কুষ্ঠঘ্ন, স্বাদু, রসায়ন, শ্লেষ্মপ্রকোপকর ও অগ্নিদীপক।

প্রয়োগ—ঔষধার্থ ইহার বীজ, বড় পাতা, কচি পাতা, ছাল, কচি মূল ও বড় মূলের ছাল ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ হইতে নীলাভ সাদা, গাঢ়, ঈষৎ দুর্গন্ধ তৈল পাওয়া যায়; বীজকে উত্তপ্ত করিয়া নিষ্পেষিত করিলে শতকরা ৩৫ ভাগ এবং বিনা উত্তাপে নিষ্পেষণ করিলে ২৫ ভাগ তৈল বাহির হয়। এই তৈল রাত্রে প্রদীপে পোড়ান হয়; ইহার আলো স্নিগ্ধ ও অধিকক্ষণ স্থায়ী কিন্তু অন্য তৈলের আলো অপেক্ষা একটু নিস্তেজ। যাঁহাদের মাথা গরম বা বায়ুপিত্তের ধাতু তাঁহাদের এই তৈলের আলো ব্যবহার করা উচিত। এই তৈল উত্তমরূপে পরিস্কৃত হইয়া বোতলে ডাক্তার খানায় ক্যাষ্টারঅয়েল নামে বিক্রীত হয়, এই তৈলের জোলাপ রূপে ব্যবহার সকলেই জানেন। এই জোলাপ বেশ্ মৃদু; বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী সকলেই নিরাপদে সেবন করিতে পারে, এই জোলাপের সাধারণ মাত্রা ২।৩ তোলা। ঊষাকালে গরম জলে বা পাতলা বল্‌কা গরম দুধের সহিত সেবন করিতে হয়। যত তৈল তাহার অর্দ্ধাংশ আদার রস, অপর অর্দ্ধাংশ গরম জল মিশাইয়া খাইলে, দুর্গন্ধ কম বুঝা যায়, কফদুষ্ট মলও উত্তমরূপে নিষ্কাশিত হয়। যাঁহাদের চিরস্থায়ী অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধ, তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে রাত্রে শয়নকালে গরম দুধের সহিত ১ বা ২ কাঁচ্চা (বা আবশ্যক মত ততোধিক) এই তৈল সেবন করা ভাল। কচি শিশুর দাস্ত করাইতে হইলে এই তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া পেটে মালিশ করিলেই যথেষ্ট।

এরণ্ড তৈল বাতরোগের পক্ষে বড় উপকারী, শাস্ত্রে বলে—

"আমবাত গজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এব নিহন্ত্যাহসৌ এরণ্ডস্নেহ-কেশরী॥"

অর্থাৎ এই দেহ কাননে বিচরণকারী আমবাতরূপ হস্তীর একমাত্র নিপাতকারী এই এরণ্ড তৈল রূপ মহাকেশরী। কিন্তু সাধারণতঃ বাতব্যথা নিবারণের জন্য শুধু এরণ্ড তৈল ব্যবহার হয় না। ইহার সহিত কিছু মিশ্রণ আবশ্যক হয় যথা,—

"দশমূলীকষায়েণ পিবেদ্ বা নাগরাম্ভসা।
কুক্ষিবস্তিকটীশূলে তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্॥"

অর্থাৎ দশমূল বা শুণ্ঠীর কাথের সহিত এরণ্ড তৈল সেবন করিলে কুক্ষি,

বস্তি ও কোমরের (lumbago) ব্যথা নিবারিত হয়। বাতরোগে এই তৈলের মালিশও অত্যন্ত উপকারী;—৴০ ছটাক এরণ্ড তৈলে ১ ভরি সূক্ষ্ম সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া রৌদ্রপক্ক করিয়া মর্দ্দন কর্ত্তব্য।

(১) পাকা এরণ্ড পাতা, বেলপাতা ও সৈন্ধবলবণ পিষিয়া কাপড়ের পুঁটলীতে গরম স্বেদ দিলে বাতব্যথা দূর হয়। (২) কচি এরণ্ড পত্র মূত্রকৃচ্ছ্রে (ফোঁটা ফোঁটা বা সরু ধারে প্রস্রাবে) উপকারী। এই রোগে ইহার রস উপযুক্ত বটিকার অনুপান স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে, অথবা এই পাচন ব্যবহার্য্য যথা—কচি এরণ্ড পত্র, কুলথ কলায়, গোক্ষুর বীজ, ইক্ষুমূল ও বেণামূল সাকল্যে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া; ইহাতে ছোট পাথরী পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়ে। (৩) এরণ্ড তৈলে চূণের জল ফেণাইয়া দিলে পোড়া ঘা ভাল হয়। শুধু এরণ্ড তৈল লাগাইলেও পোড়ার জ্বালা শান্ত হয়। (৪) এরণ্ডমূলের রস আমবাত রোগে ঔষধের অনুপান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

কবিরাজগণ এরণ্ড মূলকে প্রধানতঃ শূল ও বস্তিব্যাধি রোগের চিকিৎসায় পাচনের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; শাস্ত্রোক্ত কতিপয় শূলনাশক যোগ যথা—

বলা পুনর্ণবৈরণ্ড বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরৈঃ।
সহিঙ্গু লবণোপেতং সদ্যো বাতরুজাপহম্॥

বেড়েলা, পুনর্ণবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুরের ক্বাথ একটু হিং ও সৈন্ধবলবণ সহ সেবন করিলে বাতশূল নিবারিত হয়।

বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥

শুঁঠ ও এরণ্ডমূল মিলিত ২ তোলা, ইহার ক্বাথ, হিং ও সচললবণ সহ পান করিলে সদ্য শূল নিবারণ হয়।

তরুবুবককাথো হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতঃ।

এরণ্ডমূল ও যবের কাথ, হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চললবণযোগে শূল নাশ করে।

বিল্বমূল তিলৈরণ্ডং পিষ্ট্বা চাম্লতুষাম্ভসা।
গুড়িকাং ভ্রাময়েদ্ উষ্ণাং বাতশূলবিনাশিনীম্॥

বিল্বমূল, তিল ও এরণ্ডমূল একত্রে অম্লকাঁজিতে পেষণ করিয়া গুড়িকা

প্রস্তুত করিবে ; ঐ গুড়িকা উষ্ণ করিয়া জঠরোপরি ভ্রমণ করাইলে বাতশূল প্রশান্ত হয়।

বিল্বমূল মণ্ডৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গু সৈন্ধব সংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল ও শুঁঠের কাথ, হিং ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে কফবাতজ শূল নিবারিত হয়।

আমবাত ও বাতব্যাধি নাশক কতিপয় শাস্ত্রোক্ত যোগ, যথা—

দশমূলামৃতৈরণ্ড রাস্না নাগর দারুভিঃ।
কাথো রুবূকতৈলেন সামং হন্ত্যানিলং গুরুম্॥

দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ, দেবদারু—ইহাদের এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে আমবাত উপশমিত হয়। এই পাচনের নাম রাস্নাদি দশমূল।

রাস্নামৃতারগ্বধদেবদারু ত্রিকণ্টকৈরণ্ড পুনর্নবানাম্।
কাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরুপার্শ্বত্রিকপৃষ্ঠশূলী॥

রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল আঠা, দেবদারু, গোক্ষুর বীজ, এরণ্ডমূল ও শ্বেত-পুনর্নবার কাথ, শুণ্ঠী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে জঙ্ঘা, ঊরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠের বেদনা প্রশমিত হয়।

রাস্নাং গুড়ূচীমেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধম্।
পিবেৎ সার্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে॥

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ—ইহাদের যথা-প্রস্তুত কাথ সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জাশ্রিত ও সার্ব্বাঙ্গিক আমবাতে সেবনীয়।

ধুস্তূরৈরণ্ড নির্গুণ্ডী বর্ষাভূ শিগ্রু সর্ষপৈঃ।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥

কনকধুতরা, এরণ্ড পত্র, নিসিন্দা, পুনর্নবা, সজনেমূলের ছাল ও শ্বেত-সর্ষপ একত্র (অল্প জলসহ) বাটিয়া প্রলেপ দিলে চিরজাত দারুণ শ্লীপদ আরোগ্য হয়। এই প্রলেপ বাতের ফোলা-ব্যথাও সত্বর উপশম করে।

রাস্না বৎসামৃতৈরণ্ড বলা গোক্ষুর সাধিতঃ।
কাথোঽন্ত্রবৃদ্ধি হন্ত্যাশু রুবূতৈলেন মিশ্রিতঃ॥

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, গোক্ষুর—এই সমুদায়ের যথাকৃত ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি উপশমিত হয়। এই পাচন আমবাত বা বাতব্যাধিরও উপকারী।

এরণ্ডঘটিত নানাবিধ রোগের আরো কয়েকটী শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ,—

(১) নবমমাসে গর্ভবেদনা আরম্ভ হইলে এরণ্ডমূল ও কাঁকলা শীতল জল সহ বাটিয়া জঠরোপরি লেপ দিলে ঐ যাতনা নিবারিত হয়। (২) ছাগদুগ্ধসহ এরণ্ডবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের উপশম হয়। (৩) এরণ্ডের পত্র, মূল বা ত্বক্ ছাগদুগ্ধ সহ পাক করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুঃসেচন করিলে দাহযুক্ত নেত্রাভিষ্যন্দ (চোক্‌উঠা) ভাল হয়। (৪) বৃহতী, এরণ্ডমূলের ছাল ও সৈন্ধবলবণ ছাগদুগ্ধে বাটিয়া বটি প্রস্তুত করিবে; ইহা ঘষিয়া চক্ষুর পাতায় অঞ্জন দিলে বায়ুজনিত নেত্রাভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়। (৫) বৃহতী, মুণ্ডী (ভুঁইকদম), এরণ্ডমূল ও কণ্টকারীর ক্বাথে সর্ষপতৈল সংযুক্ত করিয়া গণ্ডূষ করিলে ক্রিমিদন্তকের (দাঁতে পোকা হওয়ার) বেদনা ভাল হয়। (৬) এরণ্ডনাল চূর্ণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে মশক (মুখে বা অন্যত্র ছোট কাল দাগ) আরোগ্য হয়। শাস্ত্রে যথা—'ক্রবুনালাৎ তু চূর্ণেন ঘর্ষো মশকনাশনঃ।' এই পাঠের উক্তরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ অনুবাদই যেন সঙ্গত বোধ হয়, যথা—এরণ্ড নালের দ্বারা চূর্ণ ঘষিয়া ঘষিয়া দিলে মশকরোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ স্কট বলেন—এরণ্ড পত্র গরম করিয়া প্রসূতির স্তনে বাঁধিয়া রাখিলে স্তনদুগ্ধের স্রাব হইতে থাকে।

শাস্ত্রে এরূপ আদেশ আছে যে, বাতব্যাধির কৃষ্ণচতুর্মুখ ও যোগেন্দ্র রস নামক বটিকা প্রস্তুত করিবার সময় উহার ধাতুঘটিত উপকরণগুলি ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া ৩ দিন ধান্যস্তূপের মধ্যে অবস্থাপিত করিবে। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ও প্রণিধান যোগ্য যে, এরণ্ড পত্রের সংস্পর্শেও ধাতুগুলির মধ্যে গুণাধিক্য সঞ্চারিত হয়।

শাস্ত্রোক্ত বিষ্ণুতৈল, মহানারায়ণ তৈল, গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল, মহাচৈতস ঘৃত, বলারিষ্ট প্রভৃতির মধ্যে এরণ্ড প্রযুক্ত হয়।

এলবালুক।

বাঙ্গালা নাম—ঐ ; হিন্দী—এলুয়া ; ইংরাজী নাম জানা যায় নাই ; সংস্কৃত-পর্য্যায় :—এলবালুক মৈলেয়ং সুগন্ধি হরিবালুকং। এলবালুক মেলালু কপিথপত্র মীরিতম্॥ সংস্কৃত নাম—এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, এলবালুক, এলালু, কপিথপত্র। ইহার আরো কয়টী নাম এই—আলুক, গন্ধত্বক্, কুষ্ঠগন্ধি, কপিথ।

শাস্ত্রে ইহার যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহা এক প্রকার গৌরভযুক্ত ত্বক্, কতকটা বালুকার মত। ঐ ত্বকে কুড়ের ন্যায় গন্ধ আছে, কিন্তু গন্ধটী তদপেক্ষা তীব্র। ইহার সুগন্ধি, কুষ্ঠগন্ধি, গন্ধত্বক্ প্রভৃতি নামগুলি দ্বারাও এ কথার আভাস পাওয়া যায়। ইহা ভাবমিশ্র কর্ত্তৃক কর্পূরাদিবর্গের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; এতদ্দ্বারাও ইহার সুগন্ধিত্ব প্রমাণিত হয়। "কপিথপত্র" এই পর্য্যায়ের দ্বারা মনে হয় যে, এই গাছের পাতা কয়েৎবেলের পাতার মত। কিন্তু আজকাল "এলবালুক" নামে যে পদার্থ বণিকের দোকানে বিক্রীত ও কবিরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে উক্তরূপ বর্ণনানুযায়িক রূপ রসাদির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। কবিরাজগণ যাহা এলবালুক বলিয়া ব্যবহার করেন তাহা একপ্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাল বীজ—দেখিতে ঘুণের গুঁড়ার (কাঠে ঘুণ নামক পোকা ধরিলে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুঁড়া বাহির হয় তাহার) মত—কিন্তু কুচ্‌কুচে কাল ও মসৃণ। এই বীজ বাস্তুক (বেথো বা বাথুয়া) শাকের বীজ বলিয়া অনুমিত হয়।

কতদিন হইতে যে ঐ শাস্ত্র-বর্ণিত এলবালুকের স্থানে এই ক্ষুদ্র বীজ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা জানা যায় না, যেহেতু ৺গঙ্গাপ্রসাদ ৺রমানাথ প্রভৃতি মৃতমহাত্মাদিগের প্রপিতামহ কবিরাজগণও না কি ইহাই ব্যবহার করিতেন।

এই বীজের বহুকাল হইতে প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, সুগন্ধি ত্বক না হইলেও ইহার তৎসহ গুণ-সাদৃশ্য স্বীকৃত হইয়াছিল নতুবা প্রতিনিধিরূপে প্রচলিত হইল কেন ? অথবা এমনও হইতে পারে না কি যে, এলবালুককে

ভ্রমক্রমে বালুকার (বালির) মত জ্ঞান করিয়া প্রথমে কেহ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ অনুসন্ধিৎসাহীন গতানুগতিক বিধি অনুযায়ী উহাই তদবধি ব্যবহার হইয়া আসিতেছে? যাহা হউক আমাদের ধারণা এই—প্রকৃত এলবালুক, বচ, কুড়, লবঙ্গ প্রভৃতির সমজাতীয় জিনিস; বস্তুতঃ ইহা শাস্ত্রোক্ত নানাপ্রকার তৈলের মধ্যে উপকরণ-স্বরূপ রহিয়াছে দেখা যায়; সম্ভবতঃ প্রধানতঃ সৌগন্ধ্যের জন্যই অন্তর্ভূত থাকে। কোন কোনও ঔষধেও ইহা আছে, যেমন—বাসা কুষ্মাণ্ডখণ্ডের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এরূপ প্রসঙ্গে প্রচলিত রসগন্ধহীন ক্ষুদ্রবীজ না দিয়া বচ, কুড় লবঙ্গাদির মধ্যে কোনও একটী বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করাই উচিত; অন্ততঃ বাসা কুষ্মাণ্ডখণ্ডে তৎপরিবর্ত্তে কুড় দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে হয়। আশা করি চিন্তাশীল সুধীব্যক্তি এ বিষয়ে প্রণিধান ও অনুসন্ধান করিবেন এবং সঙ্গতমীমাংসায় উপনীত হইলে আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

এলালুং কটুকং পাকে কষায়ং শীতলং লঘু।
হন্তি কণ্ডু ব্রণচ্ছর্দ্দি তৃট্কাসারুচি হৃদ্রুজঃ॥
বলাস বিষপিত্তাস্র কুষ্ঠ মূত্র গদ ক্রমীন্॥

রস—কষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—শীতল; গুণ—লঘু, কণ্ডু, ব্রণ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি ও কফনাশক, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ ও ক্রিমিহর। প্রভাব—মূত্ররোগ, হৃদ্রোগ ও বিষনাশক। প্রয়োগ—শুধু এলবালুকের প্রয়োগ আমরা কুত্রাপি দেখি নাই; ইহা প্রধানতঃ বায়ুরোগের তৈলে নিক্ষিপ্ত হয়। রক্তপিত্তের বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডে এলবালুক আবশ্যক হয় ইহা উক্ত হইয়াছে।

এলা।

বাঙ্গালা নাম—এলাচ্ বা এলাইচ্; হিন্দী—ইলাইচী; ইংরাজী—Cardamum. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—(বড় এলাচের) এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপিচ। ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ॥ (ছোট এলাচের) সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুত্থা কোরঙ্গী দ্রাবিড়া ত্রুটিঃ। বড় এলাচের সংস্কৃত নাম—এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটি।

ছোট এলাচের সংস্কৃত নাম—সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটি।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ গ্রন্থে স্থূলৈলা ও সূক্ষ্মৈলা এই দুই নামে বড় ও ছোট এলাচ অভিহিত হইয়াছে। শুধু 'এলা' বলিয়া উল্লেখ থাকিলে বড় এলাচই বুঝিতে হইবে।

বড় এলাচ জাবা, সুমাত্রাদ্বীপে এবং ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। ইহা এক প্রকার আদাজাতীয় নাতিদীর্ঘ গাছের ফল আর ছোট এলাচ যাহা গুজরাতী নামে প্রসিদ্ধ সে গুলি মালাবার অঞ্চলের পর্ব্বতে, ত্রিবাঙ্কুর ও মান্দ্রাজের পশ্চিমকূলস্থ পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। ইহাও এক প্রকার ঐ জাতীয় গুল্মের ফল। উক্ত গুল্মের পত্র পুষ্প উভয়ই দ্বিগুণ সুগন্ধি। ঐ পুষ্প হইতে থবকে থবকে যে সকল শিম্বী জন্মে তাহাই এলাইচ। এলাইচের গাছ মূল হইতে জন্মে, গাছ হইতে নহে।

বড় এলাচের গুণ।

স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তাস্র কণ্ডূ শ্বাস তৃষাপহা।
হৃল্লাস বিষবস্ত্যাস্তশিরোরুগ্ বমি কাসনুৎ॥

বড় এলাচের রস—কটু; বিপাক—কটু; বীর্য্য—রুক্ষোষ্ণ; গুণ—লঘু, অগ্নিকর, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, কণ্ডূ, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস (গা বমি-বমি) বিষদোষ, বস্তি, মুখ ও মস্তকের রোগ এবং বমি-কাসহর।

রাজ-নির্ঘণ্ট মতে—বড় এলাচ শীতল তিক্ত উষ্ণ সুগন্ধি পিত্তঘ্ন কফঘ্ন মল আর্ত্তি বান্তিনাশক ও উত্তেজক।

ছোট এলাচের গুণ।

এলা সূক্ষ্মা কফ শ্বাস কাসার্শো মূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ।
রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরী মতা॥

ছোট এলাচের রস—কটু; বিপাক—কটু; বীর্য্য—শীত; গুণ—লঘু, কফ শ্বাস কাস অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক ও বায়ুনাশক (কোষ্ঠাশ্রিত ও [illegible] আক্ষেপাত্মক বায়ুনাশক)।

পাগলের নালিশ।

ভগবান্! তোমারি কাছে আমার একটী বড় নালিশ আছে। তোমাকে ত দেখ্‌তে পাই না!—পাবার আশাও নাই; কেননা তুমি খোসামুদের বশ। যারা তোমার খুব গুণ গায়, তাদের কাছেই তোমার দরজা খোলা। আমি পাগল মানুষ! খোসামোদ উমেদ আমার বড় আসে না; কালে ভদ্রে যদিও একটু হাঁটুগেড়ে ব'সে তুমি, হর্ত্তা, তুমি কর্ত্তা—ইত্যাদি বোল চালের যোগাড় করিতে যাই, অমনি আমার উনপঞ্চাশ আসিয়া সব উল্টা পাল্টা করিয়া দেয়। সুতরাং বেশ্ বুঝেছি, তোমাকে দেখা পাবার আশা আমার নাই; আর এক্‌টা কয়েদা করেছ ভাল! বল দিয়েছ কম, স্রোত করেছ ভয়ানক। আরো বলিতেছ—ওরে পাগ্‌লা! আমি এই নদীর পারে আছি। যদি স্রোত কাটাইয়া উজানে গায়ের জোরে আমার দিকে আসিতে পারিশ্, তা হলেও আমার কাছে পৌঁছিতে পার্‌বি। ও বাপ! ফরমাস্‌টা মন্দ নয়। স্রোত ঠেলিয়া পৌঁছান দূরে থাকুক, জলে পা দিলেই হাঙ্গর-কুমীর সাপ অজাগর হাঁ করিয়া আসে। আমা দ্বারা বাপু, এ কাজ হবে না। এত কল্লে, তবে দেখা পাব? সাফ্ বল্লেই হয়, যে দেখা দেবে না। যা হোক বুঝেছি, তোমাকে দেখা পাবার আশা আমার নাই। তাই, এই পত্র লিখিতেছি।

বলি, ওগো ঠাকুর! তোমার এই জগদ্‌জোড়া কারখানাটীর মধ্যে এত ভাত কাপড়ের কষ্ট কেন? তুমি সোণা, রূপো, তামা, পিতল, কোক্‌কয়লা ছাইভস্ম এত জিনিসের খনি মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছ। আর তার পেটের জ্বালার দিকে কৃপাদৃষ্টি করিয়া ভাত-রুটীর খনি করিয়া দিতে পার নাই?—বেশ একটু মাটী খুঁড়িলেই থালাথালা ভাত উঠিবে এমন বন্দোবস্ত করিলে তোমার পক্ষে কি লোস্‌কান্ ছিল? পশু পক্ষীকেও আমার চেয়ে ভাল-বেসেচ—ওরা যেদিকে চোক্ চায় সেই দিকে গিয়ে দাঁড়ালেই ছুটো খেতে পায়—আর কালকার ভাবনাটা ভাব্‌তে হয় না! আবার আমার শরীরটা এমন করে গড়েছ যে একটা ঢাক্‌না দিলে চলে না,—না দিলে লোকে থুথু দেয়, গালী দেয়, মারে। তা বাপু, তাল গাছ, তমাল গাছ, এত বাজে গাছ

পড়তে পেরেছ আর কাপড়ের একটা গাছ করতে পার নাই—বেশ অম্‌নি কাপড় ঝুলে ঝুলে থাকত, টান্ দিয়ে দিয়ে নিতুম। এ বিষয়েও দেখ্‌চি পশু-পাখীকে অধিক খাতির করেছ। সে যাক্, পেটে খাবার, পরণে কাপড়, নাই বা রহিল। আমার শরীরে যে এত বায়ুর প্রকোপ, এর কি ঔষধ তোমার ভাঁড়ে কিছু নাই? দেখ, বায়ুতে আমার সর্ব্বাঙ্গেই শূলযাতনা। সর্ব্বাগ্রে ত বড় চক্ষুশূলে ভুগিতেছি—পরের শ্রী, উন্নতি, সুখ দেখিলে ওটা বড়ই বাড়ে, বেদনা অসহ্য হয়। পৃষ্ঠশূলটা যারপরনাই কষ্ট দেয়। নিজের কাজ হাজার হাজার করিতে পারি, পরের ভার পড়িলেই পিঠের ব্যথাটা অসামাল হইয়া উঠে। তার পরে কর্ণশূল—ও বাবা! সৎকথা ও হরিনামের ঠাণ্ডা বাতাস বহিলেই ঐ ব্যথাটা অত্যন্ত বাড়ে, তখন মুখ ফিরাইয়া কাণে তুলো না গুঁজিলে থাকতে পারি না। আর সব চে' কষ্টকর সেই মাথাঘুরুনি, এই ঘুরুনিতেই আমাকে সারে—পর-যুবতীর আধো-ঘোম্‌টা-ঢাকা মুখখানি দেখিলেই মাথা ঘুরিয়া যায়। বাপ্‌রে বাপ্! ঘোমটার ভিতরে কি শত সূর্য্যের বাস? নইলে দৃষ্টিমাত্র প্রচণ্ড রোদ্দুরের মত মাথাটা অমন করিয়া উঠে কেন? যা হ'ক, এর ওষুধ তোমাকে আমায় দিতেই হইবে। নহিলে ছাড়িব না। ভাল কথা!—আর এক মূর্চ্ছাবায়ু আমার আছে, তাতে হাত-পা খেঁচিয়া, চোক লাল করিয়া কত কি বকিয়া অস্থির হইয়া পড়ি—লোকে বলে পাগলা চটেছে! তা নয় ঠাকুর, ও আমার ভয়ানক রোগ, ওরও একটি ওষুধ চাই। আরো অনেক রোগ আছে তা তোমাকে দ্বিতীয় পত্রে জানাব। এখন পত্রপাঠ এই গুলির বন্দোবস্ত আগে কর। তোমার পায়ে ধরি এই গুলি আগে কর। ভাল কথা, পত্র খানি দিব কোন্ পোষ্টাফিসে? কোথায় দিলে তুমি পাবে! তুমি যে নদীর পারে আছ বলেছ, সে বাড়ীর নম্বর কত? খোলসা না লিখিলে চিঠী পৌঁছাবে না! শুনেছি গৌরাঙ্গ-মুন্‌সীর ডাক-ঘরে পত্র দিলেই হবে, কিন্তু আমার ত টিকিটের পয়সা নাই! ঠাকুর, একটু বলিয়া দিবে কি?

পতি-দেবতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাস্তবিক সেকালের রমণীরা এইরূপ নিয়মে চলিত কিনা, তাহার একটা সাক্ষ্য চাই। তজ্জন্য সীতা ও দ্রৌপদীর কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বনগমনকালে রামচন্দ্র পথে অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হন। অনসূয়া (অত্রিপত্নী) সীতাকে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসে আগতা দেখিয়া তাঁহার কার্য্য পতিব্রতোচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া কথাচ্ছলে তাঁহাকে পতিব্রতার ধর্ম্ম সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিলেন। সীতা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,— "আর্য্যে, আমাকে আপনি যে সমস্ত উপদেশ দিলেন, ইহা আমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে, পতিই যে স্ত্রীর গতি ইহা আমার জানা আছে। আমার স্বামীর কুৎসিত আচার হইলেও, যখন তিনি আমার নিয়তপূজ্য; তখন গুণশ্লাঘ্য, দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরানুরাগ, ধর্ম্মাত্মা, পিতামাতার সদাপ্রিয় আমার স্বামীকে যে আমি পূজা করিব, ইহাতে আর বিচিত্র কি? রমণীর যে পতিশুশ্রূষা ব্যতীত অন্য তপস্যা নাই তাহা আমার বিশেষ জানা আছে।"

তাহার পর দ্রৌপদীর কথা,—সত্যভামা একদিন দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দ্রৌপদী, তুমি কেমন করিয়া এই বায়ু চন্দ্র বরুণের মত তোমার পাঁচটি স্বামীকে বশ করিয়াছ? তাঁহাদের সঙ্গে তুমি কি রকম ব্যবহার কর যে, তাঁহারা কখন তোমার উপর রাগ করেন না? তাঁহারা সর্ব্বদা তোমার মুখ চাহিয়া থাকেন, কখন তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন না, ইহা কিসে হইল? তুমি কি কোন ব্রত করিয়া এইরূপ করিয়াছ, না কোন মন্ত্রজপ করিয়া এরূপ করিয়াছ, না তোমার কোন ঔষধ জানা আছে, তাহা দ্বারা এরূপ করিয়াছ? অথবা তুমি কোন মন্ত্র পড়িয়া স্নানাদি কর বলিয়া এরূপ হইয়াছে! কিসে এরূপ হইল, আজ তাহা আমাকে বলিতে হইবে। যাহাতে কৃষ্ণ আমার বশীভূত হন, তাহার উপায় তুমি বলিয়া দাও।

সত্যভামা দ্রৌপদীকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উত্তর শুনিতে বোধ হয় এখনকার সকল স্ত্রীলোকই ব্যস্ত হইবেন, কিন্তু দ্রৌপদী যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা করিয়া সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এখনকার রমণীরা সে উপদেশ মত কাজ করিয়া আপন আপন স্বামীকে বশ

করিতে পারিবেন কি? যাহা হউক দ্রৌপদী যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ঈশ্বরেচ্ছায় দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামী ছিল, কিন্তু সত্যভামার এক স্বামী; তবে সত্যভামার সপত্নী অনেকগুলি ছিল, কাজেই সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে প্রায় পাইতেন না, এজন্য দ্রৌপদীর নিকট স্বামীকে বশ করিবার উপায় শিখিতে চাহিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর নিকট ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করিবার একটু বিশেষ কারণও ছিল। সত্যভামা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার একটি স্বামী, তাঁহাকেই তিনি বশ করিতে পারেন না, আর দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামী, তিনি কিন্তু পাঁচজনকেই বশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপর দ্রৌপদীর যে সপত্নী ছিল না এমন নহে; সেই সকল সপত্নী থাকিতেও যে দ্রৌপদী পাঁচটি স্বামীকে সেরূপ বশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইয়া সত্যভামা স্বামী বশ করিবার জন্য দ্রৌপদীকেই যথার্থ গুরুমহাশয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং একদিন তাঁহাকে লাজ লজ্জার মাথা খাইয়া ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন। সত্যভামার প্রশ্ন শুনিয়া দ্রৌপদী বলিলেন,—

"অসৎ স্ত্রীণাং সমাচারং সত্যে মামনুপৃচ্ছসি।
অসদাচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুকীর্ত্তনম্॥
অনুপ্রশ্নঃ সংশয়ো বা নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
যথা হ্যুপেতা বুদ্ধ্যা ত্বং কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া॥
যদৈব ভর্ত্তা জানীয়ান্মন্ত্রমূলপরাং স্ত্রিয়ং।
উদ্বিজেত তদৈবাস্যাঃ সর্পাদ্বেশ্মগতাদিব॥
উদ্বিগ্নস্য কুতঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং।
ন জাতু বশগা ভর্ত্তা স্ত্রিয়াঃ স্যান্মন্ত্রকর্ম্মণা॥
জলোদরসমাযুক্তাঃ শ্বিত্রিণঃ পলিতাস্তথা।
অপুমাংসঃ কৃতাঃ স্ত্রীভির্জড়ান্ধবধিরাস্তথা॥
পাপানুগাস্তু পাপাস্তাঃ পতীনুপহৃজন্ত্যত।
ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্ত্তুঃ স্ত্রিয়া কার্য্যং কথঞ্চন॥ (মহাভারত)

"সত্যভামা, তুমি জানিয়া শুনিয়া অসতী স্ত্রীদিগের ব্যবহারের কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ। অসৎ লোকের আচরণের কথার আলোচনা করিতেছ

কেন ? এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা বা তাহার কিছুই উত্তর দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে আবার তুমি বুদ্ধিমতী ও কৃষ্ণের প্রিয়মহিষী। স্ত্রী মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা, ঔষধপালা দ্বারা স্বামীকে বশ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, এ কথা যে দিন হইতে স্বামী জানিতে পারিবেন সেই দিন হইতেই সেই স্ত্রীকে গৃহস্থিত সর্পের মত ভাবিয়া শঙ্কিত থাকিবেন। সত্যভামা, যাহারা শঙ্কিত থাকে, তাহাদের শান্তি থাকে না, যাহারা অশান্ত তাহাদের সুখ হয় না। আর যথার্থ পক্ষে মন্ত্রতন্ত্র বা ঔষধে স্বামী কখন বশ হন না। অনেক স্ত্রী ঔষধের দোষগুণ না জানিয়া স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে উদরী, ধবল প্রভৃতি পীড়ায় চিররুগ্ন, জড়, অন্ধ, বধির, পুংস্ত্বহীন ও অকালবৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ পাপিষ্ঠা রমণীরা কেবল স্বামীর অনিষ্টই করিয়া থাকে।"

দ্রৌপদী এইরূপে সত্যভামার কথায় উত্তর দিবার আগেই তাঁহাকে বেশ দুকথা মিটাকড়া শুনাইয়া দিলেন ; তাহার পর বলিলেন,—

"বর্ত্তাম্যহন্তু যাং বৃত্তিং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
তাং সর্ব্বাং শৃণু মে সত্যাং সত্যভামে যশস্বিনি ॥
অহঙ্কারং বিহায়াহং কামক্রোধৌ চ সর্ব্বদা।
সদারান্ পাণ্ডবান্নিত্যং প্রযতোপচরাম্যহং ॥
প্রণম্য প্রতিসংহৃত্য নিধায়াত্মানমাত্মনি।
শুশ্রূষুর্নিরভিমাণা পতীনাং চিত্তরক্ষিণী ॥
দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানা দুঃস্থিতাদ্দুরবেক্ষিতাৎ।
দুর্বাসিতাদ্দুর্ব্রজিতাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি ॥
সূর্য্য বৈশ্বানরসমান্ সোমকল্পমহারথান্।
সেবে চক্ষুর্হণঃ পার্থানুগ্রবীর্য্য প্রতাপিনঃ ॥
দেবো মনুষ্যো গন্ধর্ব্বো যুবা চাপি স্বলঙ্কৃতঃ।
দ্রব্যবানভিরূপো বা ন মেঽন্যঃ পুরুষোমতঃ ॥"

সত্যভামা, পাণ্ডবগণের সঙ্গে আমি যেরূপ ব্যবহার করি, তাহা বলিতেছি শুন। আমি অহঙ্কার, সখ, রাগ এ সমস্ত দূর করিয়া সস্ত্রীক পাণ্ডবগণের সর্ব্বদা সেবা করিয়া থাকি। (স্বামীর অন্য স্ত্রীর প্রতি দ্বেষ করিলে স্বামী সন্তুষ্ট হন না বরং সপত্নীকে আদর করিলে স্বামী অন্ততঃ চক্ষুলজ্জায় পড়িয়াও

আদর করিয়া থাকেন)। আমি স্বামীকে ভালবাসি, ইহা বুঝিয়া, স্বামীর নিকট হইতে আদরের আশা না করিয়া মনকে শান্ত রাখি আর অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সেবা করিয়া পতির মনরক্ষা করিয়া থাকি। মন্দ আলাপ, নির্লজ্জ বা নিন্দনীয় ভাবে থাকা, মন্দভাবে বা লজ্জাভাবে দেখা, নির্লজ্জভাবে বসা, নির্লজ্জভাবে বা নিন্দনীয় স্থানে যাওয়া অথবা মনোগত অভিপ্রায় জানাইবার জন্ত আড়নয়নে ইসারা করা ইত্যাদিকে আমি বড় ভয় করিয়া চলি এবং কখন করি না। ঐ সকল বিষয়ে সতর্ক হইয়া সর্ব্বদা স্বামিসেবা করিয়া থাকি। কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি সুন্দর বেশভূষাধারী, কি ধনবান্, কি রূপবান্ স্বামীভিন্ন অন্ত কোন পুরুষকে আমি ভাবি না, চাহি না।

"না ভুক্তবতি না স্নাতে না সম্বিষ্টে চ ভর্ত্তরি।
ন সংবিশামি নাশ্নামি সদা কর্ম্মকরেষপি ॥
ক্ষেত্রাদ্বনাদ্বা গ্রামাদ্বা ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
প্রত্যুত্থায়াভিনন্দামি আসনেনোদকেন চ ॥
প্রমৃষ্টভাণ্ডা মৃষ্টান্না কালে ভোজনদায়িনী।
সংযতা গুপ্তধান্যা চ সুসংমৃষ্টনিবেশিনা ॥
অতিরস্কৃতসম্ভাষা দুঃস্ত্রিয়ো নানুসেবতী।
অনুকূলবতী নিত্যং ভবাম্যনলসা সদা ॥
অনর্ম্মচাপি হসিতং দ্বারিস্থানমভীক্ষ্ণশঃ।
অবস্করে চিরস্থানং নিষ্কুটেষু চ বর্জ্জয়ে ॥
অতিহাসাতিরোষৌ চ ক্রোধস্থানঞ্চ বর্জ্জয়ে ॥
নিরতাহং সদা সত্যে ভর্ত্তৃণামুপসেবনে।
সর্ব্বথা ভর্ত্তৃরহিতং ন মমেষ্টঃ কথঞ্চন ॥"

স্বামী না স্নান করিলে, না আহার করিলে, না ঘুমাইলে আমি স্নান করি না, আহার করি না, ঘুমাই না। স্বামী ক্ষেত্র, বন, গ্রাম হইতে বাড়ী আসিলে (অর্থাৎ বেড়াইয়া-চেড়াইয়া অথবা কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিলে) আমি উঠিয়া তাঁহাদিগকে পা ধুইবার জল ও বসিবার আসন দিয়া থাকি। ঘরের ভোজন-পাত্রাদি (থালা ঘটিবাটী গেলাস ইত্যাদি) সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া রাখি, খাদ্যদ্রব্য সকল যত্ন করিয়া বিশুদ্ধ রাখি (অর্থাৎ ঢাকা দিয়া

গুছাইয়া রাখি), ধান্যাদি নষ্ট না হয়, এরূপে রক্ষা করি, ভোজনের উচিত সময়ে তাঁহাদিগকে আহারাদি দিয়া থাকি (ইহা দ্বারা এমন বোধ হয় না যে দ্রৌপদীকে বাসন মাজিয়া ভাত খাইতে হইত, ধান্য ভানিয়া খশুর ঘর করিতে হইত।) আমায় তিরস্কার করিলে তাহার উত্তর দিই না, মন্দস্বভাব স্ত্রীলোকের সেবা করি না, আলস্য না করিয়া স্বামীর মনে সর্ব্বদা চলিয়া থাকি। পরিহাস ভিন্ন হাসি না, ঘরের বা বাড়ীর দরজায় অধিকক্ষণ থাকি না, মলমূত্র ত্যাগের অছিলায় বাহিরে বা বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী বাগানে (বাড়ীর খোলা ছাদে রাস্তার ধারের জানালায় কথা একালে বলিতে পারা যায়) অধিকক্ষণ থাকি না। অধিক হাস্য, অধিক রাগ ও অধিক রাগের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বদা স্বামীর সেবা করি। স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে আমার কখন ইচ্ছা হয় না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

সমালোচনা।

প্রেম গাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী প্রণীত, মূল্য ১৲। কাপড়ের মলাট, ১।০। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে বিলক্ষণ পরিচিতা হইয়াছেন। তিনি প্রকৃত স্বভাব-কবি—তাঁহার প্রায় সকল লেখাই অযত্ন-সম্ভূত, নির্ম্মল স্রোতঃপ্রবাহের ন্যায় দেখিতে পাই; আজকাল অনেক নবীনা লেখিকা শুধু কবিতাই লেখেন—এমন সব কবিতা যাহাতে কথা সাজানো বেশী, ভাব কম—নিংড়াইলে জলময় তরমুজের মত একটুখানি শাঁসমাত্র থাকে। সুখের বিষয় ইনি সে শ্রেণীর উপরে অবস্থিতা। অধিকন্তু নবীনা দিগের গদ্যপ্রবন্ধে যেন "প্রবেশ নিষেধ", কিন্তু শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা এতাদৃশ যুক্তি-গর্ভ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উচ্চদরের প্রবন্ধ সমুদায় লেখেন যাহা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষের লেখা হইলেও মহা প্রশংসা-যোগ্য হইত, এইরূপ সিদ্ধহস্তা লেখিকার প্রেমগাথা যে অতি সুন্দর জিনিস হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়িয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি ও লেখিকাকে মনে মনে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়াছি—হতাশের আক্ষেপ, নিঃস্বার্থ প্রেম, প্রভাতসঙ্গীত, এসনা, বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া, তারিকা, বিদায়োপহার, পাগলিনীর চেয়ে থাকা, রবির

প্রতি কমলিনী, নবীন তপন, হতাশপ্রণয়ী, স্বপন, প্রতারিত প্রেম, ছায়াবাজী, নীরবস্নেহ, মহাপ্রেম।

নগেন্দ্রবালা বেথুন-কলেজে পড়া, বিলাস-ব্যাপৃতা, গৃহকর্ম্মবর্জ্জিতা আধুনিক ছাঁচের স্ত্রীলোক নহেন, ইনি গৃহস্থালী-নিয়মা, স্বামিপদাশ্রিতা, পূজা-সদাচার নিরতা, অতীব সাত্ত্বিক প্রকৃতি, শান্তশীলা রমণী অথচ কৈশোর-বয়স্কা। অবস্থা-সাচ্ছল্য সত্ত্বে নিজহস্তে রন্ধনাদি প্রত্যেক গৃহকর্ম্ম করেন—কাগজ কলম একত্র করিবার সময় ইঁহার বড়ই কম, তদুপরি আবার ইনি অত্যন্ত রোগজীর্ণ, স্বাস্থ্যসুখে একান্ত বঞ্চিত—এরূপ অবস্থায় যে ইনি এরূপ লেখেন এটা কম গুণপনার কথা নয়। আশা করি সহৃদয় সদ্বুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেই 'প্রেম গাথা' পড়িয়া দেখিবেন।

ভারত-দর্পণ—শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় কৃত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর দোকানে বা ১৭৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট গ্রন্থকারের নিকটে পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি ভলিউম্ (১২ খণ্ড) গ্রাহকের পক্ষে ৩৲, অপরের পক্ষে ৫৲। ইহা রাধিকাবাবুর এক সুমহান্ কীর্ত্তিস্তম্ভ! রত্নগর্ভ ভারতের অনন্ত অমূল্য রত্নাবলি ইহাতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ভূগোল ও ইতিহাস, দ্রব্য ও বনৌষধি এবং জাতি ও সম্প্রদায় এই চারি বিভাগে সুন্দর পারিপাট্য সহ এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। লেখা সরস, সুগম, সুশৃঙ্খল ও মনোহর; সুতরাং আমাদের বিশ্বাস যাহাদের সদ্‌গ্রন্থ পড়ার নেশা আছে, তাহারা এই সুধাসমুদ্রে ডুবিয়া আনন্দে আত্মহারা হইবেন; নভেল-প্রিয় ব্যক্তিরাও ইহার অভ্যন্তরস্থ পুরাণ ইতিহাসাদির মনোরঞ্জন চিত্রে উপন্যাস-পিপাসা মিটাইতে পারিবেন। এ গ্রন্থ পড়িলে বিজ্ঞ হওয়া যায় ও নানা জ্ঞানের কথা বলিয়া মজ্‌লিস্ জম্‌কানো যায়। পঞ্জিকা ও রামায়ণ-মহাভারতের মত ইহা ঘরে ঘরে বিরাজমান হওয়া উচিত। গ্রন্থখানি লিখিয়া রাধিকাবাবু প্রত্নতত্ত্ববিনোদ উপাধি পাইয়াছেন।

প্রয়াস—মাসিক পত্র, বার্ষিক ১।০; লেখকগণ নাকি নবীন, কিন্তু লেখা দেখিলে তাহা মনে হয় না। প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। ঠিকানা—৩২৭ বীডন ষ্ট্রীট।

REG: No. C, 87.

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲। আগষ্ট।, ১৩০৬, ভাদ্র।

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—বিবিধ সংবাদ, ভাষানুবাদ, দ্রব্যগুণ বিচার, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, লক্ষ টাকার কথা, জাতিভেদ সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা, চিকিৎসা-সংবাদ, গুণবত্তার প্রশংসা।

"ঋষি"-পত্রিকার নিয়ম।

১। "ঋষি" বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের "ঋষি" না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার জন্ম আমরা দায়ী নহি। আকার (অন্যূন) ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা।

২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই কথাটার উল্লেখ করিবেন।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। } { ১৩০৬ ভাদ্র। আগষ্ট। ১৮৯৯

বিবিধ সংবাদ।

গুণের সম্মান।

স্ত্রী। হ্যাঁগা! আজকাল যে প্রায় সকল সংবাদ পত্রেই একটী যুবকের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই, উনি কে?

স্বামী। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে, উনি বোম্বাই দেশীয় একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, বিলাত গিয়া লেখাপড়া শিখিয়া তথাকার র‍্যাংলার পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন; এমন গুণগ্রামের পরিচয় অদ্যাবধি কোনও ভারতবাসীই বিলাত গিয়া দেখাইতে পারেন নাই। তাই চতুর্দ্দিকে এরূপ প্রশংসাধ্বনি উঠিয়াছে।

স্ত্রী। সে পরীক্ষায় কি সাহেবের ছেলেরাও প্রার্থী ছিল?

স্বামী। ছিল বৈকি? সাহেব ই ত সব?

স্ত্রী। পরীক্ষক ছিলেন কাহারা?

স্বামী। সবই ইংরেজ!

স্ত্রী। তবেত বড় আশ্চর্য্য! স্বজাতির উপরে, পরাজিত প্রজাকে উচ্চস্থান দিতে ইংরেজেরা কোন প্রাণে সমর্থ হইলেন? তাঁহাদের সংকোচ বোধ হইল না? তাঁহাদের খুব ত বুকের পাটা!

স্বামী। ইংরেজের ত ঐটীই প্রধান গুণ! উঁহারা আত্মগরিমার উদ্দেশ্যে সত্যের অপলাপ করেন না।

আনন্দের বিষয়—পূর্ব্বকালে কালিদাস বলিয়াছিলেন "কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিং?" অর্থাৎ যদি যথার্থ কবিতাশক্তি থাকে, তবে রাজা হইয়া আবশ্যক কি? কেননা, রাজা প্রজাসম্বন্ধীয় নানা বিবাদ-বিপ্লব সহ্য করিয়া তবে রাজত্বের সুখ অনুভব করেন, কিন্তু কবি রাজাকে দুটী মিষ্ট কথার কুহকে নিমগ্ন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই রাজত্বের অংশ ভোগ করিয়া থাকেন। পশ্চিম প্রদেশে মাড়বার-ভূমিতে মুরারি দান নামক মহাকবি যোধপুরাধিপতি সর্দার সিংহের নিকটে এইরূপ সম্মান সূচক এক লক্ষ টাকা, ১২৫ খানি গ্রাম ও মণি কাঞ্চনাদি পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এই পোড়া-বঙ্গ দেশে এরূপ প্রবৃত্তি লোকের পূর্ব্বে ছিল না। তাই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন অন্তিমে মহা-অভাবে মহাকষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয়, ঈদৃশ সৎ-কার্য্যের দিকে সকলেরই এক্ষণে মনের টান্ দেখা যাইতেছে। তাই ত্রিপুরা-ধিপতি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাবু গগনেন্দ্র ঠাকুর, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মগণ অন্ধ কবি হেমচন্দ্রকে আর্থিক সাহায্য করিতেছেন। ইহা দেখিয়া অন্য কবিদেরও বুকে ভরসা জন্মে।

মহারাণীর মহাগুণ—মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক্ষণে বয়োজীর্ণা ও দৃষ্টিশক্তি-হীনা, তথাপি যৌবনের ন্যায় তেজস্বিনী আছেন। তিনি এখনও পারিবারিক সমস্ত খুঁটীনাটি ও রাজকার্য্যের সকল আবশ্যক বিষয় নিজে না দেখিলে তৃপ্ত হন্‌না।

নূতন আবিষ্কার—(১) একস্‌রেজ্ নামক একটী রাসায়নিক যন্ত্রে মানুষের অস্থি-মাংসময় আবরণ কাচের মত স্বচ্ছ হইয়া যায়, এবং তদ্বারা ভিতর-কার নাড়ীভুঁড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। (২) যে কোনও গান, বক্তৃতা বা কথা চিরকালের তরে বাক্সের মধ্যে ভরিয়া রাখা যায়। যতদিন পরে যখন ইচ্ছা তখনই ঐ বাক্স খুলিয়া ঐ গান প্রভৃতি শুনিতে পাইবেন। (৩) সাধারণ ফটোগ্রাফে ছবি ত নড়ে চড়েনা, কিন্তু এক রকম নূতন ফটোগ্রাফ হইয়াছে তাহাদ্বারা মানুষের দৌড়াদৌড়ী, হাত পা নাড়া প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ ভঙ্গিই চির-স্থায়ী করিয়া রাখা যায়। (৪) একরূপ যন্ত্র সৃষ্ট হইতেছে তদ্দারা বিনাতারে দূরবাসী বন্ধুগণ পরস্পর কথা কহিবেন। (৫) আর এক রকম কল উদ্ভা-

বিত হইতেছে তাহাদ্বারা মানুষের মুখ দেখিয়া মনের চিন্তা বুঝিতে পারা যাইবে। এসকল ভাবিলে আবিষ্কারক পাশ্চাত্য জাতিকে দেবতা বলিয়া মনে হয়।

চাসে ম্যালেরিয়া নাশ।—লাঙ্গল চষিয়া ম্যালেরিয়া দূর করিতে পারা যায়, তাহা বোধ করি আমাদের অনেক পাঠকেই বিদিত আছেন। বিলাতের একজন ডাক্তার ইতিমধ্যে যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে কৃষিকার্য্যের জন্য মাটীতে যে গো মনুষ্যাদির মলমূত্র মিশাইতে হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যহানির কোন সম্ভাবনা নাই। আপাততঃ উহা হানিজনক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল মলমূত্র যতক্ষণ মাটীতে থাকে ততক্ষণ একটু দোষজনক হয় বটে, কিন্তু উদ্ভিদের অঙ্গপোষণে প্রযুক্ত হইলে আর কোন ভয় থাকে না। পল্লীগ্রামের মলমূত্র জমির সাররূপে পরিণত হয় বলিয়া তথায় কতকগুলি রোগ দৃষ্ট হয় না।

যথার্থ নিরামিষাশী—দুগ্ধ অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া নিরামিষভোজী বলিয়া শ্লাঘা করা যায় না, প্রকৃত নিরামিষ-ভোজী হইতে হইলে, দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা মাখন প্রভৃতি সকলকেই ত্যাগ করিতে হয়। যেহেতু যে জন্তুর দুগ্ধ, তাহাতে সেই জন্তুর মাংসরস আছে।

কলিকাতার প্লেগ—কলিকাতায় যাহাতে প্লেগ প্রবিষ্ট না হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভগবৎকৃপায় এ চেষ্টা অদ্যাপি নিরর্থক হয় নাই। বর্ত্তমান আগষ্ট মাসে বিলাত হইতে প্লেগ কমিশনের রিপোর্ট ভারতে আসিয়া পহুঁছিবে। উহা দেখিবার জন্য অনে-কেরই কৌতূহল আছে।

রেভিনিউ ও পবলিক্ ওয়ার্কস্—ডিপার্টমেণ্ট ২৮শে অক্টোবর হোম্‌ডিপার্টমেণ্ট ৩১শে অক্টোবর, ফাইনেন্‌স্ ৪ঠা নবেম্বর, মিলিটারী ১০ই নবেম্বর। উপরোক্ত তারিখে সিমলা-শৈলের আফিস্ সকল বন্ধ হইবে। কেবল লেজিস্ লেটিভ ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে এখনও তারিখ স্থির হয় নাই।

লোক গণনা—আগামী ১৯০১ সালে এবার যে লোক গণনা হইবে, তাহার কমিশনার পদে, মিঃ এইচ্ এইচ্ রীজলি সাহেব নিযুক্ত হইবেন। তিনি অক্টোবর মাসে স্বদেশ হইতে প্রত্যাগত হইবেন।

দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত—দাক্ষিণাত্য এবং পাঞ্জাব প্রদেশে শস্যের অবস্থা ভাল নহে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছে, গবাদির ভক্ষ্য তৃণ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। এখন খুব বৃষ্টির আবশ্যকতা। আগরা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, রায় বেরিলী প্রভৃতি স্থানে শস্যের মূল্য বাড়িতেছে। জুনগড় রাজ্যে ও গুজরাটে বিলক্ষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। জুনগড় দরবার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের পোষণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, বোম্বাই প্রদেশস্থ আনন্দ নগর প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়া কিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই অল্প অধিক বৃষ্টি হইলেও শস্যের মূল্য বাড়িতেছে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ইহাই চির বিশ্বাস "জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।"

নিতান্ত দুঃখের সহিত আমরা প্রকাশ করিতেছি, বিডনষ্ট্রীটস্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাদুর সি, আই, ই, মঙ্গলবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও আয়ুর্ব্বেদে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তিনি পাশ্চাত্যাঞ্চলে এদেশীয় গাছ গাছড়ার অদ্ভুত গুণ ও উপকারিতা প্রচারার্থ যে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবাসী মাত্রই তাঁহার নিকট ঋণী।

রেঙ্গুনের মহাজনেরা এখন হইতে টাকা কড়ি ধার দেওয়া বন্ধ করিতেছে, প্রাপ্য টাকা কেবল আদায় করিতেছে, তাহারা কোথায় যেন শুনিয়াছে যে আগামী ডিসেম্বর মাসের কোনও একদিন পৃথিবীর ধ্বংস হইবে। ইহাতে নিম্ন শ্রেণীর ত কথাই নাই, মধ্যবিত্ত লোকেরও বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

নরওয়ে প্রদেশে ইতিমধ্যে নাকি এক আইন পাশ হইয়াছে। যে বালিকা শিল্পকার্য্য, সূতা প্রস্তুত ও রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা না দেখাইবেন তাঁহার বিবাহ হইবে না, এ আইন মন্দ নয়; বিলাসিতা নিবারণের সুন্দর উপায়। এই দরিদ্র বঙ্গদেশে কুড়িটাকা বেতনের গরীব গৃহস্থেরও পাচক ব্রাহ্মণ নাহইলে চলে না। এদেশেও ঐ আইনটীর প্রচলন হইলে ভাল হয় না কি?

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যসমূহ এইবার পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচার প্রাপ্ত

হইতে চলিল। কলিকাতায় একটী সমিতি হইয়াছে। তাহার সভ্যেরা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষান্তে ভাল ভাল ভেষজগুলি ইংরেজদের ভৈষজ্যাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইবে। এই কমিটীর অন্যতম সদস্য হুপার সাহেব সংপ্রতি, বিলাতে আছেন। সারবস্ত পাইলে, ইংরেজ যেখান সেখান হইতেই লইতে পারেন, তাহাতে অভিমান নাই।

ভাষানুবাদ।

সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষানুবাদ দ্বারা সাধারণের উপকার বা অপকার হইতেছে, উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভাষানুবাদ দ্বারা আমাদের প্রভূত উপকার, সংসাধিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, ভাষানুবাদ দ্বারা আপাততঃ উপকার প্রতীয়মান হইলেও ভিতরে ভিতরে অবনতির পথই পরিস্কৃত হইতেছে। সুতরাং ইহা উপকার নহে—উপকারাভাস মাত্র। কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিষ্কাশনে প্রয়াসী হইলে প্রথমতঃ উভয়পক্ষে কথার তারতম্য বিবেচনা করাকর্ত্তব্য। অতএব দেখা যাউক ভাষানুবাদপ্রিয়গণ ভাষানুবাদের আধিক্য প্রদর্শনার্থ কীদৃশ যুক্তিনিবহের অবতারণা করেন এবং তৎপ্রতিপক্ষগণ তৎপ্রতিকূলেই বা কি বলিয়া স্বমতসংস্থাপন করেন। যাঁহারা ভাষানুবাদের প্রশংসা করেন তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বকালে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গুরুকুলক্লিষ্ট হইয়া এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও জন সাধারণ যে যে গ্রন্থ সমূহের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেন না, ভাষানুবাদের সাহায্যে আজ তাহা হস্তামলকের ন্যায় সম্মুখে অবভাসমান হইতেছে। পুরাণাদির আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া ঋষিগণ অনাহারে অনিদ্রায় অনন্তচিন্তায় অতি দীর্ঘকাল তপস্যা করিতেন বটে, অবশেষে স্বীয় ভূত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে কষ্ট দেওয়াই শেষ ফল দাঁড়াইত। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বের কিছুই মীমাংসা হইত না। আজকালও হইতেছিল না। ভাষানুবাদরূপ নব বিভাকর যে দিন হইতে বিজ্ঞানরূপ ময়ূখমালায় আমাদের হৃদয়

জ্ঞানান্তরীণ আন্তরিক গাঢ় অন্ধকারকে দূরাপসৃত করিয়াছে, সেই দিন হইতে জগৎ যে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা কে না বলিবে? আরও পূর্ব্বে যিনি কোন এক গ্রন্থের কোন একটী তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তিনি তাহা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া এবং ধনাপেক্ষা নিভৃত স্থানে রাখিয়া, জন সাধারণের নিকট যাহা একটা মিথ্যা আড়ম্বর দেখাইতেন বা জন সাধারণকে তজ্জন্য যাহা দ্বারা উৎকণ্ঠিত করিতেন, ভাষানুবাদের সাহায্যে সেই স্বার্থপর আত্মম্ভরি ব্যক্তি নিচয়ের সেই বৃথা গর্ব্ব ও মিথ্যা আড়ম্বর একেবারেই চূর্ণ হইয়াছে। এবং তত্ত্ব পিপাসু ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকেও অনর্থক উৎকণ্ঠার অধীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে না। আরও সুবিধা দেখুন ইতঃপূর্ব্বে যদিও কেহ কেহ কথঞ্চিৎ কিছু কিছু শাস্ত্রমর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কালক্রমে একবার যদি তাহা বিস্মৃতি রূপ গভীর গুহায় বিসর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে, তাহা আর প্রায়ই মিলিত না। যদিও কথঞ্চিৎ কিছু উদ্ধৃত হইত, তাহা আবার সন্দেহ পাংশু বিজড়িত হইয়া বিভিন্নাকারে পরিণত হইত। ভাষানুবাদ, আজ আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সেই শাস্ত্রীয় তত্ত্ব গুলিকে বিস্মৃতি পিশাচীর করাল কবল হইতে চির রক্ষা করিতেছে। যখন যে বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে, তখন তত্তৎ বিষয় স্মৃতি পথে উদিত না হইলেও লবমাত্র কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভাষানুবাদ-পূত শাস্ত্র গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলে, অনায়াসে তত্তৎস্থল অবভাসিত হইতেছে, ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মাইতেছে। তজ্জন্য লবমাত্র মানসিক পরিশ্রম বা ইতরের তোষামোদের আদৌ আবশ্যকতা হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভাষানুবাদের হিতকর আবির্ভাবে শাস্ত্রীয় সার নিচয় তাম্র ফলক খোদিত বর্ণাবলীর ন্যায়, অক্ষয়ভাবে প্রতিগৃহে সংরক্ষিত হইল। আরও ভাবিয়া দেখুন ভাষানুবাদ হইবার পূর্ব্বে অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থের নামই অবিদিত ছিল। যদিও স্থানে স্থানে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত, তাহা সার্ব্বভৌম বা সার্ব্বজনীন নহে। ভাষানুবাদ আমাদের সে শোচনীয় অভাব আজ [দূর] করিয়াছে। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য একটী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রের অল্পাধিক ভাবে আলোচনা করিতে উৎসাহিত হইতেছেন। এবং সংস্কৃত গ্রন্থ যে

কি জিনিষ ও পূর্ব্বকালীন আর্য্যগণের যে কীদৃশী প্রতিভা, ভাষানুবাদই তাহা জগৎকে জানাইয়া দিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে এই ভারত ছিল এবং এই ভগবদ্গীতাও ছিল, কিন্তু উপস্থিত সময়ের ন্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ঈদৃশ সমধিক সমাদর দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কি? আজ ভাষানুবাদের প্রসাদেই আমাদের অমূল্য রত্ন আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অনন্যসার সেই "গীতা" প্রতিগৃহে বিরাজিত। পূর্ব্বে সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনিলেই মনে যেন কি একটা ভয় আসিয়া অন্তঃকরণকে পশ্চাৎপদ করিয়া তুলিত। ভাষানুবাদরূপ পরিষ্কৃত পথের পথিক হইতে পারিয়া অন্তঃকরণ আজ সে ভয়ে ভীত নহে। ভাষানুবাদকে সহচর করিয়া শাস্ত্র বারিধির গভীরতম প্রদেশ হইতেও সার রত্ন সংগ্রহে সাহসী হইয়াছে। ভাষানুবাদরূপ রজঃ সংঘর্ষণে চিত্ত দর্পণের অজ্ঞান কালিমা আর নাই। এই রূপে ভাষানুবাদের কয়টী প্রশংসার কথা বলিব? জোর করিয়া বলিতে পারি, জগৎ যদি তত্ত্ব পিপাসু হইয়া থাকে তবে এই ভাষানুবাদেই। জগৎ যদি উন্নত হইয়া থাকে তাহা ভাষানুবাদের অনন্যপরিণাম মাত্র। কি কায়িক কি বাচিক কি মানসিক সমস্ত উন্নতির ভাষানুবাদই অঙ্কুর।

পাঠক! ভাষানুবাদ-প্রিয়গণের ভাষানুবাদ-প্রশস্তি ত শুনিলেন, প্রতিকূলবাদিগণ কি বলেন শুনুন। ভাষানুবাদ দ্বেষিগণ বলেন—ভাষানুবাদ সম্বন্ধে যে কয়েকটী প্রশংসার কথা বলা হইয়াছে সব কয়টীই ভ্রান্তের প্রলাপ বা অপরিণাম দর্শিতার অনন্য ফল। আর্য্যগণের মতে তাহাই অনিন্দিত ও আশ্রয়ণীয় যাহা বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী হইয়া ইষ্টফল প্রদানকরে। অর্থাৎ যাহার আপাত মধুর ভাবে বিমুগ্ধ হইলে পরিণামে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের আশঙ্কা অনিবার্য্য তাদৃশকার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। যেমন শ্যেন যাগ আপাততঃ শত্রুমারণরূপ ইষ্টফল প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও পরিণামে প্রাণিহিংসারূপ অনিষ্টের অনুবন্ধী বলিয়া, তাহা প্রশস্ত বা শিষ্টগণের আচরণীয় নহে। সহজ কথায় পাণ্ডুরোগী তাৎকালিক সুখপ্রদ অম্লরস সেবন করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেও তাহার প্রতি তিন্তিড়্যাদি ব্যবস্থা কি বিধেয়? কখনই নহে। তদ্রূপ ভাষানুবাদ আপাততঃ উপকারের আভাস মাত্র দর্শাইয়া উন্নতি মার্গকে কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে ও ভয়ানক অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে বলিয়া

একান্ত পরিত্যজ্য। পূর্ব্বে প্রথা ছিল উপনয়নান্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ ব্যবৎ দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং গুরুর নিদেশে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দারগ্রহণ করতঃ গৃহস্থ হইবে। যাঁহারা ভাষানুবাদের দ্বারা কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন; বেদাজ্ঞা প্রতিপালন করাত দূরের কথা তাঁহারা ঈদৃশ নিদেশ নিচয়ে অশ্রদ্ধা করিতে দোষ দেখাইতে অসভ্যতা প্রতিপাদন করিতে খুবই উৎসাহিত হন। একেঁ ত বেদাজ্ঞার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই মহাপাপ। অধিকন্তু যথেচ্ছাচারী হইয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতে অনুমাত্র ভীত নহেন; যেহেতু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন।

"যো শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥

মহানুভব ঋষিগণ কর্ত্তৃক যাহা পূর্ব্বে মীমাংসিত হয় নাই, আজ শত সহস্র বৎসরেও যে তাহার অণুমাত্র মীমাংসার পথে আরূঢ় হইবে, ইহা ভাবাই ভ্রান্তি। তবে যাহা কিছু সম্প্রতি পরিস্কৃত বা নূতন বলিয়া প্রতীতি গোচর হয়, তাহা আর্য্য শাস্ত্রের আমূল আলোচনার অভাব মাত্র। এখনও আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে, যে সমস্ত সার নিচয় দৃষ্টিপথে আইসে, তাহার শতাংশের একাংশও আধুনিক কেহই আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই বা পারিবেন না। ইহা একান্ত সত্য যে, যাহা ছিলনা তাহা আজও নাই; যাহা নাই ভবিষ্যতেও তাহা হইবে না। স্বয়ং ভগবানই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

"না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"।

(ক্রমশঃ)

গ্রহরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা মহাপাত্র।
গোপীবল্লভপুর—মেদিনীপুর।

দ্রব্যগুণ বিচার।

প্রয়োগ—ছোট এলাচ ও বড় এলাচ উভয়ই লোকে প্রধানতঃ পানের মস্‌লা স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে পানের উপকারিতা বর্দ্ধিত হয়। ছোট এলাচ তরকারী ব্যঞ্জন ও মাংসাদি পাককালে সৌরভের জন্যও ব্যবহৃত হয়। কবিরাজীতে শুধু ছোট এলাচ প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু শুধু বড় এলাচ সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বড় এলাচের গুঁড়া কবিরাজেরা শ্বাসরোগের ও বায়ু রোগের ঔষধের অনুপান স্বরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ছোট এলাচ, অজীর্ণ ও উদরাধ্মান নাশক ঔষধ সমূহের মধ্যে উপকরণ স্বরূপ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। উভয় এলাচই একত্রে কবিরাজী পাকতৈলে গন্ধপাকে প্রযুক্ত হয়।

বড় এলাচ, কর্পূর ও মিশ্রী শূলের ব্যথাকালে মুখের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে চুষিলে অনেকটা শান্তি হয়। বড় এলাচ, বচ, যষ্টিমধু ও মিশ্রী একত্র সিদ্ধ করিয়া গরম গরম কাথ পান করিলে শুষ্ক কাসের বেগ নিবারিত হয়। উদরের বায়ুনাশের পক্ষে ছোট এলাচ বড় উপকারী, ইহার সহিত লবঙ্গ, মউরি, হিং প্রভৃতি যোগ করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পেট ফাঁপা, পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হয়। সোণামুখী প্রভৃতি রেচক দ্রব্য সেবনে পেট কামড়ানি উপস্থিত হয়, তৎসমুদায়ের সহিত ছোট এলাচ সংযুক্ত হইলে ঐ উপদ্রব আর থাকে না। ছোট এলাচ হইতে এক অতি উৎকৃষ্ট পাতলা তৈল বাহির করা হয়, তাহাকে "ক্যাজিপুটী অএল্" বলে। ইহা অতীব তীব্র সুগন্ধি, ১০।১৫ ফোঁটা জলের সহিত খাইলে পেট খোঁচানি, পেট ফাঁপা সারে এবং বাহিরে ব্যথা স্থানে মালিশ করিলে উহা সদ্য নিবারিত হয়। ক্যাজিপুটী অয়েল, তার্পিন তৈলে ও কেরোসিন তৈলে একত্র মিশাইলে অতি উত্তম বাতব্যথা-নাশক মালিশের তৈল প্রস্তুত হয়। ক্যাজিপুটী অয়েল সস্তা জিনিস্, বড় বনিকের দোকানে বা ডাক্তার খানায় কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার এক খড়িকা প্রমাণ পানে দিলে উহাতে কতক গুলি এলাচের দানার অপেক্ষাও অধিক সৌগন্ধ হয়।

ওল।

বাঙ্গালা নাম—উপরি-উক্ত, হিন্দী—জমিন্ কন্দ বা ওল, ইংরাজী—Amorphophallus paniculatis. সংস্কৃতপর্য্যায়ঃ—শূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দোঽর্শোঘ্ন ইত্যপি। সংস্কৃত নাম—শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল এবং অর্শোঘ্ন। আরো এই কয়টী নাম আছে—কণ্ডূল, সুকন্দী, স্থূলকন্দক, দুর্নামারি, সুবৃত্ত, বাতারি, তীব্র..., রুচ্যকন্দ।

ইহা একপ্রকার এক স্তম্ভ-যুক্ত ছত্রাকার গুল্মের গোলাকার কন্দ বা মূল, ওজনে এক পোয়া হইতে ২।৩ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ওল মনুষ্যের খাদ্যের মধ্যে একটী ভাল জিনিস। গৃহ-জাত ও বন্য এই দুই প্রকারের আছে, বন্যগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার ও অধিক তীক্ষ্ণ। খাদ্যরূপে ব্যবহারের পক্ষে অবশ্য গৃহজাতই ভাল, বন্যগুলির রস কতিপয় কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওল সমুদায়ের বর্ণের তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোন গুলি অধিক লাল, কোনগুলি অপেক্ষাকৃত শাদা, কিন্তু ইহাদের জাতিগত বড় কিছু ভেদ নাই। "মান্দ্রাজী ওল" নামে এক প্রকার ভিন্নজাতি ওল কলিকাতায় মিউনিসিপাল বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে, ইহা অতি সুন্দর তরকারী, কাঁচা চিবাইলেও গলা চুলকায়না।

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ ॥
বিশেষা দর্শসে পথ্যঃ প্লীহ গুল্ম বিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥
দদ্রুণাং রক্তপিত্তাণাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।
সন্ধানযোগ সম্প্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ ॥

রস—কটু ও ঈষৎ কষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ, গুণ—দীপন, রুক্ষ, কণ্ডূজনক, বিষ্টম্ভী (অধিক খাইলে পেট ভার রাখে) বিশদ (ক্লেদহীন এবং মুখের ক্লিন্নভাব দূরীভূত করে) রুচিজনক, কফ ও অর্শোঘ্ন, লঘু, বিশেষতঃ অর্শোরোগীর সুপথ্য। সমস্ত কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ইহা উৎকট দদ্রুরোগী, কুষ্ঠরোগী ও রক্তপিত্তাক্রান্ত

ব্যক্তির পক্ষে উপকারী নহে। সন্ধান যোগে অর্থাৎ বোল যমানী প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিলে, ইহা আরো অধিক গুণকর হয়।

প্রভাব—অর্শঃ, প্লীহা ও গুল্মনাশক। "ঔষধের উপকরণার্থে বন্ত ওলই প্রশস্ত। শাস্ত্রে যদিও ঔষধের উপকরণ বিবৃতি কালে শুধু "শূরণ" শব্দ লিখিত আছে এবং তৎপূর্ব্বে "বন্ত" এই বিশেষণ সংযুক্ত হয় নাই, তথাপি তৎ স্থানে বন্ত ওলই বুঝিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয় তাঁহার অনুবাদ পুস্তক সমূহে সর্ব্বত্রই শূরণ শব্দের অর্থ বন্ত ওল করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা আমাদের মতে তিনি বিশেষ বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয়ই দিয়াছেন। বন্ত ওলে এই ওষধীয় শক্তি আসিল কোথা হইতে? ইহা যে অর্শঃ গুল্ম প্রভৃতি রোগের প্রতীকারক, তাহার মূলীভূত কারণ কি? কারণ কেবল ইহার অধিকতর তীক্ষ্ণত্ব ও কটুত্ব। এই গুণেই ইহা আগ্নেয়। আগ্নেয় বস্তু ছাড়া অর্শঃ প্লীহাদির প্রশান্তি কে করিতে পারে? বন্ত ওল চিতামূলের * প্রায় সম গুণ। একটুখানি মুখে বা অন্ত কোমলস্থানে লাগাইলেই যে ইহারা জ্বালা উৎপন্ন করে, এই শক্তি দ্বারাই উহারা অগ্নি কারক ও ক্ষুধাজনক। আদা প্রভৃতি ঝাঁঝাল জিনিস্ চিবাইলে মুখ মধ্য হইতে যেরূপ লালাস্রাব হইতে থাকে, উদর-গহ্বরে বন্ত ওল প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়াও সেইরূপ পাচক পিত্তকে সমধিক মাত্রায় নিঃসারিত করায়।" সুস্বাদু সুখসেব্য ওলে এ গুণটী বড় বেশী নাই; কিন্তু উহাতে অন্যান্য গুণ অবশ্য বর্ত্তমান,—ইহা পুষ্টিকারক ও সারক কিন্তু ঈষৎ আগ্নেয়।

ঈদৃশ বিচার শুনিয়া বোধ হয় পাঠকের পক্ষে উভয় সঙ্কট বোধ হইতেছে—যেটী অধিক গুণকর তাহা অখাদ্য; আর যেটী সুখসেব্য, তাহাই অল্প গুণদায়ক। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য, যাঁহারা ওল-প্রিয় তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া শুধু ভাল ওল খাইবেন না এবং বন্ত ওলকে আর অত ঘৃণা করিবেন না। উহাকেও মধ্যে মধ্যে ভাতে সিদ্ধ করিয়া ভাতের গ্রাসে লুকাইয়া কোনরূপে গলাধঃকরিবেন। কিন্তু অল্প চাউলে যেন অধিক ওল সিদ্ধ না করা হয় তাহা হইলে সমস্ত ভাত কটুরসান্বিত হইতে পারে।

* চিতামূল একটী আগ্নেয় বস্তু, শাস্ত্রে ইহার একটী নাম "বহ্নি"।

লোকে ওলের ডালনা, বড়া ভাজা, অম্বল, আচার ও চাটনী করিয়া খাইয়া থাকে, কিন্তু প্রধানতঃ ইহা ভাতে দিয়াই অধিক লোকে আহার করে।

ওলের চাটনী—শ্বাস, অম্লপিত্ত ও অর্শোরোগীর উপকারী; ইহার প্রস্তুত করণ প্রণালী এই—প্রথমে এই উপকরণ গুলি যোগাড় করিবে যথা,—ওল এক পোয়া, পুরাতন তেঁতুল শাঁস দেড় পোয়া, ইক্ষুগুড় বা পরিষ্কার চিনি এক পোয়া, খাঁটী সরিষার তৈল এক পোয়া, সৈন্ধব লবণ চারি আনা, হরিদ্রা বাটা দেড় তোলা, রাইসরিষা বাটা দুই তোলা, ভাজা সরিষার গুঁড়া আধতোলা, ভাজা মেথির গুঁড়া আধতোলা, ভাজা পাঁচ ফোঁড়নের গুঁড়া এক সিকি।

প্রথমে ওলের খোসা ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ২।৩ ঘণ্টা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন জলে দুতিন বার ধুইয়া ফেলিবে। ২ সের জলে ঐ ওল সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল জলে ধুইবে ও কাপড়ে টাঙ্গাইয়া জল ঝরাইবে। একটা মুখ-চওড়া হাঁড়িতে বা কড়াতে তিন ছটাক তৈল চড়াইয়া দিয়া তাহাতে ওল গুলি দিয়া খুন্তী চালনা দ্বারা গুলিয়া দিবে। যখন ওল একটু বাদামীরং হইবে তখন তাহাতে হরিদ্রা বাটা, সরিষা বাটা, ও লবণ দিয়া নাড়িবে ও ১ সের জলে তেঁতুল গুলিয়া উহাতে ঢালিবে, একটু টানিয়া আসিলে অবশিষ্ট /০ ছটাক তৈল দিবে, ফুটিয়া উঠিলে অবশিষ্ট গুঁড়া মসলাগুলি ফেলিয়া অল্পক্ষণ নাড়া চাড়া করিয়া নামাইয়া কাচ, প্রস্তর বা মৃৎপাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহা পনর ষোল দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে।

তাম্র ভস্ম করিয়া, পরে ওলের মধ্যে পুরিয়া পুনরায় পোড়াইলে ঐ ভস্ম নির্দ্দোষ হয়, এই প্রথাকে তাম্রের অমৃতীকরণ বলে।

ডাঃ থরটন বলেন কীটাদি দংশন করিলে, দষ্টস্থানে বন্য ওলের পুলটীস্ লাগাইলে উপশম হয়। বোম্বাই সহরে চাকা-চাকা-কাটা শুষ্ক ওল বণিকের দোকানে বিক্রয় হয়। উহা জলে সিদ্ধ করিয়া বারমাসই খাওয়া যায়। লাল অপেক্ষা শাদা ওল গুলি কম কুট্ কুটে। বুনো ওলও শিথিল জমিতে চাস করিলে ক্রমে উহা সুখাদ্য হয়। ওল দশ পনর সের পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা গিয়াছে।

শূলের সামুদ্রাদ্য চূর্ণ, অম্লপিত্তের বৃহৎ ক্ষুধাবতী গুড়িকা, বিশেষতঃ অর্শের [illegible] বৃহৎ শূরণ মোদকে ওল আবশ্যক হয়।

কইমাছ।

বাঙ্গালা নাম—ঐ, হিন্দী—কবই, সংস্কৃত—কবিকা, এ মৎস্য অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, কলিকাতা-অঞ্চলে "যশুরে কই" বড় প্রসিদ্ধ। ইহার মাথা মোটা, শরীর কৃশ, দেখিতে অধিক বড় নয়, যশোহর জেলায় অনেক পুকুর খানা ডোবা আছে, তাহাতে কইমাছ যথেষ্ট, উহা কলিকাতায় আনীত ও বিক্রীত হয়,—রাস্তায় আসিতে আসিতে মৃতপ্রায় ও শুষ্ককায় হইয়া যায় বলিয়াই ঐরূপ দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় নূতন বাজারে সময়ে সময়ে খুব বড় বড় কই বিক্রয় হয়, ওজনে একপোয়া দেড়পোয়া। স্রোতের জলে কই থাকে না, প্রায়শঃ স্রোতোহীন জলাশয়ে থাকে, ময়লা জলে অধিক উৎপন্ন হয়। এই মৎস্যের জীবন শীঘ্র বাহির হইতে চাহেনা, খণ্ড খণ্ড হইয়া তৈলোপরি নিক্ষিপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত নড়িতে থাকে ও হৃদয়বান্ দর্শকের মর্ম্ম স্পর্শ করে।

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎ পিত্তকরী বাতনাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিণী ॥

রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—স্নিগ্ধ (শীতল ও চর্ব্বীযুক্ত) কফঘ্ন, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক। "কফঘ্না" এই পাঠস্থানে "নাতিকফকৃৎ" এই মর্ম্মযুক্ত পাঠ হওয়া উচিত। উক্ত পাঠ বোধ হয় লিপিকর প্রমাদে হইয়া থাকিবে। যেহেতু বাস্তব পক্ষে কইমাছ (এমন কি, প্রায় কোনও মাছই) কফঘ্ন নহে, বরং কফজনক, তবে কই মৎস্য ততটা কফজনক নহে। প্রথম পংক্তিটী এইরূপ হইলে ভাল হইত যথা—কবিকা নাতিকফকৃৎ স্বাদুঃ স্নিগ্ধা রুচিপ্রদা। অথবা সোজাসুজি "কফঘ্না" স্থানে "কফদা" করিলে আর গোল থাকেনা।

প্রয়োগ—এই মাছ সুমিষ্ট, সুখাদ্য, সুতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে তরকারীর সহিত মিলিত হইয়া পাক-নিষ্পন্ন হয় তাহাকেই সুমধুর করে; শুধু মাধুর্য্য গুণে প্রসিদ্ধ নয়, ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট। এই মৎস্য যেরূপ ক্ষুদ্র তত্তুলনায় ইহাতে সমধিক পরিমাণে তৈলাংশ আছে। এই তৈলাংশ দেহের

পুষ্টিসাধক, ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বর্দ্ধক। "ফস্ ফরস্" নামক ওজস্কর পদার্থ ইহাতে অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, তজ্জন্য ইহা ক্ষীণমস্তিষ্ক ও ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির পক্ষেও উপকারী। রোগীর পথ্য বলিয়া ইহা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ; যে রোগ হইতেই মুক্তিলাভ হউক, চিকিৎসক কই (ও মাগুর) মৎস্যের ঝোল প্রথমে ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তথাপি ইহার স্নিগ্ধত্ব গুণে অন্যান্য রোগ অপেক্ষা ইহা উদরাময়ের বা অন্য রৌক্ষ্যকারক রোগের পরেই অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে। উদরাময় বা অজীর্ণরোগী ইহার সুস্বাদে প্রলোভিত হইয়া যেন অধিক খাইয়া না ফেলেন, কেননা আভ্যন্তরিক তৈলাংশ বশতঃ ইহা কিঞ্চিৎ গুরুপাক। মৎস্য অপেক্ষা উক্ত মৎস্যের ঝোলই ঐরূপ রোগীর উপকারী। কৈমাছের ডিম্ব বড়ই সুকোমল ও সুখাদ্য! ইহা এই মৎস্য অপেক্ষাও লঘু-পাক, সুতরাং অজীর্ণরোগীও নির্ভয়ে খাইতে পারেন। দেখা যায়, যাঁহারা বলিষ্ঠ ও ভোজন বিলাসী তাঁহারা প্রায়শঃ এই মৎস্যকে রোগীর পথ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু বেশ্ পুষ্ট ও মাংসল মৎস্য পাওয়া গেলে ও নিপুণ পাচকের হাতে পড়িলে ইহা তাঁহাদের নিকটে নিশ্চয়ই আদরণীয় হয়।

জীবদবস্থায় ইহার কাঁটা হইতে যেমন সাবধান থাকা উচিত—(যেহেতু হাতে ফুটিলে তজ্জনিত ব্যথা বা ক্ষত শীঘ্র সারেনা) রন্ধন-প্রস্তুত অবস্থায় ও আহার কালে ইহার কাঁটা সম্বন্ধে স্মরণ রাখা উচিত, নতুবা ভোজন সময়ে অজ্ঞাতসারে ইহার ভীষণ-কণ্টক গলমধ্যে বিদ্ধ হইয়া প্রাণিহিংসা-পাতকের কিয়দংশে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দেয়।

কচ্ছপ।

বাঙ্গালা নাম—কাছিম বা কাছুয়া; হিন্দী—কচ্ছুয়া; ইংরাজী Tortoise সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কচ্ছপো গূঢ়পাৎ কূর্ম্মঃ কমঠো দৃঢ় পৃষ্ঠকঃ। সংস্কৃত নাম—কচ্ছপ, গূঢ়পাৎ, কূর্ম্ম, কমঠ, দৃঢ়পৃষ্ঠক।

কাছিম অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, ইহারা উভচর ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভেদে নানাপ্রকারের আছে; অর্দ্ধখানা নারিকেলের মালার মত ছোট কাছিমগুলি প্রায়শঃ পুকুরেই দেখা যায়; বড় বড় গুলির আবাসস্থান নদ-নদী। সমুদ্রে

এত বৃহৎকায় কাছিম আছে যে তাহারা পৃষ্ঠাঘাতে সাধারণ নৌকাকে নড়াইয়া দেয়; কলিকাতার পশুপক্ষি প্রদর্শিনী গৃহে একটা বড় কাছিমের হাড় আছে তাহার মধ্যে দু-তিন জন মনুষ্য শয়ন করিতে পারে।

এক রকমের ছোট ছোট কাছিম আছে, তাহারা স্থলচর,—পাড়াগাঁয়ে বাঁশবাগানের পচা পাতার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, ইহাদের মাংস জলচরের অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু ও উষ্ণবীর্য্য। কচ্ছপ নিজের অস্থিময় আবরণের মধ্যে পা লুকাইয়া রাখে, তজ্জন্য ইহার সংস্কৃত নাম "গূঢ়পাৎ"। ইহারা ভয় পাইলেই পা ও মাথা ঐ ভাবে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে।

কচ্ছপেরা জলাশয়ের তটে উঠিয়া মাটী খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে ডিম পাড়াইয়া যায়, ঐ ডিম সময়ে ফুটিয়া ছানা বাহির হইয়া জলে প্রবেশ করে। ডিম গুলি শাদা, হাঁসের ডিমের অপেক্ষা একটু ছোট।

কচ্ছপো বলদো বাতপিত্তনুৎ পুংস্ত্বকারকঃ।

রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—বলকারক, বাতপিত্ত নাশক; প্রভাব—পুংস্ত্বকারক (রতিশক্তি বর্দ্ধক)।

প্রয়োগ—কাছিমের মাংস বঙ্গ ও বেহার অঞ্চলের কোন কোন স্থানে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে ইহার মাংস বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ইহার মাংস বেশ্ সুস্বাদু এবং শৈত্যগুণান্বিত বলিয়া বায়ু ও পিত্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে বড় উপকারী। ক্ষীণশুক্র পুরুষত্বহীন ব্যক্তি ইহার মাংস ভোজনে ফল পাইতে পারেন। কচ্ছপ মাংস বায়ুপ্রধান পক্ষাঘাত রোগীর উপকার করে।

কচ্ছপের মাংস পুরাতন ঘৃতে সৈন্ধব চূর্ণ সহকারে ঈষৎ ভাজিয়া লইয়া কাপড়ের পুঁটলীর মধ্যে রাখিয়া গরম গরম সেক দিলে বাত ও পক্ষাঘাত রোগে বিশেষ উপকার দর্শায়। বাত ব্যাধি দ্বারা মুখ বেঁকিয়া গেলে বিকৃত স্থানে ঐ স্বেদ দিতে হয়।

কাছিমের পৃষ্ঠের চামড়া দ্বারা পূর্ব্বে ঢাল আবৃত হইত, এক্ষণে বন্দুকের বহুল প্রচলন হওয়ায় উহার ব্যবহার কমিয়াছে। ঐ চামড়া দ্বারা এক প্রকার জুতাও পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত, তাহা অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ়, সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে উহা ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কচ্ছপের নিম্নতলের অর্থাৎ উদর-দেশের

শুভ্রবর্ণ কঠিন অস্থি চর্ম্মকারেরা অস্ত্র ধার দিবার জন্য ও তদুপরি পা রাখিয়া বাটালি দ্বারা জুতা প্রভৃতির চামড়া কাটিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

কঞ্চট।

বাঙ্গলানাম—কাঁচড়া বা কাঁচড়া দাম; হিন্দী—জল চৌলাই; ইংরাজী—maranthas Trinifolius. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—পানীয়ং তণ্ডুলীয়ং যৎ-তৎ কঞ্চট-মুদাহৃতম্। সংস্কৃত নাম—পানীয় তণ্ডুলীয়, অন্যনাম—মারিষ, জলজ।

ইহা একপ্রকার "পানা" জাতীয় জলজ গাছ। ময়লা পুকুরগুলিকে এত আচ্ছন্ন করিয়া থাকে যে, জল দেখা যায় না। ইহার পাতা প্রায় ১ ইঞ্চ চওড়া, ঈষৎ গোল ও পুরু; সাধারণ পানার যেমন পাতাই সর্ব্বস্ব, ডাঁটা বা কাণ্ড থাকেনা, ইহার তেমন নয়, ইহার গাছ জলের নীচে নীচে বিস্তৃত হইয়া যায়। পাতা চিবাইলে একটু আঠা বোধ হয়।

কঞ্চটং তিক্ত কষায়ং রক্তপিত্তানিলাপহং।

রস—তিক্তকষায়; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—রক্ত-পিত্তহর ও বায়ু নাশক।

প্রয়োগ—কাঁচড়া পাতার রস উদরাময়ে উপকারী। জ্বালাযুক্ত মেহ ও শ্বেতপ্রদর রোগে বিশেষ ফল দর্শায়। কাঁচড়া অন্যান্য সম-গুণ উপকরণের সহিত যুক্ত হইলে সমধিক উপকারী হইয়া থাকে যথা—

কঞ্চট দাড়িম জম্বু শৃঙ্গাটক পত্র হ্রীবেরম্।
জলধর নাগর সহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ॥

কাঁচড়া পত্র, দাড়িম পত্র, জাম পত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুতা, ও শুঠ ইহাদের কাথ বেগবতী গঙ্গাকেও রোধ করিতে পারে, অর্থাৎ অতীব দুর্দ্দম অতীসারের বেগও নিবারণ করে।

শাস্ত্রোক্ত "গ্রহণীকপাট" "জাতীফলাদ্যা বটী" ও গ্রহণ্যধিকারের "কঞ্চটা-বলেহ" প্রভৃতি ঔষধে কাঁচড়াপাতা আবশ্যক হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশ।

অগ্রহায়ণ শুক্লা চতুর্থী তিথি। বৃহস্পতিবার। ইংরাজি ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮২ সাল।

দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে ৩।৪টী ব্রাহ্ম ভক্ত। পরমহংস দেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রবিবারেই বেশি লোক সমাগম হয়। যে সকল ভক্ত একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন।

পরমহংসদেব তক্তাপোসের উপর উপবিষ্ট। বিজয়, বলরাম মাষ্টার, ও অন্যান্য ভক্তেরা পশ্চিমাস্য হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাদুরের উপর, কেহ শুধু মেজের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহারা ঘরের পশ্চিমদিকের দ্বার মধ্যদিয়া ভাগীরথী দর্শন করিতেছিলেন। শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধমণ্ডলাকার বারাণ্ডা, তৎপরেই পুষ্পোদ্যান। তার পর পোস্তা। পোস্তার পশ্চিমগায়ে পুণ্যসলিলা কলুষ-হারিণী গঙ্গা যেন ঈশ্বরমন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতেছেন।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে কাপড়। বিজয় শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান, তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন—ঔষধ সেবনের সময় হইলে খাইবেন।

বিজয় এখনও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য। সমাজের বেদীর উপর বসিয়া উপদেশ দিতে হয়। আবার সমাজের সহিত নানাবিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, কি করেন

স্বাধীনভাবে কথা বার্ত্তা বা কার্য্য করিতে পারেন না। বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে—জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন; আবার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহারা হইতেন যে নৃত্য করিতে করিতে পরিধান বস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন—কিন্তু মহাভক্ত পূর্ব্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল—শরীর মধ্যস্থিত হরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ কলিকাল প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই তিনি ভগবান রামকৃষ্ণের দেবদুর্ল্লভ হরিপ্রেমে 'গর্গর মাতোয়ারা' অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত কথা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন।

একটি ছোকরা নাম বিষ্ণু, এঁড়েদয়ে বাড়ী, গলায় ক্ষুর দিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছিল. তাহারই কথা হইতেছিল।

(সংস্কার ও শেষজন্ম)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। দেখ, এই ছেলেটী শরীর ত্যাগ করেছে শুনলুম, তাই মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। এখানে আস্‌তো, স্কুলে পড়্‌তো, কিন্তু বল্‌তো সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছু দিন ছিল। সেখানে নির্জ্জনে মাঠে বনে পাহাড়ের কাছে সর্ব্বদা বসে ধ্যান কর্‌তো। বলেছিল যে কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কর্‌তো।

"বোধ হয় শেষজন্ম। পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করা ছিল। একটু বাকি ছিল, সেই টুকু বুঝি এবার হয়ে গেল।

"পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মান্‌তে হয়। শুনিছি একজন শবসাধন কর্‌ছিল গভীর বনে; ভগবতীর আরাধনা কর্‌ছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা

দেখিতে লাগিল শেষে তাঁকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে শব ও অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে নেমে এসে আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ করতে না করতে মা সাক্ষাৎপর হলেন ও বল্লেন 'আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও।' সে ব্যক্তি মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে বল্লে মা! একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি। তোমার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়েছি। যে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন করে, এত দিন ধরে, তোমার সাধন করছিল তাকে তোমার দয়া হইল না, আর আমি কিছু জানিনা শুনিনা, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন আমার উপর এত কৃপা হ'ল? ভগবতী হাসিতে হাসিতে বল্লেন, বাছা তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই। তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাঠ হয়েছিল, তাই তুমি আমার দর্শন পেলে। এখন কি বর লবে বল।

(মুক্ত পুরুষ ও শরীর ত্যাগ)

একজন ভক্ত। আত্মহত্যা করেছে শুনে ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে আর এই সংসার-যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে।

"তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে থাকে তাহলে যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তাকে আত্মহত্যা বলেনা। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটীর ছাঁচে ঢালাই হয় তখন মাটীর ছাঁচ রাখ্‌লে, পরে আবার ভেঙ্গে ফেল্‌তেও পার।

লক্ষ টাকার কথা।

(১)

জগত্যানন্দসম্পূর্ণে ভগবত্যা মহোৎসবে।
দুঃখং প্রাহ সুখং ভ্রাতঃ ক যামি কস্য মন্দিরম্॥

শরতে করেন যবে দুর্গা আগমন,
সমস্ত জগৎ হয় আনন্দে মগন।

সর্ব্বত্রই সুখ হেরি কহে দুঃখ তাই,
কহ ভাই সুখ! কোথা কার বাড়ী যাই!

(২)

একমেব পুরস্কৃত্য দশ জীবন্তি নির্গুণাঃ।
বিনা তেন ন শোভন্তে সংখ্যাঙ্কেষিব বিন্দবঃ॥

এক জন গুণবানে করিয়া আশ্রয়,
গুণহীন দশ জন প্রাণে বেঁচে রয়।
একের অভাবে নাহি শোভে অন্য দশ,
একেরে রাখিলে আগে, তবে মিলে রস।
অসার "শূন্যের" দেখ, নাহি কিছু সার,
কিন্তু আগে এক পেলে দর কত তার!

(৩)

রে বৎস সৎসঙ্গ মবাপ্নু হি ত্বমসৎপ্রসঙ্গং ত্বরয়া বিহায়।
ধন্যোঽপি নিন্দাং লভতে কুসঙ্গাৎ সিন্দূরবিন্দু র্বিধবাললাটে॥

অসাধুর সহবাস ত্যজিয়া সত্বর
ওরে বৎস! সাধু সঙ্গ কর নিরন্তর।
দুষ্ট-সঙ্গে থাকি সাধু নিন্দা লভে কালে,
সিন্দূরের বিন্দু যথা বিধবার ভালে।

(৪)

সমাপ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ যঃ কৃষ্ণে ভক্তিমিচ্ছতি।
সাগরে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ॥

সাংসারিক কার্য্য আগে করি সমাপন,
পিছে দিতে চায় লোক কৃষ্ণ-পদে মন!
সাগর-তরঙ্গ-মালা হলে অবসান,
বর্ব্বরের ইচ্ছা যথা করিবারে স্নান!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি. এ

জাতিভেদ সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা।

জাতিভেদের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ও পুরাতত্ত্ববিৎ ইতিপূর্ব্বে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সে সম্বন্ধে আমার মত সামান্য ব্যক্তির কিছু লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালীর এবং ইংরাজি বিদ্যার প্রভাবে দেশ হইতে জাতিভেদ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; শ্রেষ্ঠবর্ণ ও নিকৃষ্টবর্ণে তারতম্য রাখিবার প্রয়োজন নাই, জাতিভেদ-প্রথা উঠিয়া না গেলে আমাদের মধ্যে কোন প্রকারে হৃদ্যতা জন্মিবে না, নানা শ্রেণীর মধ্যে একসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবনা, এই যে বিশ্বাস আমাদের মনে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে, ইহা মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালী দেশে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ শূদ্রাদির মধ্যে ভেদজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল। এখনকার মত বিভিন্নজাতির মধ্যে পরস্পরে আহারাদি সব কাজই (সমাজে না হউক সংগোপনে) চলিত না। একত্র আহারের কথা দূরে থাকুক, একাসনে উপবেশন করা ও নিষিদ্ধ ছিল। কেবল বিবাহাদিতে নহে, বর্ণভেদে ব্যবসায় ভেদও ছিল। ব্রাহ্মণ যজন যাজন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, বৈদ্য চিকিৎসা কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, কায়স্থ মসীজীবী ছিলেন, সদ্গোপ, সূত্রধর, তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতি শূদ্রগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে রত ছিলেন এবং তদ্দারা স্বচ্ছন্দে ও সুখশান্তিতে জীবন কাটাইতেন। কিন্তু যেদিন হইতে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, যেদিন ইংরাজ বলিলেন, "সকলেই বিদ্যা-লাভ করিবার অধিকারী, বিদ্যার নিকট জাতিভেদ চলিবেনা, সেরূপ করা পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, সুবর্ণবণিক, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি সকলেই এক বিদ্যায় বিদ্বান হইবে, এক শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, এক প্রকার জ্ঞানে জ্ঞানী হইবে, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বিদ্যা ও জ্ঞানের তারতম্য থাকিবে না।" সেইদিন হইতে সদ্গোপ দলে দলে লাঙ্গল ছাড়িয়া, তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন ত্যাগ করিয়া, সুবর্ণ বণিক অলঙ্কার নির্ম্মাণ পরিহার

করিয়া, কর্ম্মকার লৌহযন্ত্র ছাড়িয়া, প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ ব্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজি বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিখিতে ধাবিত হইলেন। বিড়ম্বনার ইহাই চূড়ান্ত নহে। ব্রাহ্মণগণও যজন, যাজন ও অধ্যাপনায় আর উদরপূর্ণ হয় না বলিয়া ইংরাজ-প্রদর্শিত চাকুরীর প্রলোভনে পড়িয়া, সেই মহৎ, পবিত্র কার্য্য ছাড়িয়া ইংরাজি শিখিতে লাগিলেন। সেইদিন জাতিভেদরূপ বিচিত্র, সুবিশাল, কত সহস্র বৎসরের পুরাতন অট্টালিকা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন না, যে শূদ্র তফাতে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের নিকট নিজ বক্তব্য নিবেদন করিত, আজ সেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র মোহময় সাম্য-নীতিতে বিভোর হইয়া একবেঞ্চে, পাশাপাশি উপবেশন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন; এক গ্লাসে জলপান করিতে লাগিলেন। কি মোহময় অপরূপ দৃশ্য! 'এত কালের স্বতন্ত্রতা, মর্য্যাদাজ্ঞান, ভয়ভক্তি সমস্ত দূর করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্রকে একই প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব, পরস্পরের সহানুভূতিতে পরস্পরের হৃদয় ভরিয়া দিব, জাতীয় অনৈক্য দূর করিয়া এক মহাজাতির সৃষ্টি করিব', এই মহাবাক্য চারিদিকে প্রচারিত হইল। 'আমাদের মধ্যে যে একতা নাই, জাতিভেদই তাহার মূল, যে জাতির একতা নাই, সে জাতির উন্নতি কখনই হইতে পারে না; অতএব আমাদের বৈষম্যের বীজ জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক।' সেই মত কার্য্য চলিতে লাগিল। ইংরাজি শিখিয়া নিজ নিজ ব্যবসায়ে লোকের ঘৃণা জন্মিতে লাগিল; দেশীয় শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য লোপ পাইতে লাগিল। ইউরোপীয় শিল্প বাণিজ্যজাত দ্রব্যে দেশ ভরিয়া গেল। কিন্তু কি বিড়ম্বনা! ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে এখন যত অসদ্ভাব জন্মিয়াছে, কোন কালে এত অসদ্ভাব ছিল না। হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া না গিয়া ঈর্ষ্যায় ও হিংসায় পুড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এতটা অনৈক্য কল্পনাতীত ছিল। এক মহাজাতি বা একাকারের এই সুন্দর, সুমিষ্ট ফল ফলিয়াছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

চিকিৎসা-সংবাদ।

১। জন-সাধারণে বিশেষতঃ স্ত্রী সমাজে এরূপ সংস্কার আছে যে কবিরাজী পাকতৈল মস্তকে মাখিলে অকালে চুল পাকিয়া যায়; আমরা কিন্তু অদ্যাবধি এরূপ একটী ঘটনাও ঘটিতে দেখিনাই। যাহারা বায়ুরোগ গ্রস্ত, তাহারাই পাকতৈল মাখে, বায়ুর জন্য চুল পাকিয়া যায়, রোগী বা রোগিণী মনে করেন, তৈলেই চুল পাকিল।

২। সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ কোন বিধবা রমণীর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে জ্বর আসিত, তৎকালে তাঁহার গা বমি বমি করিত ও তলপেটে ব্যথা হইত। এইরূপ ৬।৭ দিন হইয়াছে এমন সময়ে আমি চিকিৎসার্থ আহূত হইলাম। জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে রোগিনীর অনেক দিন জ্বর হয় নাই, অম্লপিত্ত নাই, ঋতু-দোষও নাই। ইহাকে জ্বরের বৃহজ্জ্বরান্তক, ব্যথার মহাশঙ্খ বটী এবং বমিভাবের জন্য এলাদি চূর্ণ দিলাম। (কবিরাজী চিকিৎসায় প্রধানতঃ এইরূপ বিধি—অর্থাৎ যে যে উপসর্গ তাহার সহিত মিলাইয়া এক একটী বড়ী দেওয়া) ৩।৪ দিনে এ রীতিতে কিছুই ফল হইল না। তখন ভাবিলাম একটী মাত্র এমন কোন্ সোজাসুজী জিনিস্ আছে যাহা দ্বারা উক্ত তিন উপদ্রবই যাইতে পারে। সে জিনিস্—তাম্রভস্ম। শুধু মধু সহ দিনে তিন বার করিয়া তাম্রভস্ম দিতে দিতে সমস্ত উপসর্গ ক্রমে দূর হইল! তাই বলি, ভগবানের কৃপা না হইলে সব সময়ে সব কথা মনে উঠে না।

৩। লোকে বলে কবিরাজী চিকিৎসায় বড় বিলম্ব হয়। কিন্তু বিলম্বের রোগ গুলিই যে কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকটে আসে তাহা সকলে ভাবেন না।

৪। এক ব্যক্তি প্রথমে নানা চিকিৎসকের কাছে, নানা রূপ ঔষধ খাইয়া কিছুতেই ফল না হওয়ায় সমস্ত ঔষধ ছাড়িয়া দিয়া স্নানাহারাদির যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার ইহা দ্বারাই রোগ আরোগ্য হইল। আর এক ব্যক্তি কিছুদিন ঔষধ খাইয়া বিরাগভরে পূর্ব্বোক্ত রোগীর উপায় অনুসরণ করিলেন। দুঃখের বিষয়, শেষোক্ত রোগীর রোগ বৃদ্ধি হইয়া প্রাণ সংহার করিল।

৫। সুশ্রুতীয় অস্ত্রচিকিৎসা কবিরাজ দিগের মধ্য হইতে বহুদিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও স্থানে স্থানে উহার আংশিক আলোচনা দৃষ্ট হয়। বরিশালের অন্তর্গত চাঁসীর চিকিৎসক সম্প্রদায় সুশ্রুতমতে ক্ষতরোগের অতি

আশ্চর্য্য চিকিৎসা করেন। আমরা দেখিয়াছি ইহারা ইংরাজ সার্জ্জনের পরিত্যক্ত আশাহীন রোগীকেও আরোগ্য করিয়াছেন।

৬। আমাদের কোনও পরিচিত ব্যক্তি বাজারে নাপিতের দ্বারা দাড়ি কামাইয়া দুরারোগ্য চর্ম্মরোগে অনেক দিন ভুগিয়া ছিলেন। সোমরাজীতৈলে উহা ভাল হইয়াছিল।

গুণবত্তার প্রশংসা।

অনুসন্ধান—ইহা একখানি অতি পুরাতন ও উচ্চশ্রেণীর সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। নিরপেক্ষভাবে দুষ্টের নিন্দা ও শিষ্টের প্রশংসা, এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব সারতত্ত্বের উদ্‌ঘাটনই সংবাদ-পত্রের প্রধান ব্রত। এই মহাব্রতের সাধনায় অনুসন্ধান চিরনিযুক্ত। আজকাল গালাগালি হুজুক্ প্রভৃতি যে সকল কলঙ্কময় ব্যাপার সংবাদপত্রের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে, তাহার লেশমাত্রও এই পত্রিকার অঙ্গস্পর্শ করে নাই। এই কাগজখানি মাসিক পত্রিকার ন্যায় বাঁধান—অন্যান্য সাপ্তাহিকের ন্যায় পাঠান্তে ফেলিয়া দিবার জিনিস নয়। ইহার ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর; এ হেন পত্রিকার সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সকলেরই প্রার্থনীয়।

অন্তঃপুর—বরাহনগর হইতে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা লিখিত, স্ত্রীলোকের দ্বারাই পরিচালিত মাসিকপত্র। ইহাতে জ্ঞানগর্ভ কথা অনেক থাকে। মূল্য ১৲

প্রবাসচিত্র—শ্রীযুক্ত জলধর সেনের মাধুর্য্যময়ী লেখনীর সুমধুর ফল। গ্রন্থকার প্রথমযৌবনে তাঁহার গুণময়ী অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রীর বিয়োগ-শোকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণের মায়া ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসিবেশে দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে ঘুরিয়াছিলেন—একে হিমালয়ের দৃশ্যাবলি অবর্ণ্য মনোরম, তাহাতে লেখক সুকবিও আবেগপূর্ণ-হৃদয়। সুতরাং পুস্তকখানি যে কি এক অপূর্ব্ব জিনিস্ হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। যাঁহারা হাওয়া খাইবার জন্য সুখে রেল-গাড়ী যোগে দেশান্তরে গিয়া সহর-সুলভ ইট কাঠ পাথর দেখিয়া বা ঊর্দ্ধ মাত্রায়, সায়ং-প্রাতভ্রমণ কালে দুচারিটী গাছ পাথর দেখিয়াই কল্পনার জোরে কত কি লিখিয়া ফেলেন, তাঁহারা কখনই এরূপ জীবন্ত অপূর্ব্ব পুস্তক লিখিতে পারেন না। জলধর বাবু আজন্ম বিমল সাধুচরিত্র, সেই বিমলতার ছায়া পুস্তকের প্রতি-পত্রে প্রতিফলিত। মূল্য ১৲ মাত্র। শ্রীগুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। ১৩০৬ আশ্বিন ও কার্ত্তিক। সেপ্টেঃ, অক্টোঃ ১৮৯৯।

বিবিধ সংবাদ।

পদত্যাগ—শ্রীযুক্ত রায় পশুপতি নাথ বসু, কুমার শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু নলিন বিহারী সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণ পাল প্রভৃতি কলিকাতার বহু-সংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষের মন্তব্যে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনরের পদ অম্লানবদনে ত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্মানের পদ পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া সহরের কত মহোদয় কতই না যোগাড়-যন্ত্র করিয়া থাকেন! সুতরাং এই ত্যাগস্বীকারে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের বাহাদুরী আছে বটে।

মশকে ম্যালেরিয়া—কোনও ইংরাজ বিজ্ঞানবিদ্ ব্রিটিশমেডিকেল নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মশকের দংশনের সহিত ম্যালে-রিয়া বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ইহা না কি তিনি বহুস্থলে পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়াছেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর এক ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, মশকেরা দূষিত রক্ত শোষণপূর্ব্বক মনুষ্যদেহের উপকার করে। আমরা এতদুভয়ের কোন্ মতটী মানিব বুঝিতে পারি না।

তথ্য নির্ণয়—সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূত কোন ত্রয়োদশবর্ষ বালকের তিন-মাস অন্তর একবার ভয়ানক মূর্চ্ছা ও সঙ্কটাবস্থা হইত। কোন প্রসিদ্ধ কবি-রাজ এ রোগীকে প্রথমে বাতব্যাধির 'ছাগলাদ্য ঘৃত' ও পরে অপস্মার রোগের

'মহাচৈতস ঘৃত' ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে ফল হয় নাই। পরিশেষে রোগী আমাদের নিকট উপস্থিত হওয়ায় বাল্যচপলতা দোষ থাকিতে পারে অনুমান করিয়া তদুপযোগী সেবা ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম ; তাহাতেও ফল হইল না। তখন আরও নিপুণভাবে কারণ খুঁজিতে লাগিলাম—রোগীর অন্য কোন রোগ নাই, শরীর এক রকম নধর ও কান্তিমান। সর্ব্বশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় এইরূপ ঔষধ দিলাম। ইহাতেই রোগ দূরীভূত হইল। উপর উপর চেহারা ভাল থাকিলেও মানুষের আগুনের ঘরে অলক্ষিতে এমনই ক্রটী থাকে !

এ কালে রাক্ষস—আফ্রিকা দেশে প্রকাণ্ড-মূর্ত্তি বিকট-দর্শন এক জাতীয় মনুষ্য আছে। নরমাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য। জীবিত মনুষ্য না পাইলে ইহারা শব ভক্ষণ করে। ইহারা অশিক্ষিত অজ্ঞান পশুবৎ ; কিন্তু আমাদের দেশেও কোন সুশিক্ষিত রাজা শিশু ভক্ষণ করিতেন এবং তান্ত্রিক যোগিগণ শ্মশানের শব লইয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকেন। এ অতি উদ্ভট ধর্ম্মপথ।

চিকিৎসা-সঙ্কট—ভদ্র পরিবারস্থ কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোকের অতি-রিক্ত রজঃস্রাব হইতে হইতে ক্রমে অতীব অবসন্ন মৃতপ্রায় অবস্থা উপনীত হইল, ডাক্তারী চিকিৎসার চূড়ান্ত হইল কিন্তু রক্তরোধ হইল না। পরে আমরা আহূত হইলাম। দুই পুরিয়া ঔষধ দিতেই রক্ত বন্ধ হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় (বোধ হয় রক্ত ঊর্দ্ধ হইয়া) রোগিণীর মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ আরম্ভ হইল। এই মূর্চ্ছা শান্তির জন্য বায়ুনাশক ঔষধ ও তৈল দিতে দিতে রোগিণীর জ্বর দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ। তখন জ্বরের মৃদু ঔষধ দিতে গেলেও বায়ুর প্রকোপ এবং মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। বায়ু অধোগ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে কোন উপসর্গই যাইবে না মনে করিয়া বিরেচক বটিকা দিলাম। ইহাতে দাস্ত না হইয়া বমি হইয়া উঠিয়া গেল, তারপর যত ঔষধ বা পথ্য দেওয়া যায় সমস্তই উঠিয়া যায়, কিছুই পেটে থাকে না। রোগিণী ক্রমে অনাহারে অতীব ক্ষীণ, স্পন্দশক্তি-বিহীন হইল। জ্বর, বমি, কোষ্ঠবদ্ধ, তল-পেট ব্যথা, মূর্চ্ছা ও আত্যন্তিক দুর্ব্বলতা এই কয় উপসর্গ যেন পরস্পর [illegible] করিয়া রোগিণীকে শমনালয়ে লইয়া যাইতে প্রস্তুত। তখন গৃহস্থ আমা-

দ্বারা আর কাজ হইবে না মনে করিয়া কোনও (নামে ও ধনে বড়) কবিরাজকে ডাকিলেন। তিনি হঠাৎ আসিয়াই পথ বুঝিবেন—সাধ্য কি? যে কয়দিন রোগিণী তাঁহার হাতে ছিল ক্রমে আরোই রোগবৃদ্ধি। আমি পুনরায় আহূত হইলাম, এ বারে সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবল স্বর্ণসিন্দুর ও একটী পাচনের জল এবং দুই এক চাম্‌চে বার্লী দেওয়া হইতে লাগিল। ভগবৎকৃপায় ক্রমে সমস্ত বিপদ কাটিয়া গিয়া রোগিণী দেড়মাস পরে আরোগ্যের পথে দাঁড়াইল এবং তিনমাস পরে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইল। রোগী অনেক ঔষধ খাইলে, অবশেষে পাচনের দ্বারাই অধিক উপকার হয়।

যজ্ঞানুষ্ঠান—সে কালের হিন্দু রাজারা রাজ্য-মধ্যে কোনও অশুভ লক্ষণ দেখিলেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে পান ভোজন করাইয়া রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিতেন। এখন সে কালও নাই, হিন্দুর সে মনও নাই। কেবল বাড়ীর গৃহিণীদের কৃপাতেই "লক্ষ্মীপূজা" প্রভৃতি হিন্দুর নিত্যক্রিয়া গুলি এখনও বাজে খরচ বলিয়া বন্ধ হয় নাই, সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, এ বৎসর না কি সাতটি গ্রহের একত্র সমাবেশ হইবে। হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহা দেশের ও প্রাণী মাত্রেরই অমঙ্গল সূচক। সেই অমঙ্গল দূরীকরণার্থ লাহোরে এক বিরাট যজ্ঞ হইবে; তাহার আয়োজন হইতেছে। কাশীর বড় বড় পণ্ডিত আনাইয়া এ যজ্ঞে ব্রতী করা হইবে। যজ্ঞের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের গতাবশেষ ক্রিয়া-কলাপ এখনও কিছু কিছু পশ্চিম প্রদেশেই আছে!

ভূত ও অদ্ভুত—আমেরিকার যখন সকলই অদ্ভুত, তখন ভূত অদ্ভুত না হইবে কেন? সেখানে নাকি এক রকম সর্পাকৃতির ভূত আছে; তাহার আবার ঘোড়ার মত মাথা, পায়ে খুর, খাঁজকাটা ল্যাজ, ছাইয়ের মত রং, ও চামচিকার মত পাখা আছে। ইহার উপদ্রব আরও অদ্ভুত—সে নাকি ঘোড়ার পা খোঁড়া করে, গরুর দুধ কমিয়ে দেয়, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে! তা না হবে কেন? এ কি দেশী ভূত, যে দেশী উপদ্রব করবে?

রাজার দয়া—বোম্বে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের প্রতীকার চেষ্টার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়াছেন; ঐ আফিস সম্প্রতি পুনায় আছে! এ সংবাদে তত্রত্য দরিদ্র লোকদিগের প্রাণে আশার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে।

কালিদাস-কীর্ত্তি—লণ্ডনে এলিজাবেথান্ ষ্টেজ সমিতি নামে একটী নাট্য সম্প্রদায় আছে, সেখানে সম্প্রতি কালিদাসের শকুন্তলার অভিনয় হইবে সংকল্প হইয়াছে। পরাজিত ভারতের রত্নগুলির মাহাত্ম্য বুঝিবার লোক বিলাতেও আছে। এমন কি কোনও ইংরাজ গ্রন্থকার শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ মাত্র পড়িয়া বলিয়াছেন—যদি কেহ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ছবি একাধারে দেখিতে চান, যদি বসন্তের দেবদুর্ল্লভ পুষ্পরাশির অনুপম সৌরভে প্রাণ মাতাইতে চান্ তবে আমি শকুন্তলার নাম করিব।'

স্ত্রীলোকের দান—মানভূমপুরুলিয়ার ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী, মৃত স্বামীর স্মৃতি সংরক্ষণার্থে গবর্ণমেণ্টের হাতে ৪০০০৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকায় তত্রত্য দরিদ্র ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দেওয়া হইবে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন; অপিচ রমণীহৃদয়ের এতাদৃশ উদারতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শতশত ধন্যবাদ দিয়াছেন।

সদ্বুদ্ধি ও সদ্দান—বরাহনগর নিবাসী প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত জমিদার শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য দুইজন লেখককে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সতীত্বের তেজঃ—পশ্চিম প্রদেশে কোনও সম্ভ্রান্ত লোক স্বীয় সুন্দরী স্ত্রীকে স্বগৃহে লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে দারোগাপ্রভু কামান্ধ হইয়া বলে "এ স্ত্রী যে তোমার তাহার প্রমাণ কি?" ভদ্র লোকটী প্রমাণের জন্য শ্বশুরালয়ে পুনরায় যাইতে বাধ্য হন্। ইত্যবসরে অসি-সজ্জিত হইয়া দারোগা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলাৎকারে প্রবৃত্ত হয়। অমনি সুন্দরী সতীত্বের উদ্দাম পরাক্রমে পাষণ্ডের অসি লইয়া তাহারই মস্তক ভূমিসাৎ করিল। কোর্টের বিচারক এই স্ত্রীকে দণ্ড না দিয়া বরং চারিশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। ধন্য সতী! ধন্য বিচারক!

দান ও উদারতা—পুঁটিয়ার শ্রীল শ্রীযুক্তা রাণী হেমন্তকুমারী রাজসাহী কলেজের সম্পর্কে একটী ছাত্রনিবাস নির্ম্মাণের জন্য ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আগমনী।

চন্দ্রমা মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া, আর ত সেই মলিনমুখে তেমন মিটি মিটি অস্ফুট হাসিটি হাসে না! আর ত মেঘ তেমন করিয়া অবিরল জল ঢালিয়া ধরাতল বিপ্লাবিত করে না! ঘনঘোর বজ্রনির্ঘোষে বিশ্বসংসার আর ত এখন তেমন সন্ত্রাসিত হয় না! তবে তোমার ও অশ্রান্ত উত্তাল নৃত্য-তরঙ্গের গতিভঙ্গ হয় না কেন মা? প্রশান্তরূপিণী প্রকৃতির পবিত্র কলেবর কেবল আজ তোমারই পঙ্কিল-সলিল-সংস্পর্শে কলঙ্কিত কেন মা? সুখদ-শারদ-সমাগমে শান্তিসৌন্দর্য্যের আনন্দমন্দিরে এ সংসারের অশান্তি উদ্‌ভ্রান্তি সকলই ত ধীরে ধীরে লুকাইয়া গেল, তবে তোমার ও প্রচণ্ড তাণ্ডব-কাণ্ডের শেষ-যবনিকার কণিকাও দেখি না কেন মা?

"কুল্ কুল্ কুল্! কিছুই বুঝিলাম না ত? ও কি কথা মা? যখনই জিজ্ঞাসা করি—কুল্ কুল্ কুল্! ওর অর্থ কি মা? মানে না বুঝিলেও তোমার ওই মধুমাখা কথাটি কানে যেন কত অমৃত ঢালিয়া দেয়, ভাব না বুঝিলেও প্রাণ যেন জুড়াইয়া যায়। এমনই বা হয় কেন মা? না বল, আমি কিন্তু বুঝিয়াছি—এই অকূল দুঃখসাগরে ভাসমান কুলাঙ্গার কুমার-কুলের কাতর-ক্রন্দনে, সেই কৈলাসবাসিনী কৈবল্যদায়িনী কুলকুণ্ডলিনী মায়ের আমার কোমল প্রাণ আকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের এ অকূলে কূল পাইবার কাল অতি নিকটে আসিয়াছে, তাই তুমি আজ আহ্লাদে আকুল হইয়া এমন ব্যাকুলভাবে দু'কূল বিপ্লাবিত করিয়া, কুল কুল কোলাহলে কলনাদিনী করুণাময়ী মা আমার! এই শুভ সমাচার প্রচারের জন্য দিগ্-দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছ।

যাও মা! কিন্তু ও আবার কি? প্রবাসী পুত্র প্রাণের ব্যগ্রতায় তীর-তীব্রগতিতে তরী ছুটাইয়া, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়াছে—অনেক দিনের পর মাকে দেখিবে বলিয়া। আর তুমি তার সঙ্গে সঙ্গে তরল-তরঙ্গে, গঙ্গে! এমন খরতর ভাবে, তরতর রবে, ছুটিয়াছ কেন মা? যেখানে আজ তর-ণীর তড়িদ্‌গতি, সেখানেই তোমার ত্বরতর গীতি! আরোহীকে ও কি কথা বলিয়া দিতেছ মা?

"তর্ তর্ তর্—এ সামান্য নদী কেন? এই অপার সংসার সমুদ্রটা এই বেলা তোরা তর্ তর্ তর্। তরিবার সময় আসিয়াছে,—তোদের ত্রিতাপহারিণী, ত্রিগুণধারিণী, ত্রিলোক-তারিণী জননী, আজ তোদের জন্য করুণার কৈবল্য-কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, এই বেলা তোরা—তর্ তর্ তর্। এমন সুযোগ এত সুবিধা ছাড়িস্ না রে তর্ তর্ তর্। এই সময়, সময় থাকিতে, শক্তি থাকিতে, সামর্থ্য থাকিতে—তোরা সবে তর্ তর্ তর্।"

এই না তোমার তর্ তর্ রবের ভাবার্থ মা? আমরি মরি! এত স্নেহ, এত দয়া, এমন মমতা, মা বিনা আর কোথায় সম্ভবে? এখন বেশ বুঝিয়াছি মা! নৈশ-নিবিড়-তমস্তরঙ্গ বিলোড়িত করিয়া, কাদম্বিনী-সহচারিণী সৌদামিনী কেন আর তেমন প্রচণ্ড প্রলয়কাণ্ডের অভিনয়ে অগ্রসর হয় না। জলভর-মন্থর জলধরের সান্দ্রমন্দ্র জীমূত-নির্ঘোষে কেনই বা আর কর্ণকটাহ ফাটিয়া যায় না, আর কেনই বা বায়ুর বিশ্ব-বিধ্বংসী বিশাল বেগ বিলুপ্ত প্রায়!

এখন বুঝিয়াছি—মৃদুমন্দ সান্ধ্য-সমীরণ-হিল্লোলে ঈষদান্দোলিতা ললিতা লতা, উপর্য্যুপরি ঘন-বিন্যস্ত স্তবকিত কুসুমসৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিয়া, আনন্দে দুলিয়া, অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যচ্ছটায় কেন আজ হৃদয় মন ভরিয়া দেয়। কেনই বা, পুলকাকুল-কোকিল-কুলের কলকোলাহলে, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর পুঞ্জের হৃদয়রঞ্জন গুঞ্জনে, পাপিয়ার পীযূষপূর্ণ প্রমোদতানে, মর্ত্ত্যতল আজ কিন্নরনগরের গরিমার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেনই বা, চূতচম্পক-বকুল-কদম্ব-তরুরাজীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামললোহিত দল-পল্লব-পুঞ্জে, পৃথিবী একটি কমকুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। কেনই বা চন্দ্র অমল-উজ্জ্বল-কিরণকলাপে গগণতল এত আলোকিত করিয়াছে। মুক্তাবিনিন্দিত-শিশিরবিন্দুসিক্ত, তরুণারুণ-কিরণরঞ্জিত কমলদল, কেন আজ মৃদুল হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। আর তুমিই বা কেন এমন উদ্দাম-আনন্দ-আবেগে অধীর-উন্মাদিনী সাজিয়া, উধাও-উদ্‌ভ্রান্ত-গতিতে দিগ্‌দিগন্তে ছুটিতেছ, আর বলিতেছ—"কুল্ কুল্ কুল্, তর্ তর্ তর্"।

আনন্দময়ী মা আসিতেছেন, তাই আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আনন্দ-উৎসবের অমৃত উৎস উৎসারিত হইয়াছে। আনন্দে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে, আবাল[illegible]বনিতা সকলেরই প্রাণ আজ উদ্বেল-আনন্দ-তুফানে ভাসিতেছে।

কিন্তু জানি না—এ আনন্দ স্বাপ্নিক কল্পনার ক্রীড়া-কন্দুক কি না! প্রভাত-বাত-বিলোড়িত জলদপটলের বিকট-কঠোর গর্জ্জনের মত, ইহা বিফল ও পরিণাম-শ্লথ কি না!

শ্মশান-সৈকত যাহাদের সাধের সুখশয্যা, মুহুর্মুহুঃ মৃত্যুই যাহাদের একমাত্র প্রার্থনার বিষয়, অশ্রুজল যাহাদের চিরসম্বল, হাহাকার আর্ত্তনাদই যাহাদের সান্ত্বনার শান্তিসূত্র; অতৃপ্তি অশান্তিই যাহাদের আদরের অর্দ্ধাঙ্গিনী; রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যই যাহাদের চিরসহচর, সে সব হতভাগ্যদের দগ্ধহৃদয়ও আজ যেন থাকিয়া থাকিয়া কেমন করিয়া উঠে, তাই বড় ভয় হয়—"অত্যুচ্চৈঃ পতনায় চ" কি না!

হাঁ মা! সত্যই কি তুমি আসিবে? সচ্চিদানন্দময়ীর শুভসমাগমে সত্যই কি সংসার আবার অপার আনন্দ তুফানে ভাসিবে? সত্যই কি এ নির্ম্মম মহাশ্মশান, নন্দনবনে পরিণত হইবে? সত্যই কি তুমি নিরন্ন শীর্ণ সন্তানগুলির শুষ্কমুখে অন্নপূর্ণারূপে আবার আদরে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিবে? কি করিয়া বিশ্বাস করিব? কঠোরাদপি কঠোরতর তপঃসাধনায়, কত কত কোটি কোটি কল্প কল্পান্ত কাল কাটিয়া যায়, কত কত যুগ যুগান্ত জন্ম জন্মান্তর অতীত হয়, তথাপি শত শত যোগী যোগীন্দ্র যাঁহাকে "ধ্যানং প্রশান্তমবধর্ত্তুমলং ন শান্তাঃ"; আমাদের এত কি সৌভাগ্য যে, আজ অযত্নে অনায়াসে সেই শঙ্করসর্ব্বস্ব সুরারাধ্য ধনের অধিকারী হইব? সেই বৃন্দারকবৃন্দ-বন্দিতচরণারবিন্দ সন্দর্শনে, জীবন মন ধন্য করিব? তিতিক্ষা-দীক্ষা-শিক্ষাশূন্য, রোগ-শোক-সমাকীর্ণ, পাপ-তাপ-পরিপূর্ণ, এই নগণ্য নারকিকুলের এ সৌভাগ্যগরিমা একান্তই অসম্ভব নয় কি মা? অসম্ভব—অতি অসম্ভব—একেবারে আশার অতীত। কিন্তু মা! তোমার রাজ্যে, তোমার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অহৈতুকী করুণার নিকটে, সংসারের সকল অসম্ভবই সম্ভাবিত। আমরা যতই অশান্ত, অদান্ত, ঘোরনারকী, মহাপাতকী, হই না কেন মা! তোমার সেই অপার অনন্ত করুণার ধারায় সব কে ধুইয়া যায়! তুমিই না বলিয়াছ—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সোপি সংসার দুঃখৌঘৈ র্বাধ্যতে ন কদাচন॥"

জীব যত পাপই করুক না কেন, যদি একবার অনন্যমনে তোমার

চরণে শরণ লয়, তুমি সযত্নে সংসার হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দাও। তাই তোমার নাম পতিত-পাবনী। কিন্তু করুণাময়ি মাগো! আমরা দিনান্তেও ত দীনতারিণীকে ডাকি নাই, প্রাণান্তেও ত পতিতপাবনীর পদপ্রান্তে শরণাপন্ন হই নাই, তবে তোমার এ অভয়-আশ্বাসে আমাদের আশা কৈ মা? আমাদের উপায় কি মা? উপায় কি তবে নাই, অবশ্য আছে,—

"মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি"

আমাদের ন্যায় পাপী জগতে নাই বটে সত্য, কিন্তু তোমার মত পাপনাশিনীও ত আর সংসারে দেখি না। তাই আবার আশাও হয়—অসম্ভব হইলেও তোমার এ করুণায় আমরা কথনই বঞ্চিত হইব না! এস মা! তোমার ঐ অহৈতুকী করুণার বিমল গঙ্গাজলে, সংসার-মলীমস-সমাচ্ছন্ন অশান্ত সন্তান-কুলকে নির্ম্মল করিয়া কোলে তুলিয়া লও, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে উঠিয়া, মা মা বলিয়া জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা সব ভুলিয়া যাই। দিদিমা, খুড়িমা, পিসিমা, মাসিমা, এ সব উপাধিগুলি বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল এক অখণ্ড বিশ্বময়ী মহামাতৃসত্তায় আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া থাকি। মাময় জগতে জগন্ময়ী মাকে দেখিয়া যেন যথার্থই বলিতে পারি—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।"

এস ভারতের নরনারী! আজ আমরা দুঃখ দারিদ্র্য ভুলিয়া গিয়া দুর্গতিদমন দুর্গানামের বিজয়-বৈজন্তী গরবে গলায় পরিয়া, অন্ততঃ তিন দিনের জন্যও জগদেক-জননীর সন্তান বলিয়া সংসারে পরিচিত হই। সুরাসুর-কিন্নরনরের আরাধ্যধনকে হৃদয়ে ধরিয়া, মৃত্যুঞ্জয়-হৃদয়-রঞ্জিণীর মণিমঞ্জীর-শিঞ্জিত চরণাম্বুজে সচন্দন জবাঞ্জলি দিয়া জন্মজীবন ধন্য করি। আর কোটি কোটি কণ্ঠ একত্র করিয়া সকলে মেলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলি—

"এহ্যেহি ভগবত্যম্ব! শত্রুক্ষয়-জয়প্রদে!
আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি! সর্ব্বকল্যাণহেতবে"।

শ্রীযতীশচন্দ্র শাস্ত্রী।

নিদ্রা ও চরকোক্তি।

তমোভবা শ্লেষ্মসমুদ্ভবা চ মনঃশরীরশ্রম-সম্ভবা চ।
আগন্তুকী ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী চ রাত্রিস্বভাব-প্রভবা চ নিদ্রা ॥

সূত্রস্থান।

নিদ্রা ষট্ প্রকার। প্রথম—তমোগুণ সম্ভবা। যাহারা কেবল খায় দায়, নিদ্রা যায়, আহার মৈথুনাদি অজ্ঞান-পশুসুলভ কয়েকটী দৈনন্দিন অভাব-পূরণ ব্যতীত যাহাদের জীবনের আর বড় কিছু উদ্দেশ্য নাই, সেই সমস্ত তামসিকপ্রকৃতিক ব্যক্তিদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ চিরপ্রিয় নিদ্রালুতা, তাহাই এই প্রথম শ্রেণীভূক্ত। দ্বিতীয়—শরীরস্থ শ্লেষ্মধাতুর আধিক্য বশতঃ। যাঁহাদের ধাতু কফপ্রধান, যাঁহারা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ তাঁহাদেরই এই দ্বিতীয় প্রকার নিদ্রা হইয়া থাকে। তৃতীয় নিদ্রা—পরিশ্রম জনিত। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বা দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অত্যধিক চালনা বশতঃ যে গ্লানিকর ক্লান্তি উপনীত হয়, তাহাই অপনোদনের জন্য এই নিদ্রা মঙ্গলময়ের এক অভাবনীয় অনুপম সৃষ্টি! এ নিদ্রা বড় মধুর, বড় তৃপ্তিপ্রদ,—শ্রমতাপিত দেহের কেমন যেন এক অপূর্ব্ব-সুখনির্ঝরিণী। জীবিকান্বেষণে উত্তমাঙ্গের ঘর্ম্মধারা যাহার পদোপরি প্রস্রুত হয় নাই, সে এই সুখের স্বাদ কি বুঝিবে? চতুর্থ প্রকার নিদ্রা— "আগন্তুকী" নামে অভিহিত। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে নিদ্রা কোনও ঔষধ, পথ্য বা প্রক্রিয়া বিশেষের প্রয়োগ দ্বারা আনয়ন করা হয় তাহাই এই চতুর্থ শ্রেণীর।—যেমন অহিফেন, দধিযুক্ত সুশুনি-শাকের অম্ল বা মস্তকে শীতল জল সেচন ও তদুপরি ব্যজন বায়ু প্রভৃতি দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ। এই জাতীয় নিদ্রা আকস্মিকীও হইতে পারে, যেমন অজ্ঞাতসারে কোন বিষ বা মাদক বস্তু উদরস্থ হইলে সংজ্ঞার অপগম দৃষ্ট হয়। পঞ্চম প্রকার নিদ্রা—ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী অর্থাৎ কোনও রোগের স্বভাব হইতে উৎপন্ন। অনিদ্রা যেমন কোন কোন রোগের উপদ্রব, অতিনিদ্রাও তেমনি রোগবিশেষের উপসর্গস্বরূপ উপনীত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ প্রকার নিদ্রা—রাত্রি-

স্বভাব-প্রভবা। নিশা সময়ের এমনই প্রকৃতি যে, তৎসময়ে অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই নিদ্রাদেবীর সংমোহন আবেশে অভিভূত হইয়া থাকে।

যখন তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যদেবের বিশ্রান্তির পর, তৎপ্রতিনিধি প্রদীপাদি-সম্ভূত আলোকেরও পর্য্যায়ক্রমে জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হয় ও দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন, জগৎ নিঃশব্দ নিঃস্তব্ধ হইয়া পড়ে, তখন নিদ্রা নিজমূর্ত্তির সহিত জাগতিক মূর্ত্তির সামঞ্জস্য দেখিয়া অযাচিত অনাহূত ভাবে স্বয়ংই জীবদেহে আশ্রয় লইয়া থাকে।

রাত্রিস্বভাব-প্রভবা মতা যা
তাং ভূতধাত্রীং প্রবদন্তি নিদ্রাং।
তমোভবা মাহুরঘস্য মূলং
শেষং পুন র্ব্যাধিষু নির্দ্দিশন্তি।—সূত্রস্থান।

যে নিদ্রা রাত্রিস্বভাবসুলভ তাহাই ভূতধাত্রী অর্থাৎ জীবগণের পালয়িত্রী নামে আখ্যাতা। এই নিদ্রাই দেহের পুষ্টিসাধনী, মনের স্থৈর্য্যবিধায়িনী এবং জীবকুলের জননীর ন্যায় পরম হিতকরী। আর যে নিদ্রার কারণ তমোগুণাধিক্য তাহা পাপের মূল এবং অগণিত অনিষ্টের আকর-স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকার সমস্ত নিদ্রাই (অর্থাৎ আগন্তুকী, শ্লেষ্মসম্ভূতা, ও ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী এই তিনই) ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত, যেহেতু, এই তিন প্রকার নিদ্রা হইতেই দৈহিক কষ্টানুভব হইয়া থাকে।

নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শ্যং বলাবলং।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানম্ অজ্ঞানং জীবিতং ন বা॥—সূত্রস্থান।

পূর্ব্বোক্ত নিশাসুলভা ভূতধাত্রী নিদ্রার উপরেই মনুষ্যের সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, বীর্য্যবত্তা, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন ও মরণ নির্ভর করে। বস্তুতঃই নিদ্রাসুখ মনুষ্যের সম্ভোগার্হ বিষয় সমুদায়ের মধ্যে প্রধানতম বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যদি একদিন অভ্যস্তকালাপেক্ষা একটু বিলম্বে নিদ্রা হয়, তবে শরীর ও মনের যে কি অবস্থা হয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আবার যদি সমগ্র রাত্রিটী এককালীন নিদ্রাদেবীর প্রসাদ-প্রাপ্তি না ঘটে, তাহা হইলে যে কত যাতনা হয় তাহার

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু উপর্য্যুপরি কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত একাদিক্রমে নিদ্রালেশবর্জ্জিত হইয়া নিশাযাপন করিতে হইলে যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা অবর্ণনীয়—অতীব লোমহর্ষণ—মনে করিতেও প্রাণ চমকিয়া যায়। শুনা যায় কোনও পাশ্চাত্য প্রদেশে দণ্ড্য ব্যক্তিকে কারাগারে পূরিয়া অপরাধের তারতম্যানুযায়ী পাঁচ সাত দশ বা ততোধিক রাত্রি পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রাখা হইত এবং বিন্দুমাত্র নিদ্রার আবেশ উপস্থিত হইবামাত্র, প্রহরীর লগুড়াঘাতে তাহা অপসারিত করা হইত। পাঠক! মনে হয় না কি যে, এই দণ্ড বিষ, অস্ত্র বা উদ্বন্ধন অপেক্ষাও ঘোরতর!

নিদ্রা শরীরের পুষ্টিজনক; ঘৃত দুগ্ধ মাংসাদি সহস্র বলকর আহার্য্যের নিত্যাভ্যাস থাকিলেও নিদ্রা ব্যতিরেকে কদাপি শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না।

আহার্য্যকর্ত্তৃক দেহপুষ্টি না হইলে শুক্রধাতুর সঞ্চারও যথামাত্রায় হয় না—সুতরাং শুক্রের হ্রাসহেতু ক্রমে পৌরুষশক্তির হানিও হইতে পারে। অন্যান্য শারীর যন্ত্রের অপেক্ষা মস্তিষ্কই সর্ব্বাপেক্ষা নিদ্রার সাহায্যাপেক্ষী; যেহেতু, সমস্ত যন্ত্রেরই মধ্যে মধ্যে ন্যূনাধিক বিশ্রাম আছে, কিন্তু উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়া অবিশ্রান্ত—কারণ মনুষ্যের চিন্তাস্রোতঃ সর্ব্বদাই বহমান। নিদ্রাব্যতীত চিন্তার বিরতি নাই—মস্তিষ্কেরও বিশ্রাম নাই। সুতরাং অবিশ্রান্ত নিদ্রাহীনতায় ক্রমে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ বা উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়।

অনিদ্রা দ্বারা বায়ুবৃদ্ধি বা স্নায়বিক উত্তেজনার আতিশয্য, তৎসঙ্গে পিত্তেরও প্রকোপ হইয়া থাকে। বায়ু ও পিত্ত যুগপৎ কুপিত ও একত্র মিলিত হইয়া সমীরণসহকৃত প্রচণ্ড অগ্নির ন্যায় শরীরস্থ সপ্তধাতুকে দগ্ধ করিয়া ফেলে—এ অবস্থার পরিণাম মৃত্যু। সুনিদ্রা দেহমন্দিরের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। অপি চ সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের একটী প্রধান লক্ষণ। (ক্রমশঃ)

আশা বৈতরণী নদী।

বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি "আশা বৈতরণী নদী" অর্থাৎ বৈতরণী নদীর যেমন আদিঅন্ত নাই আশার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। আশার

ছলনায় একবার পড়িলে তাহার হস্ত এড়ান দুঃসাধ্য। আশা যতই ফলবতী হউক না কেন, তাহার দৈর্ঘ্য কিছুতেই হ্রাস হয় না।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন পঞ্চ পাণ্ডবকে সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমি দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক স্বয়ং একমাত্র ধরণীশ্বর হইবার আশায় বুক বাঁধিয়া কুরুপাণ্ডবের মহাসমরের সৃষ্টি করিয়া অগণ্য ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিয়া শেষে শত ভ্রাতা সহ নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হায়, কোথায় তাঁহার সাম্রাজ্য লাভ! আশার ছলনায় তাঁহার কি সর্ব্বনাশই সংঘটিত না হইল!!

মহারাজ যযাতি পুত্রের যৌবন লইয়া সহস্র বর্ষ সুখসম্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক আশার সীমা নাই। ঘৃত সংযোগে অগ্নি যেমন বর্দ্ধিত হয়, মানব হৃদয়ে আশা তদ্রূপ প্রতিনিয়ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মহারাজ যযাতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

বস্তুতঃ আশা অকূল পাথার; তাই ইহার অপর নাম "বৈতরণী নদী"। আশার মোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণে জীবহৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। বিবাদ বিসম্বাদ মারামারি কাটাকাটি খুনখারাপি দানখয়রাত জগতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটিতেছে তৎসমুদায়ের মূলই আশা। একদিকে আশা মানবহৃদয়ে যেমন উত্তপ্ত দাবানল জ্বালিয়া দেয়, অপরদিকে তদ্রূপ প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে। আশা না থাকিলেও মানবের পক্ষে জীবনধারণ করা দুরূহ হইত। একটি উপযুক্ত উপার্জ্জনশীল পুত্র কালকবলে পতিত হইল, অমনই পিতা মাতা তাঁহাদের পঞ্চম বর্ষীয় শিশু পুত্রটির প্রতি কত আশা করিয়া তাহার মুখ চাহিয়া রহিলেন; আশা—পুত্র কালে 'দশের এক' হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে।

বর্ত্তমান বর্ষে অনাবৃষ্টিতে কৃষকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইল কিন্তু তবুও হতাশ্বাস হইল না, আগামী বর্ষে সুবৃষ্টির আশায় রহিল। যথাসময়ে সুবৃষ্টির সমাগমে দ্বিগুণ উৎসাহভরে কৃষকবর্গ কর্ত্তব্যক্ষেত্রে খাটিতে লাগিল; কিন্তু হায় সবই বিফল; অতিবৃষ্টিতে এ বার কৃষকগণের অনন্ত আশা কোথায় ভাসিয়া গেল,

সকলেই মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিল, কিন্তু পরক্ষণেই আপার মোহন বংশীধ্বনি শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া আগামী বর্ষের প্রতীক্ষায় রহিল। আশা আর ফুরায় না—তাই বলিতে হয় আশা বৈতরণী নদী। কিন্তু হোক তাহা 'বৈতরণী নদী', তা বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিও না। আশা না থাকিলে মানবের দগ্ধজীবন কে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিত!!

আশা তিন ভাগে বিভক্ত যথা আশা, দুরাশা, নিরাশা। বর্ত্তমানযুগে আমাদের আশা, দুরাশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাই তাহার তীব্র উত্তাপে আমাদের হৃদয় ঝালসাইয়া যাইতেছে। অধুনা কলু, তাঁতী, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সকলে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া একটা কিছু (অর্থাৎ ডেপুটী বা তদ্বিশেষ) হইবার প্রত্যাশায় আকুল হইয়া শিক্ষালয়াভিমুখে ধাবমান হইতেছে। কলু ঘানি বেচিয়া, কৃষক তাহার বহুকষ্টসঞ্চিত লাঙ্গল খানি বেচিয়া, পুত্রের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করিল; পুত্র যথাসময়ে দুই কলম ইংরাজি শিখিয়া হ্যাট্‌কোট আঁটিয়া চুরট বার্ডসাইয়ের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিজের পদবীতে পরিচয় প্রদান করিতে লজ্জিত হইয়া শ্যামা কলু লিখিতে আরম্ভ করিলেন 'শ্যামচরণ দাস'। হরে ধোবা লিখিতে শিখিলেন 'হরিচরণ দেব'। আর সেই শিক্ষিত পুত্রদের মাতা পিতা পৈত্রিক রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া চলাতে পুত্রগণ নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া Oldfool বলিয়া তাঁহাদিগকে Don't care করিলেন। শিক্ষার ফল ত এই! মাতা পিতা বহু আশা করিয়া যে পুত্রের শিক্ষার্থে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, সে পুত্রের অবস্থা ত এই! কিন্তু এমন কেন হয়? বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে দুরাশার ফল বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হইবার আশা করা দুরাশা মাত্র। অধুনা সকলেরই ধারণা—শিক্ষা কেবল চাকরী করিবার জন্য; সুতরাং "শুকপাঠ" গোচ চাকরীর উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া সকলেই নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে ছুটিলেন। অনেকেই তাহাতে হতাশ্বাস হইয়া "ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট ন চ পূর্ব্বো ন চ পরঃ" গোচ হইয়া রহিলেন। শিক্ষিত আজকাল সবাই—কিন্তু রাজসরকারে এত চাকরী কোথায়, তাহা একবার কেহ ভাবিয়া দেখিবেন না। আজকাল শিক্ষার উদ্দেশ্য—মাত্র চাকরী করা, সুতরাং তাহাতে নিজধর্ম্মানুশীলন বা কর্ত্তব্য শিক্ষা

কিছুমাত্র হয় না। এমত অবস্থায় উন্নতির আশা দুরাশামাত্র। এই দুরাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র ও কর্ত্তব্যানুশীলন সহ যদি সকলে নিজ নিজ ব্যবসায় রক্ষা করিতে যত্নবান্ হন, তবে স্বীয় জীবনের ও অবস্থার উন্নতি হয়। অধুনা আমাদের দেশীয়গণ সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই আমাদিগকে প্রতিনিয়ত বিদেশীয় ব্যবসায়ীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে। স্বর্ণপ্রসূ ভারতের অধিবাসিগণের লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য বিদেশীয়গণ বস্ত্র আনিয়া যোগাইতেছেন। বলিহারি ভারতবাসীর শিক্ষা! বলিহারি তাঁহাদের অপূর্ব্ব রুচি!!

দুঃখের বিষয় এই, দুরাশা পুরুষহৃদয় করতলগত করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। রমণীদিগের কোমল মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদেরও মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বে যে বাড়ীর কর্ত্তা থানকাড়া পরিয়া কাটাইয়াছেন, আজ সেই বাড়ীর পুত্রবধূর ফরাসডাঙ্গার ধুতি না হইলে লজ্জা নিবারণ হয় না, তাঁহাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় না।

গৃহিনীগণ আর সংসারের কার্য্য দেখিতে পারেন না। সন্তানপালন করিতে গেলে ঝঞ্চাটে তাঁহারা পীড়িতা হন, রাঁধিতে গেলে মাথা ধরে, কাজেই প্রতি গৃহে দাসদাসী চাই সুতরাং খোরাক পোষাক ৫।৬ টাকা মাহিনা দিয়াও দাসদাসী খুঁজিয়া মেলা ভার। কুড়ি টাকা মাহিনার একটি চাকরী খালি হউক, দেখিবে বিএ, উপাধিধারীর রাশি রাশি দরখাস্ত আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু আট টাকা মাহিনা স্বীকার করিয়া একজন পাচক খুঁজিয়া মেলা ভার হইবে। এই সমস্তই শিক্ষার ফল! আধুনিক শিক্ষা পূর্ণ ভাবে হইতেছে না, অর্দ্ধশিক্ষা হইতেছে মাত্র। আধখান বস্ত্র পরিধানে যেমন লজ্জা নিবারণ হয় না, তদ্রূপ অর্দ্ধ শিক্ষায় জীবনের উন্নতি হইতে পারে না। অর্দ্ধের কিছুই ভাল নহে! আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর প্রতি সমাজপতিগণের দৃষ্টি পতিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সমাজে অশান্তির ইয়ত্তা নাই—হিন্দুরমণী আজ ডাকের পুত্তলীবৎ গৃহ শোভাবর্দ্ধনের সামগ্রীমাত্র। যে হিন্দুরমণীর পবিত্র নাম ইতিহাস উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে, যে হিন্দু রমণীর নাম প্রাতঃস্মরণীয়, যে হিন্দুরমণী

"শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ", সেই হিন্দুরমণী আজ একি ভাবে বিরাজিত! ভারতের দুর্দ্দশার আর বাকী নাই। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও আমরা হিন্দুরমণীর মুখের দিকে কত আশা করিয়া সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছি। ভরসা, তাঁহারা নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়া, আবার তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণতায় ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। তাঁহাদেরই গুণে সোণার ভারতে আবার সোণা ফলিবে। রমণীর এই অধঃপতনের দিনেও আমরা তাঁহাদের প্রতি নিরাশ হই নাই, কত আশায় বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি। তাই বলিতে হয় "আশাবৈতরণী নদী"!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

বিনোদিনীর কটাক্ষ।

বিনী'র বয়সের তুলনায় তার কটাক্ষের ব্যাসটা অনেক বেশী। ব্যাস কথাটা শুনিয়াই বোধ হয় অনেক পাঠক ওটাকে ব্যাসকূট ভাবিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। বসিবারই কথা বটে, কেন না জ্যামিতি শাস্ত্রটা পরীক্ষার পর হইতে অনেকেরই একেবারে জগন্নাথকে দান করা হইয়াছে কি না! তার উপর আবার, কটাক্ষের ব্যাস। ওঃ কি বিরাট কল্পনা! যদি কটাক্ষের ব্যাস রহিল, তবে নিশ্চয়ই কটাক্ষ একটা তলক্ষেত্র? সন্দেহ কি? কিন্তু শুধু কি তলক্ষেত্র? কত অতল, বিতল, সুতল, ধরাতল, রসাতল ঐ কটাক্ষের তলস্থ। তুমি যোগী, আজানুলম্বিত শ্মশ্রুজালে তোমার কঙ্কালের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত, তুমি ষট্‌চক্রভেদ করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার সম্পর্ক ঘনীভূত করিয়া, নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত গিরিগহ্বরের এককোণে পাতরচাপা পড়িয়া আছ, কিন্তু আমার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বিনী'র পরীক্ষায় তোমার যোগ যাগ সব উড়িয়া গেল। বিনী'র যাই একটা কটাক্ষের রেখাপাত, অমনি কোথায় বা তোমার অনুত্তরঙ্গ অম্ভোধির গাম্ভীর্য্য! আর কোথাই বা তোমার অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের ভীতিমিশ্রিত প্রশান্তভাব! সবই যেন বাঁশপাতার তরলতা! সবই যেন শরতের উড়ন্ত মেঘ! ওঃ কি

কটাক্ষের তেজ কিন্তু! এই যে তোমরা দেবতা দেবতা কর, দেবভাব ও পশুভাবের তুলনায় তোমাদের মুখে যে উনপঞ্চাশ পবনের অধিষ্ঠান হয়, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের দশাটা ভাব দেখি। যাই মদন একটা হাওয়ার বাণ ছুঁড়িল, অমনি "হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ"। শুধু কি তাই! "উমা-মুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি"। ছি, ছি কি বেয়াদবী! তুমি আমি—নরকের কীট, যে ভাবে অক্ষত যৌবনের প্রক্কালে, অপরি-তর্পণীয় লালসায় লেজেগোবরে জড়াইয়া থ হইয়া থাকিতাম, আজ বশী ব্যোমকেশ কি না সেই ভাবে, আমি শপথ করিয়া বলিতে সাহস করি, কালি-দাস সাক্ষী, ঠিক সেই ভাবে, আমাদের চেয়ে বরং এক ডিগ্রী বেশী হাড়-গোড় ভাঙা দ এর মত "দিশাং উপান্তেষু সসর্জ্জ দৃষ্টিং।" তবে চতুর-চূড়ামণি পঞ্চানন একটু চালাক কি না, তাই নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য ক্রোধে তালপাতার আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠেই "ভস্মাবশেষং মদনং চকার।" তাই না হয় হ'ক, মদন ছোঁড়া মরিল, পৃথিবী জুড়াইল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বয়াটে ছেলেগুলো বাপমায়ের বশীভূত হইল; ও হরি, কোথা থেকে এক সরস্বতী ভেসে এসে কি বোলছে শোন। রতি যখন কামের বিরহে একান্তই কাতরা, তখন আকাশবাণী তাহাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতেছেন—

কুসুমায়ুধপত্নি দুর্ল্লভস্তব ভর্ত্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি।
শৃণু যেন স্বকর্ম্মণা গতঃ শলভত্বং হরলোচনার্চ্চিষি॥
অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূৎ॥
পরিণেষ্যতি পার্ব্বতীং যদা তপসা তৎপ্রবণীকৃতো হরঃ।
উপলব্ধসুখস্তদাস্মরং বপুষা স্বেন নিয়োজয়িষ্যতি॥

ভাবটা হইল এই—রতি তুমি কাঁদিও না, তোমার ভর্ত্তা বাঁচিবে। এক-দিন তোমার স্বামী, চারকেলে বুড়া অস্থদন্তহীন পিতামহ ব্রহ্মাকে তামাসা করিয়া একটা ফুলের বাণ মারিয়াছিল। পিতামহের নির্ব্বাণোন্মুখ বুড়োধাতু কি-না, তাই সেই কুসুম শরাঘাত সাঙ্ঘাতিকরূপে এরূপ লাগিল যে সেই আঘাতে তাঁহার সেই চতুর্ব্বেদচিন্তাচন্দ্রিকাপ্রসূ মস্তিষ্কটা তমোবহুল হইয়া "স্বসুতায়াং" কেমন একটা বিকৃতদৃষ্টি ফেলিয়া দিল। অমনি উঠিয়াই

মদনকে এক প্রকাণ্ড শাপ প্রদান। যেমন তুই আমাকে এমন করিলি, তেমনি তুই মহাদেবের চোখের আগুনে পুড়ে মর। সে দিনের ছোঁড়া তুই, তোকে হ'তে দেখলুম, আমার সঙ্গে ফুল ছুঁড়ে ইয়ারকি? হা ভগবান্, তুমিই জান, প্রবৃত্তির ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপাইয়া কয়জন কয়েদী কারাবাসের কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এখনও সরস্বতীর কথা ফুরায় নাই, আরও আছে। সরস্বতী রতিকে পতিমিলনের তারিখটা বলিয়া দিতেছেন, দেখ রতি, যে দিন শৈলসুতার সহিত মহাদেবের বিবাহ হইবে সেই দিন তিনি সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তোমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দিবেন। হবেই ত—

"অশনেরমৃতস্য চোভয়োর্বশিনশ্চাম্বুধরাশ্চ যোনয়ঃ।

অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আর মেঘ উভয়ই অশনি ও অমৃতের আধার। ভদ্রলোকের কি আর চিরকালই রাগ থাকে?—মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ করাটাও তাঁদের অভ্যাস আছে। তবে অনুগ্রহটা স্বার্থশূন্য হইলেই লোকের কাছে প্রাণখুলে প্রশংসা করা যায় মাত্র।

হা অদৃষ্ট! মহাদেবের কথা প্রসঙ্গে আবার বুড়া পিতামহের কেলেঙ্কারীটে বাহির হইয়া পড়িল। যাঁর মুখের বাণী বেদ, যাঁর রচিত বিশ্বে বাসা বাঁধিয়া গরিব বেচারীর দিনগুজরান্ হয়, তিনিও আবার কম পাত্র নন্। কনিষ্ঠটী ছিলেন "শৈলসুতায়াং", তিনি আবার "স্ব-সুতায়াং"। কার কথা বা কাকেই বলি, কেই বা শোনে কেই বা বিচার করে।

ভ্রান্ত মন, কি বকিতেছ? তুমি যাঁহাদের কামুকতার কথা লিখিয়া কালী কলম কলুষিত করিতেছ, তাঁহারা যে "জগতঃ পিতরৌ", তাঁহারা যে "বন্দ্যৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ"! হউন না তাঁহারা "জগতঃ পিতরৌ", হউন না তাঁহারা "সহরস্য ভ্রাতরৌ", হউন না তাঁহারা "স্বর্গস্য গুরুতল্পশিষ্যৌ", হউন না তাঁহারা ব্রহ্মলোকস্য "পিতাদুহিতরৌ", তাঁহারা লীলাময়ের করকল্পিত সাকার "স্ত্রীপুংসৌ" বই ত নয়! সুরেশই হউন আর নরেশই হউন, যে হউন না কেন The law must take its own way. আমি বিজ্ঞান লিখিতে বসিয়াছি, শরমের ঘোমটা দিলে চলিবে কেন? মেডিকেল কলেজ খুলিয়া বসিয়াছি, মড়ার গন্ধে ঘৃণা করিলে উপায় কি? ভগবানের আইন লিখিতে বসিয়াছি, রাজার বিষ্ঠাকে গোবর বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। এ ত স্বভাবের নিয়ম।

প্রত বিনী'র উপর ভগবানের খোলা হুকুম। এই যে তুমি আমি পুরুষ জাতি, লম্ফে ঝম্ফে খোদ ভগবানের গায়ে পড়িয়া নিবাইয়া যাইতে উৎসুক, গয়লা-নীর দুধের হিসাব, চাকরাণীর পূজার বস্ত্র, তনয়ের চোখের চসমা এই সকলের প্রাণশোষিণী তালিকা দেখিয়াই দিনের মধ্যে দুই শতবার নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রশান্ত উৎসঙ্গে নিদ্রিত হইবার জন্য লালায়িত; যদি ভগবান্ বিনী'কে পাঠা-ইতে ভুলিতেন, তবে তাঁহার এই লীলাক্ষেত্র একবারে সাড়াশব্দহীন হইয়া যাইত। তাই লীলাময় ভগবান্ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বিনী'কে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিলেন, হে অচেতনে, ত্রিগুণে, "বীজধর্ম্মিণি, প্রসব-ধর্ম্মিণি, অমধ্যস্থধর্ম্মিণি বিনোদিনি তুমি অবিলম্বে একাকিনী ধরাধামে গমন করিয়া চেতনাবান্, নিগুর্ণ, অবীজধর্ম্মী, অপ্রসরধর্ম্মী, মধ্যস্থধর্ম্মী পুরুষ রাশিকে বলে হউক ছলে হউক কৌশলে হউক ভুলাইয়া রাখ। যখন তাহারা আমার লীলাগ্রন্থি ছিঁড়িতে উদ্যত হইবে, তখনই হে অচেতনে, একবার তাহাঁদের উপর কটাক্ষপাত করিবে মাত্র। অমনি দেখিবে তাহারা আমার ভুলিয়া, তোমার জড়ভাকে চেতনা মিশাইয়া তোমারই চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। যেমন কুসুমে ভ্রমর, সেইরূপ স্ত্রীরূপে জীবজগৎ দিশা হারাইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। যেখানকার ফুল সেইখানেই থাকে, কিন্তু বেচারা অলির আর বিশ্রাম্ নাই। কেবল গুণ গুণ গুণ গুণ।" পুরুষ নিগুর্ণ পাগল, আশার দাস। সে ব্যোমযানের মত সরল প্রাণে উন্মুক্ত পবনে, উদাসগগনে উড়িয়া বেড়াইতে উৎসুক। কিন্তু হে ত্রিগুণে, তুমি গুণময়ী বাসনা হইয়া, ব্যোম-যানের বালির মত, লীলাক্ষেত্রেরই চারিদিকে তাহাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে।

তুমি মাতৃভাবে তাহাকে সত্ত্বগুণে বাঁধিবে, জায়াভাবে তাহাকে রজো-গুণে কাজ করাইবে, কন্যাভাবে তাহাকে তমোগুণে বিমুগ্ধ করিবে। সে আমাকে ভুলিয়া তোমারই উপর ভক্তি, প্রেম ও স্নেহধারা বর্ষণ করিলে, আমি দেখিয়াই সুখী হইব। আমি পুরুষে জগতের বীজ রাখিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা কথার কথা মাত্র। তুমি ক্ষেত্ররূপে সেই বীজ গ্রহণ করিয়া পোষণ করিবে, বর্দ্ধন করিবে, এবং উপযুক্ত সময়ে আমারই ভবের হাটে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। সে তোমারই গুণ গাহিয়া মা মা বলিয়া ডাকিবে;

তোমারই চরণে কুসুম রাশি ঢালিয়া আনন্দে ভাসিবে; আমি দেখিইয়া সুখী হইব, আমার সৃষ্টিলীলা সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া বড়ই প্রীতি অনুভব করিব। হে সংসার লক্ষ্মি, উদাসীন ব্যোমভোলা মহেশ্বর, যখন আয় ব্যয়ের হিসাব ভুলিয়া, সংসারকে অসার ভাবিয়া নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে, তখনই হে মায়ারূপিণি! তুমি পাষাণ-নন্দিনী হইলেও, একবার দয়া করিয়া তোমার সেই সুন্দর মুখখানির অনঙ্গ-সুলভ কটাক্ষটুকু তাঁহার প্রতি বিক্ষেপ করিও। সেই যে তোমার কটাক্ষ-তরঙ্গ তাহার মর্ম্মস্থানে স্পর্শিবে, তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, তাহাতেই পাপের হিংস্র শ্বাপদ মরিয়া পুণ্যের রাজ-ধানী স্থাপিত হইবে। এই ত বিনী'র উপর ভগবানের খোলা হুকুম। এখন বিনী যেই হউক না কেন, যেখানেই বসুক না কেন, সে বৈষ্ণবী মায়ার পরওয়ানা লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিমুগ্ধ করিতেই আসিয়াছে। তাহার কটাক্ষে কত রাজ্য পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, কত ভস্মময় রাজ্য সৌন্দর্য্যলহরী তুলিয়া নাচিয়া উঠিবে, কত অমরাবতী শ্রীভ্রষ্ট হইবে, কত সাহারা অমরাবতী হইবে। এ ত বিধিবিহিত বিড়ম্বনা। 'বিনী'র ইহাতে কোন স্বাধীনতা নাই।

এই যে সহরের ঘোড়াগাড়ী—এ বিনী'র অনুগ্রহ। এই যে দরিদ্রের কাঁথা-নড়ী এ বিনী'র নিগ্রহ। যদি বিনী সংসার ছাড়িয়া যায়, তবে দেখিবে, মালী আর ফুল তুলিবে না, গাছের ফুল গাছেই শুকাইবে; আকাশে আর সুধাংশু হাসিবে না, চাঁদের সুধা চাঁদেই মিশাইবে; ধমনীতে আর উৎসাহ নাচিবে না, বুকের তরঙ্গ বুকেই মরিয়া আসিবে; জলে স্থলে শূন্য দেশে, হৃদয়ে, ঘাটে, মাঠে, শয়নে, ভোজনে যেখানে সেখানে কেবল বিনী'রই অনুগ্রহ নিগ্রহের বিনিময় দেখিতে পাই। তাই বলি বিনী'র বয়সের তুলনায়, তার কটাক্ষের ব্যাসটা অনেক বেশী। যদিও ভাই, তুমি আমি জ্ঞানকাণ্ডের বজরার মাথায় তর্কযুক্তির পাল তুলিয়া, অকূলপাথারে পরাৎপরের পানসি ধরিতে ছুটিয়াছি, কিন্তু—

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ॥

তাই বলি, আর গোলমালে প্রয়োজন নাই, এস আমরা বিনী'কেই বিনয় করিয়া বলি—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে।

পাঠক, এখন বিনী'কে চিনিয়াছ?

শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্থ।

জাতিভেদ সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একণে দেখা যাউক, বাস্তবিকই কি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্রগণের মধ্যে আত্মাভিমান ও আত্মগ্লানি, ঘৃণা ও হিংসা বড়ই প্রবল ছিল? পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা ছিল না, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতেন না? আমাদের মধ্যে এখন এত যে অনৈক্য তাহা কি জাতিভেদ হইতে প্রসূত? কার্য্যকারণ দেখিয়া তাহা ত প্রতীত হয় না। একাসনে বসিয়া একপাত্রে আহার করিলে এবং এক গেলাসে জলপান করিলেই যে সহানুভূতি হইল, তাহা নহে। এ সকল করিয়াও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এখন আমরা যে তলে তলে অন্যের ক্ষতি করিতে ব্যগ্র, কোন প্রতিবাসী, বা সহাধ্যায়ী, অথবা সহকর্ম্মচারীর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের হৃদয় যে ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে থাকে, এ কথা কি উদারহৃদয় সাম্যবাদী অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু তখন ত এরূপ ছিল না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থদিগকে ত ঘৃণা করিতে পারিতেন না, বরং দয়া করিতেন, স্নেহ করিতেন, সকল কার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। শূদ্রগণের আচার ব্যবহারে ব্রাহ্মণগণের ঘৃণা হওয়া সম্ভব, কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া তাঁহারা কায়স্থশূদ্রদিগকে ঘৃণা করিতেন না। কায়স্থ ও শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সর্ব্বদা সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতে শিক্ষা দিতেন। পক্ষান্তরে কায়স্থ ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যে হিংসা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না; আত্মগ্লানিতেও তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ থাকিত না। পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ও আহার ব্যবহার [illegible] জের বিবাহাদি উপলক্ষে সকলেই আমন্ত্রিত হইতেন, এখনও হন;

এবং বিপদে ও সম্পদে, সুখ ও দুঃখে কে তাঁহার সাহায্য না পাইতেন? পূজার্চ্চনা, ব্রতনিয়ম ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত হইবার নহে; এবং তন্তুবায়, রজক, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, কুম্ভকার প্রভৃতিকে হিন্দুর নিত্য কার্য্যে ও নানা ক্রিয়া কলাপে সর্ব্বক্ষণ আবশ্যক। তখন এতদূর সহানুভূতি ও ঘনিষ্টতা ছিল যে, গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নাম, পরিচয়, কার্য্যাদির বিষয় প্রত্যেকে অবগত ছিলেন। হিন্দু জাতিভেদ প্রথা এরূপ সুন্দররূপে গঠিত, বিভিন্ন শ্রেণী এ প্রকার বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত যে, প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অবলম্বন হইতে হইয়াছে। অমুক শ্রেণীর সহিত একবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব, ইহা কাহারও বলিবার যো নাই। তখন বিভিন্ন শ্রেণী স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকা হেতু এক শ্রেণীর অন্যশ্রেণীর প্রতি প্রতিযোগিতা জনিত বিদ্বেষও জন্মিতে পারিত না। বিদ্বেষ ভাব দূরের কথা, এখন সাম্যনীতির প্রভাবে ন্যায়পরায়ণ ও দয়াবান্ হইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র সকলেরই এক ব্যবসা—চাকুরী হইয়াছে। এখন এম এ শূদ্র, এম এ ব্রাহ্মণকে আপনার তুল্য জ্ঞান করেন; যদি উভয়ের কাহারও উচ্চপদ হয়, তবে হিংসায় অন্যের হৃদয় ফাটিয়া যায়। এখন সকলেরই এক প্রণালীর বিদ্যা, একরূপ শিক্ষা, একপ্রকার বুদ্ধিই অবলম্বন, ইহাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসূতি; তাহার ফল অসন্তোষ ও বিদ্বেষ। তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও শূদ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেন; এখন সুশিক্ষিত, দাম্ভিকতা-পূর্ণ হইয়া অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতকে ঘৃণা করেন। সমাজের এই পরম কল্যাণ-সাধনের জন্যই কি আমরা সাম্যনীতি শিক্ষা করিয়াছি? এই ঘোর বৈষম্যই কি ন্যায়পরায়ণতা ও দয়াশীলতার নিদর্শন! জাতিভেদ-সংহারকারীদের ইহাই কি হৃদ্যতা! একবার নিরপেক্ষভাবে বল দেখি, এই জাতিভেদ অভেদ করিতে গিয়া আমরা একসূত্রে বদ্ধ হইতেছি, কি তখন একসূত্রে বদ্ধ ছিলাম? স্থির জানিও, জীবনের এক উদ্দেশ্য সুতরাং এক শিক্ষা ও এককার্য্য বা ব্যবসায় অনৈক্যেরই মূল। সকলেই কেরাণী, ডেপুটি, মুন্সেফ বা ডাক্তার হইতে পারিলেই একতা জন্মিবে না। আমাদের রাজনৈতিক একতা যে ঘটিতেছে না, তাহার কারণ জাতিভেদ-প্রথা নহে; তাহার কারণ অনেকগুলি, এ প্রবন্ধে তদালোচনা হইতে পারে না।

মানব চরিত্রের অন্তদর্শী হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন, বিভিন্ন মানুষের

বিভিন্ন প্রকৃতি। কেহ বা সত্ত্বগুণপ্রকৃতিক, কেহ রজোগুণপ্রকৃতিক, কেহ রজঃ ও তমোগুণ মিশ্রিত, কেহ কেবল মাত্র তমোগুণ প্রকৃতিক। যাঁহারা প্রথম গুণ সম্পন্ন তাঁহারা ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দ্বিতীয় গুণ সম্পন্ন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা তৃতীয় গুণ সম্পন্ন তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা চতুর্থ গুণ সম্পন্ন তাঁহারা শূদ্র। এই গুণ ভেদে—আন্তরিক শক্তিভেদে হিন্দুর জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইংরাজ জাতির যেরূপ ঐশ্বর্য্য ভেদে জাতিভেদ, যে যত ধনী, সে তত উচ্চ শ্রেণীর; হিন্দুদিগের জাতিভেদের আদর্শ সেরূপ নীচ প্রকারের নহে। গুণানুযায়ী যেমন জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সমীচীন প্রথা স্থায়ী করিবার জন্য, যাহাতে গুণগুলির উত্তরোত্তর স্ফুরণ হয়, তাহার বিধান হইল। নিম্ন শ্রেণীর সহিত বিবাহ ও আহার ব্যবহার দ্বারা সংমিশ্রণ করিয়া সেই স্ফুরণের ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়া বিবাহাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে; নিম্নশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা প্রযুক্ত নহে। যাঁহারা জাতিভেদের বিরোধী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, ইহাতে নিকৃষ্ট জাতি ত নিকৃষ্ট থাকিয়াই যাইবে, উৎকৃষ্টের সহবাসাভাবে তাহাদের আরও অবনতি হইবে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, শ্রেষ্ঠকে নিকৃষ্ট করিয়া শ্রেষ্ঠ হওয়া অপেক্ষা এবং তদ্দারা তাঁহার শ্রেষ্ঠতার ক্রমশঃ বিকাশে বাধা দিয়া শ্রেষ্ঠ না হইয়া শ্রেষ্ঠের দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠ হইলে, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট উভয়েই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন। হিন্দুসমাজে এতদিন তাহাই ঘটিতেছিল; ব্রাহ্মণই সকলের আদর্শ ছিলেন। সেই আদর্শ মত অন্য তিন শ্রেণী চলিতেছিলেন। তাহার ফল, স্বভাব চরিত্রে, আচার ব্যবহারে, ধর্ম্মাচরণে পৃথিবীর অন্য সকল জাতির নিম্নশ্রেণী অপেক্ষা হিন্দু জাতির নিম্নশ্রেণী আজিও এত উন্নত, এত শ্রেষ্ঠ। যদি বিজাতি বিধর্ম্মিগণ কর্তৃক ভারত অধিকৃত না হইত, তাহা হইলে এই জাতিভেদ-প্রথা কীদৃশ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইত, কে বলিতে পারে? তমোগুণ সম্পন্ন শূদ্রগণ অনুকরণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে যে উচ্চতরগুণ লাভ করিতেন, এবং ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া যে দেবচরিত্র প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিবেন, ইহাতে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যেক শ্রেণী এক অবস্থাতেই থাকিয়া অবস্থোন্নতি বা নিজ রুচিপ্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে

পারিত না। জিজ্ঞাসা করি, সমাজের প্রথমাবস্থায় কর্ম্মকার যে প্রকার লৌহের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিত, তন্তুবায় যেরূপ বস্ত্র বয়ন করিত, এবং অন্যান্য শিল্পিগণ যে প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত, সমাজের উন্নতির সহিত তাহার কি উৎকর্ষতা হয় নাই? এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সকলেই এতদিন যদি নিজ ব্যবসায়ে রত থাকিত, তাহা হইলে কি আরও নূতন নূতন যন্ত্র ও অভিনব শিল্প আবিষ্কৃত এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ের অনুপম শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত না? এখন কায়স্থ মুচির কাজ করিতে গিয়া, কর্ম্মকার সূত্রধরের কাজ শিখিতে গিয়া নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন না কি? তার পর রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্যান্তর গ্রহণের বিষয়। সত্য বটে, মৃত কৃষ্ণদাস পাল যদি স্বীয় ব্যবসায় লইয়া থাকিতেন তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটী দুর্লভ রাজনীতিজ্ঞে বঞ্চিত হইতেন; কিন্তু যখন জাতিভেদ প্রথার কঠোর শাসন ছিল, এই রুচিপ্রকৃতি অনুসারে তখনও এক আধটি কৃষ্ণদাস জন্মিতেন। শূদ্র একলব্যের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ইহার প্রমাণ। যখন জাতিভেদ-প্রথা উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সেই ত্রেতাযুগে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রামচন্দ্রের সহিত গুহক চণ্ডালের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। একলব্য বা গুহকচণ্ডালের জন্য জাতিভেদ উঠাইতে হয় নাই। সহস্র বা লক্ষ বৎসরে একটি একলব্য, গুহক চণ্ডাল বা কৃষ্ণদাস পালের জন্য অশেষ কল্যাণকর, মানবজাতির উত্তরোত্তর উন্নতির প্রধান সহকারী জাতিভেদপ্রথা উঠাইতে হইবে না। এ প্রথা থাকিলেও সেইরূপ মহাপুরুষের উদয়ের ব্যাঘাত ঘটিবে না। যাহার যেরূপ ধারণাশক্তি তাহার সেইরূপ শিক্ষা, সেই প্রকার জ্ঞানার্জ্জন বিধেয়। পুরাকালে তাহাই হইত; কেহই সম্পূর্ণ অজ্ঞান পশু ছিল না। হিন্দু রাজত্বের বিলোপের সহিত উপযুক্ত নেতার অভাবে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে বিধানকর্ত্তৃগণের দোষ কি? পক্ষান্তরে ইংরাজি শিক্ষার বলে জাতিভেদ শিথিল করিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কি নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার নহে? এণ্ট্রেন্স, এফ্‌ এ, বি এ, পাশ করিয়া সকলেই সমান হইয়াছে; এখন মুড়ি মিছরীর এক দর। মন্দটি যত সহজে ও শীঘ্র শিখিতে পারা যায়, ভালটি তদ্রূপ নহে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের যে পরিমাণে অবনতি হইয়াছে, শূদ্রের তাহার শতাংশও উন্নতি হয় নাই। এই যে বিবাহের পণ গ্রহণ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থের মধ্যে এই যে অর্থগৃধ্নতা ও পৈশা-

চিক আচার—ইহা কোথা হইতে আসিল? ব্রাহ্মণ কায়স্থের সেই সদাশয়তা পরার্থপরতা ও মহানুভাব ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে কেন? ইহা কি নিম্ন শ্রেণীর সংমিশ্রণে নহে? এখনও জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া যায় নাই, ইহাতেই এই ঘটিয়াছে; যদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্রে বিবাহ প্রচলিত হয় তাহাতে যে নৈতিক অবনতি ঘটিবে, সমাজময় যে উচ্ছৃঙ্খলতা আধিপত্য করিবে, তাহা কল্পনায় আনিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

এখন বিচার্য্য, জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুজাতির যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, হিন্দুসমাজ নানা প্রকারে যে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোন জ্ঞানী, সমাজতত্বজ্ঞ, পরিণামদর্শী ব্যক্তি এ প্রথার উন্মূলনের পক্ষপাতী হইবেন না। যাঁহারা বাস্তবিক দেশহিতৈষী তাঁহাদের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এ প্রথা যতই শিথিল হইতেছে, আমাদের মধ্যে ততই অনৈক্য, ততই বিবাদ বিসম্বাদ বাড়িতেছে, আমাদের হৃদয় ততই বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইতেছে, ঈর্ষ্যায় প্রাণ জর জর হইতেছে। আমাদের নৈতিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে; আমরা দিন্ দিন্ ঘোর অবনতির পথে ধাবিত হইতেছি। যে উদ্দেশ্যে আমরা এই পরম হিতকর প্রথা, হিন্দুসমাজের এই প্রধান গ্রন্থি শিথিল করিতে গিয়াছিলাম, তদ্বিপরীত ফলই ফলিয়াছে। নানা বর্ণের মধ্যে যে সহানুভূতি ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেশমাত্র ছিল না, সমাজে একটী সুন্দর প্রীতিভাব বিরাজ করিতেছিল, তাহার স্থলে ঘোর বিরাগ জন্মিয়াছে, বাহ্য সাম্যের অভ্যন্তরে ভয়ানক বৈষম্যের বিষ সঞ্চিত হইতেছে। সকলে এক চাকরী—কেরাণীগিরি ডেপুটিগিরি, মুন্সেফী প্রভৃতি অবলম্বন করিতে গিয়া এখন অনেকের চাকুরী মিলা ভার হইয়া উঠিয়াছে; গবর্ণমেণ্টও আর চাকুরী যোগাইতে পারেন না। তাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের কলরবে জ্বালাতন হইয়া Technical education প্রচলনে ব্যস্ত হইয়াছেন। এই Technical education এরই নামান্তর কর্ম্মকার, সূত্রধর, কৃষক প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা দেওয়া। সম্প্রতি শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইতেছে। আমাদের একূল ওকূল দুকূল গেল!

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

দ্রব্যগুণ বিচার।

কট্‌কী।

বাঙ্গালা নাম—কট্‌কী; হিন্দুস্থানী—কুট্‌কী; ইংরাজী—Picrorrhiza Kurroa. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কট্বী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটুম্ভরা। অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী। মৎস্যপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী॥

ইহা একপ্রকার ঝোপের মত লোমযুক্ত গুল্ম। কাশ্মীর, শিকিম ও অন্য উচ্চ পার্ব্বত্য স্থানে উৎপন্ন হয়; নিম্নবঙ্গে এ গাছ নাই। ইহার শিকড় একত্র বহুল পরিমাণে নামে। ঐ গুলি ধৌত ও খণ্ড খণ্ড হইবার পর বণিকের দোকানে বিক্রয়ার্থ থাকে; তখন উহা দেখিতে কতকটা পাখীর পায়ের মত হয়।

> কট্বী তু কুটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ।
> ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা।
> প্রমেহ শ্বাস কাসাস্র দাহ কুষ্ঠ ক্রিমি প্রণুৎ॥

রস—তিক্ত; বিপাক—কটু; বীর্য্য—শীত; গুণ—রুক্ষ, লঘু, দীপক, হৃদ্রোগে (কোষ্ঠবদ্ধ ও শোথযুক্ত হৃদ্রোগে) উপকারী, কফপিত্ত ও জ্বরনাশক। প্রমেহ (পিত্তজ) শান্তিকর, শ্বাস কাস দাহ ও ক্রিমিনাশক, কুষ্ঠঘ্ন (আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগে উৎকট চর্ম্মরোগনাশক); প্রভাব—মলভেদক।

প্রয়োগ—কট্‌কী প্রধানতঃ পিত্তঘ্ন ও রেচক। ইহা প্রবল জোলাপের কাজ করে। ইহার মাত্রা, কাথ করিতে হইলে।০ আনা হইতে ৷৷০ আনা পর্য্যন্ত, ক্বচিৎ কখন ৮০ আনা পর্য্যন্তও দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাঁহার ৮০ আনা সিদ্ধ করিয়া খাইয়াও দাস্ত না হয়, তাঁহার জন্য আর ইহার মাত্রা না বাড়াইয়া, ইহা ত্যাগপূর্ব্বক অন্য রেচক প্রয়োগ করা বা ইহার সহিত হরীতকী সোনামুখী প্রভৃতি রেচকান্তর সংযোগ করা উচিত। কিন্তু হরীতকী সোঁদাল প্রভৃতি নির্দ্দোষ মৃদু বস্তু ছাড়া অন্য বিরেচক (কট্‌কী সোনামুখী প্রভৃতি) প্রয়োগ করিতে হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মউরী প্রভৃতি কোনও বায়ুনাশক বস্তু থাকিবে ইহা যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে। চরক

বলিয়াছেন—"রেচনং পিত্তহারিণাম্" অর্থাৎ পিত্তনাশ করিতে হইলে বিরেচনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। আবার তিক্ত বস্তু স্বভাবতঃই পিত্তঘ্ন সুতরাং কট্‌কী উভয় কারণেই পিত্তনাশক। এই উভয় শক্তি থাকায় ইহা পিত্তঘ্ন গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ধনে ও মউরীর সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা পিত্তসংহারে বিশেষ শক্তিমান্ হয়।

জ্বররোগে পাচন দিতে হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা কট্‌কী ঘটিত পাচনই ভাল। বস্তুতঃ শাস্ত্রে জ্বররোগে (অতিসার অবর্ত্তমানে) যতগুলি পাচন আছে, প্রায় সকলগুলির মধ্যেই কটুকী দৃষ্ট হয়।

কয়েকটী মুষ্টিযোগ,—(১) কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও পটোলপত্র, মিলিত ২ তোলা, জল ।৷৹ সের, শেষ ৵৹ পোয়া, দু'তিনবারে সেব্য; ইহাতে অবিচ্ছেদ জীর্ণজ্বর শান্ত হয়। (২) কট্‌কী, পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুথা ও আকনাদি যথাবিধি ক্বাথ করিয়া পান করিলে বহুকালীন জীর্ণজ্বর প্রশান্ত হয়। (৩) কট্‌কী, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, রক্তচন্দন, মুথা—এই পাচন পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে উপকারী। (৪) কট্‌কী, সজ্‌নের শিকড়ের ছাল, পিপুল মূল, অনন্তমূল, শুঁঠ, রক্তচন্দন, নিমছাল, হরীতকী প্রত্যেক ।৹ আনা, জল অর্দ্ধসের, শেষ ৴৹ ছটাক; ইহাতে শোধিত হিং চূর্ণ ৩ রতি মিশাইয়া সেবন করিলে প্লীহযকৃৎ ঘটিত পুরাতন জ্বর নিশ্চিত ভাল হয়। (৫) কট্‌কীচূর্ণ ও ভাল গিরিমাটী চূর্ণ প্রত্যেক ১ মাষা, মধুসহ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর লেহন করিলে হিক্কা আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত, কাস, অম্লপিত্ত, চর্ম্মরোগ, ক্ষত, শোথ, হাত পা জ্বালা, যকৃদ্বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগের পাচনেও কট্‌কীর প্রয়োগ হয়।

ডাক্তার মুদন সরিফ বলেন—কট্‌কী অধিক পরিমাণে রেচক কিন্তু অল্প পরিমাণে (এক আনা আধ আনা) জলের সহিত খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি ও অম্লপিত্তের দমন হয়।

সার্জ্জন মেজর টম্‌সন্ বলেন,—ইহা জ্বরে ত উপকার করেই, আর ইহার তীব্র ক্বাথ দিনে ৩।৪ বার খাওয়াইলে মলমূত্রাকারে প্রচুর পরিমাণে জল বাহির হইয়া শোথ আরোগ্য হয়।

শোথের কটুকাদ্যলৌহ, পুরাতন জ্বরের সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও অমৃতারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধে কট্‌কী আবশ্যক হয়।

কট্‌ফল।

বাঙ্গালা নাম—কট্‌ফল বা কায়ছাল; হিন্দী—কায়ফর; ইংরাজী Myrica Sapida. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কট্‌ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাপি চ। শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ॥ সংস্কৃত নাম—কট্‌ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা, ভদ্রবতী।

ইহা এক প্রকার বড় বন্য গাছ; হিমালয়, মালয়, ব্রহ্মদেশ, খাসিয়া পাহাড় ও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে ইহা জন্মে। এই গাছের ছোট ছোট ফল হয়, তাহাকেই কট্‌ফল বলে; কিন্তু ঐ ফলের পরিবর্ত্তে, ছালই ব্যবহৃত হয় সুতরাং কোন ঔষধে কটফল উল্লিখিত থাকিলে অধিকাংশস্থলে ছালই বুঝিতে হয়।

কট্‌ফলস্তুবরস্তিক্তঃ কটু র্বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাস প্রমেহার্শঃ কাস কণ্ঠাময়ারুচীঃ॥

রস—তিক্ত কটু কষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—বাতশ্লেষ্ম, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস ও অরুচি নাশক। প্রভাব—কণ্ঠরোগ নাশক (ক্বাথ পানে ও কবল করণে)।

প্রয়োগ—জ্বরে, জ্বরের সহিত কাসে বা কাসের আনুষঙ্গিক জ্বরে প্রধানতঃ ইহার প্রয়োগ। এতদ্‌ঘটিত মুষ্টিযোগ—(১) কায়ফল, পিপুল, গুলঞ্চ, কুড়, কণ্টকারী—এই পাচন কাসযুক্ত জ্বরে উপকারী। (২) কায়ফল, সৈন্ধব, গোলমরিচ, নিমছাল ও হরীতকীর ক্বাথ করিয়া গরম গরম মুখ মধ্যে ধারণ করিলে গলার মধ্যস্থিত ফোলা ঘা ও ব্যথা আরোগ্য হয়। (৩) কায়ফল, লোধ, মুথা, হরীতকী প্রত্যেক ॥০ আনা, যথাবিধি ক্বাথ কর্ত্তব্য—ইহা পুরাতন মেহ (কুন্থনে স্রাব নির্গম) রোগে বিশেষ উপকারী (মফস্বলের কোনও প্রাচীন কবিরাজ এই পাচন ব্যবহার করেন)।

কায়ফল চূর্ণ দ্বারা উত্তম নস্য প্রস্তুত হয়, অথবা ইহার সহিত অন্যান্য মশলা দিয়াও নস্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কায়ফল, তামাকপাতা চূর্ণ, একাঙ্গীচূর্ণ একত্র মিশাইলে সুন্দর নস্য হয়—ইহা নাকে টানিলে ক্রূর শ্লেষ্মা, মাথাধরা প্রভৃতি ভাল হয়। ডাঃ আরভিং বলেন—ওলাউঠা রোগী হিমাঙ্গ হইতে থাকিলে কট্‌ফলচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ গায়ে মাখাইলে বিশেষ ফল দর্শায়।

শাস্ত্রোক্ত কট্‌ফলাদি পাচন যথা—কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনদ, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরতা, ামুনহাটী, হিং, বেড়েলা, দশমূল, পিপুল-মূল যথাবিধি কাথ করিয়া হিং ও আর্দ্রার রস মিশাইয়া সেবনীয়। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, কর্ণমূলশোথ, স্বরভঙ্গ, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস ও শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

কঠিনী।

বাঙ্গালা নাম—খড়ী, চা-খড়ী বা খড়ীমাটী; হিন্দী—খড়িয়া ও গৌরখড়ী; ইংরাজী—Chalk. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—খটিকা কঠিনী চাপি লেখনী চ নিগদ্যতে। সংস্কৃত নাম—খটিকা, খটী, কঠিনী, লেখনী। অন্য নাম—ধবলমৃত্তিকা, শ্বেত-ধাতু, বর্ণরেখা, পাণ্ডুমৃৎ।

খড়ী অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন—ইহা শুষ্ক মৃত্তিকাখণ্ডের মত, দেখিতে শাদা। হিন্দুর ছেলেকে জীবনের প্রত্যূষ কালেই খড়ী কি বস্তু তাহা জানিতে হয়; যেহেতু প্রথম অক্ষর পরিচয় কালে নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে কাষ্ঠফলকের উপরে লিখিত ক খ প্রভৃতি অক্ষরের উপরে খড়ী দ্বারা শিশুকে হাত বুলাইতে হয়। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সহর-স্থান সমুদয় হইতে ক্রমে এ প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। কোন কোন পাহাড়ে খড়ী থাকে; যেখানে থাকে, সেখানে উহা প্রকাণ্ড শ্বেতশৈলবৎ দৃষ্ট হয়। উহা দুই প্রকারের আছে—এক প্রকার কোমল ও অতি শুভ্র, আর এক প্রকার কঠিন ও অপেক্ষাকৃত কম শুভ্র। কোমল গুলিকে ফুলখড়ী বলে; এই গুলি দ্বারা স্কুল-কলেজে ও রেলওয়ে ষ্টেসনে বোর্ডের (কাষ্ঠফলকের) উপরে লেখা হইয়া থাকে। কঠিন গুলি চিত্রকরেরা রঙের জন্য ব্যবহার করে। উভয় খড়ীরই ঔষধীয় শক্তি আছে—ক্রমে বলা যাইতেছে।

খটিকা দাহজিচ্ছীতা মধুরা বিষ শোথজিৎ।
তদ্বৎ পাষাণখটিকা ব্রণপিত্তাস্রজিদ্ধিমা।
লেপাদেতদ্‌গুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা॥

রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—দাহনাশক, (বাহ্য প্রলেপে জ্বালা নিবারক, ভক্ষণে হৃৎকণ্ঠদাহ নাশক), শোথঘ্ন (প্রলেপে); প্রভাব—বিষনাশক (মক্ষিকাদি দংশনের)। পাষাণখড়ীরও এই সমস্ত গুণ আছে; অধিকন্তু ইহা রক্তপিত্তনাশক, (যেহেতু ইহাতে একটু লৌহের অংশ আছে, তজ্জন্যই কম শুভ্র), প্রলেপে ইহার গুণ ফুলখড়ীর ন্যায়। কিন্তু ভক্ষণে মৃত্তিকার তুল্য-গুণ। মৃত্তিকার গুণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

প্রয়োগ—অম্ল, অম্লশূল ও উদরাময়েই খড়ীর প্রধানতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা ধারক; ইহার ধারকগুণ কবিরাজ ডাক্তার উভয় সম্প্রদায়ের নিকটেই সুপরিচিত; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত শ্লোকে ইহার এই শক্তির কথা সুস্পষ্ট লিখিত নাই—না থাকিলেও একটু চিন্তা দ্বারাই উহা এইরূপে বুঝিয়া লওয়া যায়, যথা—"দাহজিৎ" অর্থাৎ দাহনাশক হইলেই পিত্তনাশক হইতে হইবে। পিত্তের গুণ স্রবণ বা নিঃসরণ। কোনও বস্তু এই শক্তির বিরোধী হইলেই উহা অবশ্য ধারক বা সংকোচক, হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা "শোথজিৎ"। শোষক বস্তুই শোথনাশক হয়, আবার শোষক বস্তুমাত্রই ধারক হইয়া থাকে। যেমন ফট্‌কিরি শোথহর ও ধারক, আফিং শোথহর ও ধারক ইত্যাদি।

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে "ধারক" বিশেষণ না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদকারগণ ইহার এই শক্তি জানিতেন ও তদনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। শাস্ত্রোক্ত "কঠিন্যাদি পেয়া"র উপকরণ এই—ফুলখড়ী ৮ তোলা, মিছরি ৪ তোলা, গঁদ ৪ তোলা, মৌরী ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য ঈষৎ কুট্টিত করিয়া রাত্রিতে কোনও মৃৎপাত্রে ১ সের জলে ভিজাইয়া রাখিবে, প্রাতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই জল কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া তাহার উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ পান করিতে হয়। ইহা অজীর্ণ, গ্রহণী ও আমাশয় রোগে উপকারী।

ফুলখড়ী চূর্ণ ও মউরী চূর্ণ সমভাগে ৴৹ বা ৶৹ আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে অজীর্ণ বা অম্লজনিত শূলরোগ নিবারিত হয়। ফুলখড়ী, চূণের জল, কড়ী ভস্ম, শামুক ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম, ইহারা পরস্পর প্রায় সমগুণ। কবিরাজগণ অপেক্ষা ডাক্তার মহাশয়েরাই খড়ী ঘটিত ঔষধ অধিক ব্যবহার

করিয়া থাকেন। যেহেতু, কবিরাজেরা খড়ী অপেক্ষা কড়ী ভস্ম বা শঙ্খ ভস্মকেই অধিক গুণশালী দেখিতে পান্। খটিকামিশ্র (Chalk Compound) ডাক্তারদের উদরাময়ের একটা প্রধান ঔষধ। উহার উপকরণ ফুলখড়ী ১১, লবঙ্গ ১॥০, জায়ফল ৩, ক্যাক্রাণ ৩, দারুচিনি ৪, ছোট এলাচ ১ ও চিনি ২৫ ভাগ।

খড়ী বা খড়ী ঘটিত ঔষধ একাদিক্রমে বহুদিন সেবন করা উচিত নয়, যেহেতু তদ্দারা অন্ত্রে উহার কিয়দংশ সঞ্চিত হইতে পারে। যাঁহাদের শূলের জন্য খড়ী ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহারা যেন মধ্যে মধ্যে একটি বিরেচন ঔষধ সেবন করেন, তাহা হইলে ঐ দোষের প্রতীকার হইবেক।

কণ্টকারী।

বাঙ্গালা নাম—কণ্টকারী; হিন্দী—কংটেলি, রিংগিণী বা ভটকটৈয়া; ইংরাজী—Solanum Tanthocarpum; সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা। কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা॥ (শ্বেত কণ্টকারীর) শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা ক্ষেত্রদূতিকা। গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী॥ সংস্কৃত নাম—কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী। ইহার অন্য নাম—প্রচোদনী, রাষ্ট্রীকা, অনাক্রান্তা, ভণ্টাকী, সিংহী, বহুকণ্টা, চিত্রফলা।

ইহা এক প্রকার কণ্টকময় গুল্ম, ভূমির উপরে বিস্তৃত হইয়া জন্মে। ইহার ফুল অনেকটা বেগুনের ফুলের মত; ক্ষুদ্র গোলাকার ফল হয়, তাহার গায়ে শাদা চক্র চক্র চিহ্ন থাকে। পতিত জমিতে, বালুকাময় ময়দানে ও নদীর তীরে সচরাচর ইহা দৃষ্ট হয়। ইহা দুই প্রকার আছে; এক প্রকার বেগুনে ফুল ও এক প্রকার শাদা ফুল হয়; দ্বিতীয় প্রকারকে শ্বেত কণ্টকারী বলে। শ্বেত কণ্টকারী বড় দুর্ল্লভ, ইহার সংস্কৃত নাম—শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী।

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাস জ্বর কফানিলান্।
নিহন্তি পীনসং পার্শ্বপীড়া ক্রিমি হৃদাময়ান্॥

তয়োঃ ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ।
শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু।
হন্যাৎ কফমরুৎ কণ্ডূ কাস শ্বাস ভেদ ক্রিমি জ্বরান্॥
তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী॥

রস—কটুতিক্ত; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—রুক্ষ; দীপক ও পাচক, লঘু, কাস শ্বাস জ্বর বাতশ্লেষ্মা পীনস পার্শ্ববেদনা ক্রিমি ও হৃদ্রোগ (কাস জনিত) প্রশমিত কারক। প্রভাব—সারক। উভয়েরই ফল—কটুরস ও কটুবিপাক, শুক্ররেচক (ইহার ফল সেবনে পুরুষের শুক্র শীঘ্র স্খলিত হয় ও স্ত্রীলোকের রজঃ নিঃসারিত হয়), মলভেদক, তিক্ত, পিত্ত ও অগ্নিকর এবং লঘু। ইহা বাতশ্লেষ্মা কণ্ডূ কাস শ্বাস ক্রিমি ও জ্বর নাশ করে। সাধারণ কণ্টকারীর সমস্ত গুণ শ্বেত কণ্টকারীতে আছে, অধিকন্তু ইহা গর্ভপ্রদ ও বন্ধ্যাদোষনাশক।

প্রয়োগ—কণ্টকারীর প্রধান ব্যবহার শ্বাস কাস ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে। ইহা কফনিঃসারক; সুতরাং যে স্থানে রোগীর অধিক শ্লেষ্মা উঠে, সে স্থলে ইহা না দিয়া,শুষ্ককাস ও শ্বাসের শ্লেষ্মস্রাবহীন আক্ষেপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কণ্টকারীর রস "তিক্ত কটু" লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার তিক্ততা অতি অল্প, মুখে দিলে অতি সামান্য অনুভূত হয়; তথাপি শাস্ত্রে ইহা পঞ্চতিক্তগণের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। পঞ্চতিক্ত কষায় যথা—ক্ষুদ্রামৃতাভ্যাং সহনাগরেণ সপৌষ্করৈশ্চৈব কিরাততিক্তং। পিবেৎ কষায়স্ত্বিহ পঞ্চতিক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং সমগ্রম্॥ অর্থাৎ কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ (অধিকন্তু শুঁঠও এ স্থলে তিক্তগণ মধ্যে) পুষ্কর মূল এবং চিরতা এই পাঁচটী দ্রব্যকে পঞ্চতিক্ত বলে। এই পঞ্চতিক্তের কাথ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হয়।

শাস্ত্রে কুষ্ঠরোগাধিকারে যে "পঞ্চতিক্ত ঘৃত" আছে, তন্মধ্যেও কণ্টকারী গৃহীত হইয়াছে; যথা—নিম্বং পটোলং ব্যাঘ্রীঞ্চ গুড়ূচীং বাসকং তথা......... ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন ত্রিফলাগর্ভ সংযুতম্। পঞ্চতিক্ত মিদং খ্যাতং সর্পিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্" অর্থাৎ নিম, পলতা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক যথাপরিমাণে, ত্রিফলাযোগে ৪ সের ঘৃত সহ পাক করিবে। এই ঘৃতের নাম পঞ্চতিক্ত ঘৃত। ইহা কুষ্ঠনাশক।

ইহার একটী বিশেষণ আছে "সরা" অর্থাৎ মল নিঃসারক। তাই বলিয়া ইহা হরীতকী বা সোঁদাল-আঠার মত প্রবল রেচক নহে; বায়ুকে অধঃ করিয়া, বদ্ধ মলের নিঃসারিত হইবার প্রবণতা দেয় মাত্র। অন্যান্য সারক উপকরণের সহিত মিলিত না হইলে ইহার উক্ত শক্তি অধিক প্রকাশিত হয় না। "সরা" শব্দ দ্বারা প্রধানতঃ ইহার মূত্র নিঃসারণ শক্তিই বুঝিতে হইবে।

ইহা "অগ্নিদীপক ও পাচক"; তাই বলিয়া যমানী মউরী প্রভৃতির মত পাচক ঔষধের উপকরণ মধ্যে গৃহীত হয় না। মর্ম্ম এই যে, জ্বর কাস আমবাত প্রভৃতি রোগে, আম দোষ নিবারণ করিয়া অগ্নির তীক্ষ্ণতা পুনরানয়ন করিতে ইহার শক্তি আছে।

ইহা জ্বররোগের পাচনে (বিশেষতঃ উহা বাতশ্লেষ্ম ঘটিত হইলে) প্রায় সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। কাস রোগে ইহার প্রয়োগ অপরিহার্য্যই বটে। কাসযুক্ত জ্বরের উৎকৃষ্ট পাচন—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, কুড়, পিপুল, কট্‌কী, বামনহাটী, শুঁঠ, যষ্টিমধু যথাবিধি কাথ করিয়া সেব্য।

শ্বাসকাসঘ্ন পাচন—কণ্টকারী, দুরালভা, তুলসীমঞ্জরী, বড় এলাচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শ্বেত আকন্দের ছাল, যথাবিধি কাথ করিয়া সেবন করিলে উৎকাসি, শুষ্ককাস ও শ্বাস আরোগ্য হয়। দাস্ত না হইলে ইহাতে বহেড়া যোগ দিবে।

ক্ষুদ্রাদিকষায়—ক্ষুদ্রামৃতা নাগর পুষ্করাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কফ মারুতোত্তরে। সশ্বাস কাসারুচি পার্শ্বরুক্করে জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবে চ শস্যতে॥ কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) এই সকলের কাথকে ক্ষুদ্রাদি কষায় বলে; ইহাতে বাতশ্লেষ্ম জ্বর এবং শ্বাস কাস অরুচি ও পার্শ্ববেদনা-যুক্ত সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়।

ব্যাঘ্র্যাদি কষায়—ব্যাঘ্রীচৈব সিংহীচৈব লোধ্রং কুষ্ঠপটোলকম্। জ্বরে কফাত্মকেচৈতৎ পাচনং স্যাৎ তদুত্তমম্॥ কণ্টকারী, বৃহতী, লোধ, কুড়, পটোলপত্র এই সকলের যথাবিধি কৃত কাথ শ্লেষ্মজ্বরে উপকারী। প্রসিদ্ধ স্বল্প পঞ্চমূলের মধ্যে কণ্টকারীও একটী উপকরণ; স্বল্প পঞ্চমূল যথা—শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্। অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহা বাতপিত্ত জনিত সমস্ত রোগের প্রতিকারক।

কণ্টকারী বাতরোগে (Rheumatism) বড় উপকারী। এতদ্ঘটিত বাত-রোগের পাচন যথা—কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, শুঁঠ, গুলঞ্চ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৵০ পোয়া; দুইবারে সেব্য—ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। দাস্ত না হইলে জঙ্গীহরীতকী চূর্ণ মিশাইবে।

কণ্টকারী, কেঁউ ও সুজিনার মূল এবং উই মৃত্তিকা একত্রে গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতের ফোলা ও ব্যথা নিবারিত হয়।

শোথ রোগের সিংহাস্যাদি পাচন যথা—সিংহাস্যামৃত ভণ্টাকী কাথং কৃত্বা সমাক্ষিকম্। পীত্বা শোথং জয়েদ্ জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্॥ কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বাসক ছাল, ইহাদের যথাবিধি ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে শোথ রোগ এবং তৎসহ শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি আরোগ্য হয়।

শুটীকৃত কণ্টকারীর ফলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূরিয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া ঐ লবণ বাহির করিয়া লইবে—এই লবণ ৵০ আনা মাত্রায়, শীতল জলে গুলিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি ও কফ তরল হইয়া উঠে এবং পেট গরম হইয়া উৎকাশি হইলে বা কাসিতে কাসিতে বমি হইলে তাহা নিবারিত হয়।

ডাঃ উইল্‌সন বলেন—কণ্টকারী, তিক্ত বলকারক (bitter tonic) ও উদরের বায়ু নাশক। পদতলে প্রদাহ ও জলযুক্ত ফুস্‌কুড়ী হইলে ইহার প্রলেপ উপকারী এবং দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইলে কণ্টকারী সিদ্ধ জলের উত্তপ্ত বাষ্প লাগাইলে উহার উপশম হয়।

ডাঃ মোরহেড বলেন—ইহার আর যে যে গুণই বলা হউক, ইহার কফ-নিঃসারক শক্তিই প্রধান।

শোথ রোগের "পুনর্ণবাদি চূর্ণ," কাসের "কণ্টকারী ঘৃত" ও "ব্যাঘ্রী-হরীতকী"তে, শ্বাসের "শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণে" "শৃঙ্গীগুড় ঘৃতে" ও "ভার্গীশর্করা"য় এবং "বিষ্ণু তৈলে" "মহা নারায়ণাদি তৈলে" ও প্লীহার "অভয়া লবণে" কণ্টকারী আবশ্যক হয়।

কদম্ব।

বাঙ্গালা নাম—কদম; হিন্দী—কদম; ইংরাজী—Nauclea Parviflora. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ। সংস্কৃত নাম—

কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প ও হরিপ্রিয়। অপর নাম—ললনাপ্রিয়, হারিদ্র, অশোকারি, কাদম্ব, ষট্‌পদেষ্ট, জাগ্য, কাদম্বর্য্য, সীধুপুষ্প, জীর্ণপর্ণ, মহাঢ্য, কর্ণপূরক।

কদম্বের গাছ খুব বড় বড় হয়, ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের মধ্য ও অগ্র হইতে ডাল পালা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং ঐ ডালে বড় বড় পাতা থাকায় নীচে বেশী ছায়া পড়ে। ইহার ফুল ভাঁটার মত গোলাকার ও সর্ব্বাঙ্গে গোড়া-হলুদ আগা-শাদা সরল এক ইঞ্চি প্রমাণ সূত্রবৎ বেষ্টিত থাকে। ফল পাকিলে ঐ গুলি ঝরিয়া যায়। ফুলগুলি দেখিতে অতীব মনোরম ও সুখস্পর্শ; তাহাতে অত্যন্ত মৃদুসৌরভ আছে। বর্ষাকালে এই ফুল বৃক্ষের মস্তক আকীর্ণ করিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে। কথিত আছে, এই বৃক্ষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ও ইহার তলদেশ তাঁহার কেলি-নিকেতন ছিল।

কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ।
সরো বিষ্টম্ভকৃদ্ রুক্ষঃ কফস্তন্যানিলপ্রদঃ॥

রস—মধুর অম্ল কষায়; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক, কফকর; প্রভাব—স্তন্যবর্দ্ধক (ইহার ফলের রস সেবনে স্ত্রীলোকের স্তনের দুধ বাড়ে) ও বায়ুবর্দ্ধক।

মতান্তরে কদম্বের গুণ।

কদম্বঃ কটুকস্তিক্তো মধুর স্তুবরঃ পটুঃ।
শুক্রবৃদ্ধিকরঃ শীতো গুরু বিষ্টম্ভকারকঃ॥
রুক্ষঃ স্তন্যপ্রদো গ্রাহী বর্ণকৃদ্ যোনিদোষহা।
রক্ত রুজ্ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ বাতপিত্তং কফং ব্রণম্।
দাহং বিষং নাশয়তি হন্তুরা শ্চাস্তুবরাঃ।
শীতবীর্য্যা দীপকাশ্চ লঘবোঽরোচকাপহাঃ॥
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নাঃ ফলং রুচ্যং গুরু স্মৃতম্।
উষ্ণবীর্য্যং কফকরং তৎ পক্বং কফপিত্তজিৎ॥
বাতনাশকরং প্রোক্ত মৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

কদম্ব—মধুর, তিক্ত, কষায়, কটু ও লবণরস। ইহা শুক্রবৃদ্ধিকারক

(ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ দুগ্ধ সহ সেবনে শুক্র গাঢ় হয়।), শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভকর, রুক্ষ, স্তন্যবর্দ্ধক, ধারক, বর্ণকর (কদম ফুলের পাপড়ী দুধের সর সহ বাটিয়া মুখে মাখিলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়), যোনিদোষহারক (ছালের ক্বাথে যোনি ধৌত করিলে তত্রত্য রোগ আরোগ্য হয়), রক্তরোগ (রক্তপিত্ত), মূত্রকৃচ্ছ্র (কচি পাতার রস মূত্রকৃচ্ছ্রের উপকারী), বাতপিত্ত, কফ, ব্রণ (প্রলেপে), দাহ ও বিষ প্রশমিত করে। ইহার অঙ্কুর—কষায়রস-প্রধান এবং শীতবীর্য্য, লঘু, অরুচি নাশক, রক্তপিত্ত ও অতিসার নিবারক। ফল—রুচিকর, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, কফকর। পাকা ফল—কফপিত্তঘ্ন এবং বাতনাশক বলিয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

প্রয়োগ—ঔষধার্থে কদমের ছালের ও পাতার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ফলের রস অনেকাংশে কাঁচা আমলকীর রসের তুল্যগুণ; কিন্তু তদপেক্ষা ঈষৎ গুরুপাকি। এই ফলের উত্তম অম্ল রাঁধিয়া খাওয়া যায়—বঙ্গের অনেক অঞ্চলে ইহার এইরূপ ব্যবহার আছে। কচিপাতার রস পরিষ্কার চিনি সহ সেবন করিলে বিষাক্ত মেহের প্রথমাবস্থায় বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়। ছালের ক্বাথ মেহ ও শ্বেতপ্রদরে উপকার দর্শায়। জ্বরে বা অন্য উত্তাপ জনক কারণে মাথা ধরিলে, কপালে কদম পাতা বাঁধিয়া রাখিলে উপশম পাওয়া যায়। কদমের শিকড়ের ছাল ২ তোলা সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ সেবন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হয়, শিশুকে অর্দ্ধতোলার ক্বাথ দিবে। কচিপাতার রসে সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া খাইলেও ক্রিমিরোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ কানাইলাল রায় বাহাদুর বলিয়াছেন যে, ইহার ছাল জ্বরঘ্নরূপে ব্যবহার করিয়াও বেশ ফল পাওয়া যায় ও মুখের ঘায়ে ইহার কুলী উপকারী। মেহ রোগে সোমেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধে কদম্ব মূলের ছাল আবশ্যক হয়।

কদম্বের ফল হইতে আয়ুর্ব্বেদমতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, তজ্জন্যই মদ্যের একটী নাম কাদম্বরী।

কদলী।

বাঙ্গালা নাম—কলা; হিন্দী—কেলা বা কেরা; ডাক্তারী নাম—Plantain, Musa sopientum. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কদলী সুফলা রম্ভা মোচা

বারণবল্লভা। সুকুমারা চর্ম্মম্বতী ত্বকপত্রী নগরৌষধি॥ সংস্কৃত নাম—কদলী, সুফলা, রম্ভা, মোচা, বারণবল্লভা, সুকুমারা, চর্ম্মম্বতী, ত্বকপত্রী, নগরৌষধি। ইহার অন্যনাম—অংশুমৎফলা, কাষ্ঠীলা, কদল, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, হস্তিবিষাণী, গুচ্ছদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, মোচক, রোচক, আয়তচ্ছদা, তন্তুবিগ্রহা, অম্বুসারা।

কলার গাছ অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, যেহেতু ইহা বাড়ীর উঠান-ধারে জন্মে, বাগানেও জন্মে—অন্ততঃ পূজাপার্ব্বণেও মাঙ্গলিক উপাদান স্বরূপ গৃহস্থের বাড়িতে আনীত হইয়া থাকে। ইহা ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, আমেরিকা প্রভৃতি মধ্যম-তাপযুক্ত স্থান সমূহে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই গাছ হস্তীর অতি প্রিয় খাদ্য, তাই ইহার সংস্কৃত নাম "বারণবল্লভা"; চর্ম্মের ন্যায় বিস্তৃত পাতা বলিয়া ইহার নাম "ত্বকপত্রী"; সূর্য্যের আলোক ভিন্ন আদৌ জন্মিতে পারে না বলিয়া নাম "অংশুমৎফলা"; ফল দেখিতে অনেকটা হস্তীর দন্তের মত বলিয়া ইহাকে "হস্তিবিষাণী" বলা হয়; একবার মাত্র ফল হইয়াই গাছ মরিয়া যায় বলিয়া নাম "সকৃৎফলা"; গাছের সার নাই তজ্জন্য নাম "নিঃসারা"; রাজগণের অতি প্রিয় বলিয়া নাম "রাজেষ্টা"; বালকেরাও ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া "বালকপ্রিয়া"; মানুষের পা স্থির ও সোজা হইয়া থাকিলে যেমন দেখিতে হয় তেমনি বলিয়া নাম "উরুস্তম্ভা"; বনে অন্যান্য বৃক্ষসমূহের মধ্যে কদলী শ্রেণী থাকিলে বড়ই শোভা হয় বলিয়া নাম "বনলক্ষ্মী"; পত্র খড় বড় বলিয়া "আয়তচ্ছদা"; ইহার অঙ্গ মধ্যে তন্তু সমূহ থাকে এজন্য "তন্তুবিগ্রহা" বলিয়া অভিহিত হয় এবং গাছের ভিতরে কেবল জলই সর্ব্বস্ব বলিয়া নাম "অম্বুসারা"। ভারতবর্ষই কলার প্রধান জন্মস্থান, তবে পার্ব্বত্যস্থানে ভাল জন্মে না। হিমালয় পাহাড়ের শৈলপুঞ্জোপরি এক প্রকার ছোট ছোট কলা হয়, তাহাতে বীজই অধিক, শাঁস খুব কম কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাই পক্ষীরা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে দিগ্ দিগন্ত হইতে আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাসহ খাইয়া জীবন রক্ষা করে। পূর্ব্ববঙ্গে ও মালাবার উপকূলে ইহার অধিক আবাদ হয়। চট্টগ্রামের বনপ্রদেশে এত কলাগাছ আছে যে, দেখিলে চমৎকার লাগে, তথাচ হাতী ও গয়াল নামক মহিষজাতীয় প্রাণী উহাই খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। চট্টগ্রামের গ্রামসমূহেও কলাগাছ ঘাস

দূর্ব্বার মত অপর্য্যাপ্ত। মাঠ পড়িয়া থাকিলে এত কলাগাছ জন্মে যে, আবাদ-কালে তাহা মারিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়।' সিঙ্গাপুর, মালয় ও ভারত-বর্ষের দ্বীপপুঞ্জে ইহা বহুলপরিমাণে জন্মে। সেখানে প্রায় ৮০ প্রকারের কলা আছে। চীন দেশে এক প্রকার কলাগাছ আছে, তাহার আদৌ ফল হয় না। আর এক প্রকার আছে দেখিতে ডুমুরের মত। স্পেনদেশের দাক্ষিণাংশে কলা হয়, অন্যাংশে তাপগৃহ (hot bed) ব্যতীত জন্মে না। আফ্রিকাতেও কলা হয়। কিন্তু বিলাতে ভাল কলা জন্মে না। রেঙ্গুনে প্রত্যেক বাটিতেই কলাগাছ আছে।

মোচাফলং স্বাদু শীতং বিষ্টম্ভি কফনুদ্ গুরু।
স্নিগ্ধং পিত্তাস্র তৃড় দাহ ক্ষত ক্ষয় সমীরজিৎ॥
পক্কং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃংষ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ক্ষুৎতৃষ্ণা নেত্রগদহৃন্ মেহঘ্নং রুচি মাংসকৃৎ। ভাঃ প্রকাশ।

(সিদ্ধ কাঁচা কলার) রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—সংকোচক ও ঈষৎ উদরভার জনক; কফনাশক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তঘ্ন, দাহতৃষ্ণানাশক, ক্ষতক্ষয় (ফুসফুসে ক্ষত জনিত যক্ষ্মা) নাশক ও বায়ু প্রশমক।

(পাকা কলার) রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—শীতল, শুক্র ও রতিশক্তি বর্দ্ধক, দেহের স্থূলতাকারক, ক্ষুৎতৃষ্ণানাশক (ক্ষুধাতৃষ্ণাকালে ভাল পাকা কলা পাইলে আর কিছু আবশ্যক হয় না), নেত্র-রোগহর (বায়ুজনিত দৃষ্টিক্ষীণতা দূর করে), মেহনাশক (জ্বালাযুক্ত মেহ ও বহুমূত্র নিবারক), রুচিকর ও মাংসবৃদ্ধিকর।

রাজ বল্লভ মতে।

কদলং মধুরং বৃষ্যং কষায়ং নাতিশীতলম্।
রক্তপিত্তহরং হৃদ্যং রুচ্যং শ্লেষ্মকরং গুরু॥

কলা—মধুর, কষায়, বৃষ্য, নাতিশীতল, রক্তপিত্তহর, হৃদ্য, রুচিকর, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক ও গুরুপাক।

মতান্তরে কদলীর গুণ।

কদলী শীতলা গুর্ব্বী বৃষ্যা স্নিগ্ধা মধুঃ স্মৃতা।
পিত্তরক্তবিকারঞ্চ যোনিদোষং তথাশ্মরীং॥
দীপ্তাগ্নেঃ বীর্য্যকৃৎ সদ্যঃ ন মন্দাগ্নেঃ হিতা হি সা॥

কদলী—শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, মধুর, পিত্তরক্ত ঘটিত বিকার সমূহের প্রশমক, যোনিদোষহর (শ্বেতপ্রদরাদি) ও অশ্মরী (পাথুরী) নাশক। ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির সদ্য বীর্য্যকারক, কিন্তু অগ্নিতেজোহীন ব্যক্তির উপকারী হয় না।

কোমলকদলীর গুণ।

কোমলং কদলং শীতং মধুরং চ কষায়কং।
রুচ্যং অম্লং সমুদ্দিষ্টং বাতপিত্তহরঞ্চ তৎ॥

কলা অত্যন্ত পক্কাবস্থায় কোমল হইলে মধুর, অম্ল, অতাল্প কষায় এবং অধিক রুচিকর ও বাতপিত্ত নাশক হয়।

মধ্যমকদলীর গুণ।

তৃড়্ রক্তপিত্তাদিগদ প্রমেহান্ ফলং কদল্যা স্তরুণং নিহন্তি।
সংগ্রাহিকং তিক্তকষায় রুক্ষং রক্তাতিসারং শময়েৎ চ ভারং॥

মধ্যম-পক (ডাঁসা) কলা—রক্তপিত্ত ও মেহ (স্রাবশীল মেহ) নাশ করে; ইহা সংকোচক, তিক্ত কষায় ও রুক্ষ, অধিক ভার ও রক্তাতিসার প্রশমক (ঘোলের সঙ্গে চট্‌কাইয়া দিলে)।

কদলীপুষ্পের গুণ।

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয় প্রণুৎ॥

কলার ফুল—স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, ঈষৎ গুরুপাক, বাতপিত্তহর, শীতল, রক্তপিত্ত ও ক্ষয় নাশক।

মোচার গুণ।

কদলী-মোচকং হৃদ্যং কফঘ্নং ক্রিমিনাশনং।
তৃষ্ণা প্লীহ জ্বরং হন্তি দীপনং বস্তিশোধনম্॥ রাজবল্লভ।

কলার মোচা—হৃদ্য, কফঘ্ন, ক্রিমিনাশক, তৃষ্ণানিবারক, প্লীহা ও জ্বররোগীর উপকারী, দীপন ও বস্তি শোধক (মূত্রকৃচ্ছ্র, কষ্টরজঃ প্রভৃতি নাশক)।

কদলীকন্দের গুণ।

বল্যঃ কদল্যাঃ কন্দঃ স্যাৎ কফপিত্তহরো গুরুঃ
বাতলো রক্তশমনঃ কষায়ো রুক্ষশীতলঃ।
কর্ণশূল রজোদোষং মোমরোগং নিযচ্ছতি ॥

কলার কন্দ অর্থাৎ যে ডাঁটার চারিদিকে কলা বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহা (কচি অবস্থায়) বলকর, কফপিত্তনাশক, গুরুপাক, ঈষৎ বায়ুবর্দ্ধক, রক্ত রোধক, কষায়, রুক্ষ, শীতল, কর্ণশূল, রজোদোষ বিশেষতঃ বহুমূত্র প্রশমিত করে।

কদলীর ভেদ।

মাণিক্য মর্ত্ত্যা * মৃত চম্পকাদ্যা ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।
উক্তা গুণা স্তেষধিকা ভবন্তি নির্দ্দোষতা স্যাৎ লঘুতা চ তেষাম্ ॥

মাণিক্য, মর্ত্ত্যমান, অমৃত প্রভৃতি কদলীর বহুপ্রকার ভেদ আছে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই মধ্যে উক্তগুণ সমুদায় বহুলপরিমাণে বর্ত্তমান এবং তাহারা নির্দ্দোষ ও লঘুপাক। দেশ বিদেশে সর্ব্বশুদ্ধ কতপ্রকার কলা আছে তাহার বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করা কঠিন; তবে মোটা মুটি যতগুলি প্রধানতঃ জানা যায়, তাহার নাম ও বর্ণনা দেওয়া হইল :—

মাণিক্য—এক প্রকার অতি উজ্জ্বলবর্ণ সুমিষ্ট কলা, বোম্বায়ে জন্মে।

মর্ত্ত্যমান—সুশ্রী, পীতাভ, সুগোল, গায়ে ফোটা ফোটা হয়, অতীব সুস্বাদু, বাঙ্গালীরা এই কলাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, দুগ্ধসহ বড়ই উপাদেয় হয়। ইহাকে চাটিমকলাও বলে।

অমৃত—অতীব মিষ্ট, বোম্বায়ে উৎপন্ন হয়।

চম্পক (চাঁপা)—ঘোর পীতবর্ণ, খুব পাকিলে ঈষৎ অম্ল, দেখিতে ছোট, বেশ সুগন্ধি।

---

* এই শ্লোকে "মাণিক্য মর্ত্ত্যামৃত" স্থানে কেহ কেহ "মাণিক্যমুক্তামৃত" পাঠ করিয়া বলেন—মর্ত্ত্য অর্থাৎ মর্ত্ত্যমান কলা আমাদের দেশের নয়, উহা মার্টাবান হইতে আসিয়াছিল। এ কথা আমাদের সঙ্গত বোধ হয় না, যেহেতু মুক্তা নামে কোনও কলা দৃষ্ট হয় না, মর্ত্ত্যমান শব্দও বহুকাল হইতে শাস্ত্রে রহিয়াছে।

ঢাকাই মর্ত্ত্যমান—দেখিতে প্রায় সবুজ, তত সুশ্রী নয়, কিন্তু খাইতে ভাল।

কালিবৌ বা কাবুলী কলা—ফল অত্যন্ত খাট ও মোটা, গাছও খুব মোটা অথচ খর্ব্বাকৃতি, কাঁদি নামিলে মাটী খুঁড়িয়া দিতে হয়। এই কলা গরম দুধে ফেলিলে গলিয়া যায়, খাইতে মিষ্ট।

কাঁঠালী—পাকিলে ঈষৎ পীত হয়, মর্ত্ত্যমান অপেক্ষা কম স্বাদু, চটকাইলে আঠা আঠা হয়। ইহা পূজাপার্ব্বণে অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গে কদমা বলে।

লতা কাঁঠালী—ইহাও এক প্রকার কাঁঠালী; পূর্ব্বোক্ত কাঁঠালী অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু।

মালভোগ—সুমিষ্ট ও সু-তার, মর্ত্ত্যমানেরই প্রকার-ভেদ।

চিনি চাঁপা—এক প্রকার চাঁপা কলা, পূর্ব্বোক্ত চাঁপা অপেক্ষা অধিক মধুর ও সু-তার।

ঠোটে কলা—ছোট ছোট কলা, ঘোর সবুজ বর্ণ, পাকিলে অধিক সুমিষ্ট হয় না, কাঁচা অবস্থায় অত্যন্ত কষায়, তজ্জন্য উদরাময় রোগীর সুপথ্য।

কাঁচ কলা—ইহা কেবল কাঁচা অবস্থায় ভুক্ত হয়, অতি উৎকৃষ্ট ও একটী প্রধান তরকারী।

ডোগ্রে কলা—কলিকাতার নিকটে জন্মে, পাকিলে এত বীজ হয় যে খাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার মোচা সুস্বাদু, মোচার জন্যই চাষ করা হয়।

সোনা কলা—দেখিতে ঠিক কাঁচা সোণার রং, মর্ত্ত্যমানের জাতীয়, বোম্বায়ে জন্মে।

বীচাকলা—প্রথমে কাঁচকলার মত দেখিতে, পাকিলে লালের আভা-যুক্ত হলুদ রং হয়, বীচিতে পরিপূর্ণ, বীচি বাছিয়া খাইলে শাঁস অতীব সুমিষ্ট, পাড়াগাঁয়ে স্ত্রীলোকেরা ইহা বড় ভালবাসে।

অগ্নীশ্বর—লাল রং, ওজনে প্রায় ৩ ছটাক, গরম ভাতে ডুবাইলে ঘৃতের মত গলিয়া যায়, ইহা অত্যন্ত সুস্বাদু।

ঘিএ—ইহাও অগ্নীশ্বরের তুল্য-গুণ ও তুল্য-স্বাদ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটু ছোট।

অণুপাম—মর্ত্তমান কলার জাতীয়, খাইতে বেশ সুস্বাদু।

বত্রিশছড়ী—বাঁকুড়া জেলায় জন্মে, এক কাঁদিতে ঠিক বত্রিশ ছড়া কলা জন্মে, চাঁপা কলার জাতীয়।

শিঙ্গাপুরী—শিঙ্গাপুর হইতে আসে, বড় বড় কলা হয়, পাকিলেও দেখিতে সবুজ, কিন্তু ভিতরে মোলায়েম ও সুস্বাদু।

কানাই বাঁশী—প্রায় এক হাত লম্বা হয় কিন্তু সরু, বেশ হরিদ্রাবর্ণ, খাইতেও ভাল।

মদনা—কাঁঠালী কলারই জাতীয়, অপেক্ষাকৃত একটু বড়।

তুলসী কলা—ছোট ছোট কলা হয়, বেশ সুস্বাদু ও সুগন্ধি, পশ্চিম দেশে পাওয়া যায়।

দয়ে কলা—যশোহর জেলায় জন্মে, ইহা এক প্রকার বীচা কলা, কিন্তু শাঁস টুকু অতীব মিষ্ট নরম ও সু-তার, চিনি সহ জলে গুলিলে অতি উত্তম সরবৎ প্রস্তুত হয়।

সয়া কলা—ইহাও এক প্রকার বীচা কলা, কাঁচা ফলের রস নানারূপ চক্ষুরোগে উপকারী।

সিঁদুরে কলা—দেখিতে ঘোর লালবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, ফল বড়, খাইতে ভাল, ইহাকে চীনাকলাও বলে।

বেসিনে কলা—এই কলা বেসিনদেশে জন্মে, স্বাদ অপেক্ষা ইহার গন্ধ অতি মনোহর ; পুষ্প ফেলিয়াও ইহার ঘ্রাণ লইতে ইচ্ছা হয়।

রসথলী—মান্দ্রাজে জন্মে, বড়ই সু-রসাল, দেখিতে প্রায় চাঁপার ন্যায়।

যবদ্বীপে কলা—যবদ্বীপে একপ্রকার আশ্চর্য্য কলা জন্মে ; এক গাছে একটী মাত্র ফল হয়, অর্থাৎ সমগ্র মোচাটা যেন জমাট বাঁধিয়া একটী ফলে পরিণত হয়। বাহিরে কলা প্রায় দৃষ্ট হয় না, কাণ্ডের ভিতরেই পুষ্ট ও পক্ক হইতে থাকে ; সম্পূর্ণ পাকিলে, গাছ ফাটিয়া বাহির হয়। ইহা এত বড় যে, একটী কলায় ৪ জনের পূর্ণ আহার হয়। তথায় আর একপ্রকার কলাগাছ আছে, তাহার পাতার উল্টাদিকে খোঁচা দিলে মোমের মত পদার্থ বাহির হয়, তাহাতে বাতি প্রস্তুত হয়।

ফিলিপাইনে কলা—ফিলিপাইন দ্বীপে তদপেক্ষাও ১টী বড় কলা একগাছে উৎপন্ন হয়, ইহা এত ভারি যে, ঠিক্ ৪ জনের বোঝা।

বেগুণে কলা—ইহা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে উৎপন্ন হয়, দেখিতে ছোট, খাইতে খুব সুস্বাদু। তত্রত্য বড় লোকেরা ইহা অত্যন্ত ভালবাসে।

ওরঙ্কো—আমেরিকায় "ফ্লোরিডা" দেশে ওরঙ্কো নামে এক প্রকার কলা হয়, ইহা গাছে পাকিলে ইহার সৌগন্ধ এতই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় যে, শুধু মানুষ কেন পশুপক্ষীরাও তদ্দ্বারা উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে।

প্রয়োগ—কলা কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?—এ প্রশ্ন করিলেই সর্ব্বাগ্রে স্বভাবতঃই মনে উঠে যে, ইহাকে দিব্য ঘনদুগ্ধের সহিত চট্‌কাইয়া উদরসাৎ করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা পক্ক রম্ভার সদ্ব্যবহার আর কিছু কল্পনায় আসে না। প্রাণিজগতে যেমন গরু, উদ্ভিজ্জগতে তেমনি কলাগাছ—উভয়েই মৃদু-প্রকৃতি, মনুষ্যের চিরসেবক। গরুর যেমন সর্ব্ব অবয়বই মনুষ্যের ব্যবহারে আসে, কলাগাছেরও তেমনি! তাই বুঝি কলা ও দুধে এমন সুন্দর মিলন! কলার থোড়, মোচা, গেঁড়, পাতা, খোলা, ডাঁটা, ফল, ফুল, ভিতরকার জল সবই উপকারী, কিছুই ফেলিবার নয়। ইহার থোড় অতি উত্তম তরকারী, আমিষ নিরামিষ উভয়রূপেই বেশ মজে। থোড় জ্বর, হাঁপানি মূত্রকৃচ্ছ্র ও বাতপিত্ত ঘটিত সমস্ত রোগে উপকারী। মোচার ঘণ্ট অতীব মধুর খাদ্য, অথচ বড়ই নির্দ্দোষ, সর্ব্বরোগেরই সুপথ্য। কলার গেঁড়ের (শিকড়ের) রস বহুমূত্র রোগে উপকারী, ইহা পরিষ্কার চিনির সহিত সেবন করিলে হিক্কা আরোগ্য হয়। ইহার তরকারী করিয়াও খাওয়া যায়।

জগদীশ্বর দরিদ্রের আহারের জন্য সোনা-রূপার থালা কলার গাছে রাখিয়াছেন,—বলা বাহুল্য যে, উহা তাহার পাতা। অধিকন্তু, হিন্দুশাস্ত্র মতে উহা ধাতব পাত্রাপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, হবিষ্যান্ন-ভোজন বা যাগযজ্ঞ পূজাদির উপাদান সংস্থাপন, কলার পাতেই হইয়া থাকে।

ঘা, ফোড়া, ফোস্কা প্রভৃতি বাঁধিতে হইলে কলার মাজ (কচিপাতা) আবশ্যক হয়। আজকাল অনেক হাঁসপাতালে ইহার ব্যবহার হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে পর্প্পটী নামক ঔষধ প্রস্তুত কালে কচি কলাপাতা দ্বারা গোবরের শিল নোড়া আবৃত করিতে হয়।

যাঁহারা পরের হুকায় তামাক খান্ না, তাঁহাদের অপরের বাড়ী গিয়া উক্ত নেশার অভ্যাস রাখিতে হইলে, কলার গাছকে স্মরণ করিতে হয়।

সর্ব্বোপরি একটী বড়ই আশ্চর্য্য কথা!—কলার পাতায় অতি সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হয়। ১৮৬৪ সালে ডাক্তার ক্রে ইহাদ্বারা একপ্রকার চমৎকার চিঠীর কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালে ডাঃ হাণ্টার মান্দ্রাজ মহাপ্রদর্শনী হইতে কলার পাতে যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা ঠিক্ একপ্রকার পার্চমেণ্টের তুল্য, আর এক প্রকার ঠিক্ যেন রূপার পাতের মত। খোলা ডাঁটা প্রভৃতি পোড়াইয়া যে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তাহার দ্বারা বেশ্ কাপড় কাচা হয়, পাড়াগাঁয়ে দরিদ্র গৃহস্থেরা এবং ধোপারাও ইহা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। শুনা যায় আজকালকার চলিত লবণ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে প্রাচীন কালে কোন কোন দেশে কলার ছাই ভাঁটিতে চোয়াইয়া এক প্রকার তীক্ষ্ণ ক্ষার বাহির করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করা হইত। এই ক্ষার প্লীহা যকৃৎ ও অম্লপিত্তে উপকারী। আর এক আশ্চর্য্য কথা—খোলা ও ডাঁটা হইতে যে উত্তম সূতা প্রস্তুত হয় তাহাতে দড়ী কাছি ও কাগজ হয় এবং ঐ সূতায় সুন্দর কাপড় হয়। ঢাকায় কলার সূতায় এক প্রকার বহু কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুন্দর কাপড় তৈয়ার হয়। ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মহাপ্রদর্শনীতে ঢাকার শিল্পী কলার সূতায় যে এক অপূর্ব্ব রুমাল দিয়াছিল তাহা আজপর্য্যন্তও আছে, উহার মূল্য ৫০৲ টাকা। পৌষ সংক্রান্তির দিনে গৃহস্থ মহিলারা স্বামি পুত্রের হিতকামনায় কলাখোলার নৌকা জলে ভাসাইয়া থাকেন।

কলা কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই আমাদের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। বিশেষতঃ কাঁচকলা বিশেষ পুষ্টিকর, ইহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লৌহের গুণ আছে। যে মস্তিষ্ক ও মেধার বলে ভারতের আর্য্যমনীষিগণ অপূর্ব্ব তথ্য-সমুদায় আবিষ্কার বা অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় বিরচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভূয়িষ্ঠরূপে এই কাঁচকলা দ্বারাই পোষিত হইয়াছিল—শাস্ত্রসেবী সাত্ত্বিক পণ্ডিতকুলের কাঁচকলা যে আহার্য্যান্নের চির-সহচর, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ব্রহ্মচর্য্য, বিষয়-বৈরাগ্য, শাস্ত্র-সেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় সংযমাদি যাহা কিছু মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য বা কাম্যরত্ন, কাঁচ-কলা ঘৃত সৈন্ধব ও আতপান্ন এই চারিটীই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবার সাধনীভূত। শুনা যায় বিলাতে কোনও ইংরাজ সর্ব্বদা গীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন কিন্তু

কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এইরূপে কিছুকাল ব্যর্থ যাওয়ার পর, কোনও বিলাতাগত বাঙ্গালী সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হয় ও হিন্দুশাস্ত্র বুঝিবার অসামর্থ্য বিষয়ে তাঁহার কাছে পরিতাপ করেন। তখন ঐ সাধু বলিলেন, সাহেব! যদি ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিবে, তবে প্যান্টেলুন ছাড়িয়া এই গৈরিক বসনটী পর, আর মাংসাদি ত্যাগ পূর্ব্বক কাঁচকলা-আতপতণ্ডুলাদি ভক্ষণ করিতে থাক ও শাস্ত্র পাঠ কর। এইরূপ করিতে করিতে সাহেবের শাস্ত্রে প্রবেশিনী প্রতিভা আপনা হইতেই ক্রমে উপনীত হইল।

পাকা কলার খণ্ড অনায়াসে গেলা যায় বলিয়া, লোকে অরুচিকর তিক্ত বা ঘৃণাজনক ঔষধ সমস্ত কলার ভিতরে পূরিয়া খাওয়াইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পূজার নৈবেদ্যে পাকা কলা দেওয়া অপরিহার্য্য,—এ ফল দেবতারও স্পৃহণীয়! কলাগাছ গণেশ ঠাকুরের স্ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বোম্বায়ে পতিব্রতা কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আয়ুঃপ্রদ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তথায় মাঠে প্রচণ্ড রৌদ্র নিবারণ করিয়া অন্য গাছকে রক্ষা করিবার জন্যও মধ্যে মধ্যে কলাগাছ রোপণ করা হয়। বর্ষাকালে বঙ্গের নিম্নস্থান সমূহ জলপ্লাবিত হইলে, লোকে কলাগাছের ভেলা ভাসাইয়া আত্মরক্ষা বা গতিবিধি করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার পাকা কলা হইতে একরূপ সুখ-সেব্য মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেখানে কলা শুলিয়া রৌদ্রে দিয়া নানা আকৃতি-বিশিষ্ট পাটালিও প্রস্তুত করে। মেক্সিকো দেশে, ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে পাকা কলা শুকাইয়া পালো (গুঁড়া) করিয়া রাখে। বস্তুতঃ পাকা কলা শুকাইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রণদ্বারা সুমিষ্ট "খাবার" প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালীরা যদি বিলাতে পাঠাইতে পারেন, তবে বোধ হয় উহা একটী উৎকৃষ্ট লাভের ব্যবসায় দাঁড়ায়। আমাদের দেশে হনি ফুড্, মেলিন্স্ ফুড্ প্রভৃতি কত অকিঞ্চিৎকর খাদ্য বিলাত হইতে আসিয়া বিক্রীত হইতেছে, আর আমাদের দেশের লোক এমন সুবিধার দিকে লেশ-মাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল পরীক্ষায় পাশ ও উমেদারী করিতেই চিরপ্রয়াসী। ইংরাজেরা পাকা কলাকে এত ভালবাসে বলিবার নয়। ঘরে বসিয়া শুধু কলার চাষ করিয়াও অনায়াসে তাহাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা যায়, তজ্জন্যই এই উক্তি—"তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে, থাকগে চাষা ঘরে শুয়ে।"

কলার খোলার ভিতরকার জল বড় শৈত্যকর, ইহা মস্তকে মাখিলে উন্মাদ রোগীর মস্তিষ্কও ঠাণ্ডা হয়। শাস্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ হিমসাগর তৈলে এই জল বা কদলীমূলের রস আবশ্যক হয়।

কলার মোচার ফুল বা অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র কদলীর রস বহুমূত্ররোগে বিশেষ উপকারী। কবিরাজগণ সচরাচর ইহার রস উক্ত রোগের বটিকা সমূহের অনুপানার্থ ব্যবস্থা করেন। সুপক্ক কলা ও পুরাতন তেঁতুলের শাঁস জলসহ খাইলে বায়ুপিত্ত জন্য আমাশয় রোগ ভাল হয়। দধি, চিনি, সুপরিপক্ক কলা ও পুদিনার রস পিষিয়া খাইলে আমাশয় ও গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়। বহুমূত্রের শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ যথা—(১) কদলীনাং ফলং পক্কং ধাত্রীফলরসং মধু। শর্করা পয়সা পীত মপাং ধারণমুত্তমম্। অর্থাৎ পাকা কলা ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ এক পোয়া এই সমুদায় অতি উৎকৃষ্ট মূত্রধারক হইয়া থাকে। (২) কদলীনাং ফলং পক্কং বিদারীঞ্চ শতাবরীং। ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাত রপাং ধারণ মুত্তমম্॥ পক্ক কদলীফল, ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ও শতমূলীর রস সমভাগে দুগ্ধসহ সেবনে অতিরিক্ত মূত্রস্রাব নিবারিত হয়। (৩) তালকন্দঞ্চ তরুণং খর্জ্জুরং কদলীফলম্। পয়সা পায়য়েৎ প্রাত র্মূত্রাতিসার নাশনম্॥ কচি তালের কাঁদের (কন্দের) রস, খেজুর মূলের রস ও পাকা কলা দুগ্ধসহ খাইলে মূত্রাতিস্রাব নিবারিত হয়।

কলা অতিভোজন জন্য রোগে হাকিমেরা মধু আদা ও গঁদের জল খাইতে দিয়া থাকেন। পাকাকলা ও নেবুর রস চটকাইয়া খাইলে কতকটা আম্ররসের মত লাগে; উহা অন্নে রুচিকারক এবং যাহাদের আমাশয়ের ধাতু ও সর্ব্বদা পেট গরম হয় তাঁহাদের বড় উপকারী। অতিরিক্ত কলা খাওয়া জন্য অজীর্ণে আয়ুর্ব্বেদে সৈন্ধব লবণ জলে গুলিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে।

বহুমূত্রের কদলীকন্দঘৃতে ও হেমনাথ প্রভৃতি ঔষধে কলার মোচার প্রয়োজন হয়। কাস, শোথ, গলগণ্ড, কোষবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগীর পক্ষে কলা কুপথ্য।

ভাষানুবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনে করিবেন না যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। দেখাইতে গেলে প্রবন্ধটীর কলেবর বৃদ্ধি হয় তাই বিরত হইলাম। এক কথায় বিজ্ঞান এখনও আমাদের শাস্ত্রান্তর্গত বহুতর বিষয়ের ছায়াস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে যে দু'একটী তত্ত্ব, বিজ্ঞানের সাহায্যে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অবিদিত ছিল ইহা নহে। আর্য্য ঋষিগণ তত্তৎ বিষয়ের কর্ত্তব্যতামাত্র প্রকটিত করিতে উদ্যত হইয়া উপকারিতাকে গৌণভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য, পাপাঙ্কুরসকামধর্ম্মের প্রাবল্য দুরীভূত করিয়া, নিষ্কাম ধর্ম্মেরই জয়পতাকা উড্ডীন করা। তবে সম্প্রতি যুগ মাহাত্ম্যে পাপসকামধর্ম্মের অনন্য আধিপত্যে অধঃপাতের পথ পরিষ্কৃত হইবে বলিয়া, গৌণ পক্ষই মুখ্য ও মুখ্যপক্ষ গৌণ এবং অনাদরণীয় হইতে বসিয়াছে। তাহা না হইলে ইদানীন্তন একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক আমেরিকান্ সাহেবের নিকট গঙ্গাজলের লঘুতা ও পাচকতা ইত্যাদি উপকারের কথা একবার মাত্র শুনিয়া আমাদিগের নব্য সমাজ তাহার পক্ষপাতে বদ্ধপরিকর হইলেন কেন? আর আবহমানকাল ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিমণ্ডলী যে, এই পবিত্র গঙ্গাজলের পবিত্রস্পর্শে ইহকাল ও পরকাল পবিত্র করিতে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতেই বা সমাজ সন্দিহান্ ছিলেন কেন? ফল একই হইল, কেবল গঙ্গাজলের মুখ্য পবিত্রতা দূরে গিয়া গৌণ উপকারিতাই এ ক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিল। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞান আপাতঃ মধুর গৌণপক্ষকে তন্ন তন্ন ভাবে দেখাইয়া পাপসকামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী সেই প্রভু ঋষিগণ অনায়াসে সমস্ত অবগত হইয়া থাকিলেও এ পক্ষকে গৌণ রাখিয়া, মুখ্যপক্ষ নিত্য-কর্ত্তব্যতাকেই বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব বুঝিবার দোষে ভাষানুবাদের উপকারাভাসেই অনেকেই মুগ্ধ হইতেছেন। ফলতঃ তাহাতে অনুপকারই হইতেছে। আরও

দেখুন, অনেকেরই ধারণা পূর্ব্বে না কি যাঁহারা কিছু জানিতেন তাহা প্রকাশ না করিয়া অনেককে উৎকণ্ঠিত করিতেন। ভাষানুবাদের প্রভাবে আজ তাহা নাই। ইহা সত্য হইলেও পূর্ব্বপ্রথা মন্দ ছিল না। তদ্দ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা ছিল, এবং যথাপাত্রেই তাহা অর্পিত হইত। সম্প্রতি আব্রহ্মচণ্ডাল সকলেই বেদে অধিকারী, সকলেই বেদতত্ত্ববিদ্। পারিজাত মঞ্জরীতে আজ একা ইন্দ্রাণীর অধিকার নাই। শুনী, শুকরী, বানরী; সকলেরই অধিকৃত হইয়া পদদলিত হইতেছে। বৈজয়ন্তী আজ ভগবানের কণ্ঠচ্যুত হইয়া বানরের হস্তে খণ্ড খণ্ড হইতেছে। ইহাই যদি সদ্বস্তুর সদ্ব্যবহার, তাহা হইলে স্বীকার করিলাম ভাষানুবাদ আমাদের প্রভূত উপকারী। হায়! বলিতেও দুঃখ হয়, বেদের নাম হইয়াছে আজ 'চাষার গান'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন উঠিয়া গিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় জীব ও ব্রহ্ম আর ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় উঠিয়া গিয়া মন ও বুদ্ধি হইলেন। দুর্য্যোধন-প্রভৃতি হইলেন আশা। এইরূপ অভিধান ছাড়া অভূত পূর্ব্ব অচিন্তনীয় অর্থের অবতারণা করিয়া ভাষানুবাদ যদি আমাদের উপকার করিয়া থাকে এবং তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই। তাহা না হইলে ভাষানুবাদ যে, প্রকারান্তরে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে ইহা কে না বলিবে?

অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে যাহা আমাদের একটা বিস্মৃতির ভয় ছিল ভাষানুবাদের দ্বারা আজ তাহা নাই। বিস্মৃতির ভয় নাই সত্য; পরন্তু ভাষানুবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া মানসিক উন্নতির অনন্য নিদান সেই গবেষণাই আমাদের উঠিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে আর যে কোনও বিষয় চিন্তা পথে আসিয়া প্রতিভার বিকাশ সাধন করিবে ইহার আশা নাই। বোধ হয় কিছু দিন পরে প্রত্যেক কথাতেই পুস্তক খুলিতে হইবে। পূর্ব্বে কোনও এক বিষয়ের চিন্তা করিতে বসিলে তদানুষঙ্গিক কত বিষয়ই জানিতে সক্ষম হওয়া যাইত, সম্প্রতি ভাষানুবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া আমাদের ধীশক্তি এতই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে যে, নিগূঢ় বিষয় ভাবা দূরের কথা, সামান্য একটী বিধি ব্যবস্থা দিতে হইলে বা যৎসামান্য একটী শব্দার্থ জানিতে হইলে পুস্তকের পাতা না উল্টাইয়া আর রক্ষা নাই। পূর্ব্বে পাণ্ডিত্য ছিল অন্তরে, সম্প্রতি পাণ্ডিত্যের নিবাস-ভূমি পুস্তক। যখন পরহস্তগত ধন ধনই নয়, পুস্তকস্থা বিদ্যা বিদ্যাই নয়,

তখন কি করিয়া বলিব যে ভাষানুবাদের দ্বারা বিদ্যার উন্নতি হইতেছে। পুস্তকের সদ্ভাবে পাণ্ডিত্য, পুস্তকাভাবে মূর্খতা ইহাই ত হইল ভাষানুবাদের পরিণাম! জানি না, ভাষানুবাদের দ্বারা সারনিচয় তাম্রফলকে খোদিত হইতেছে কি জলে মিলিত হইতেছে। উপসংহারে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভাষানুবাদে যাঁহাদের পাণ্ডিত্য, তাঁহারা যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন, তাহা হইলে দরিদ্রগণের "ভূমিখাতনিখাতেন ধনেন ধনিনো বয়ং" এই উক্তিরই বা দোষ কি?

সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে উভয় পক্ষের বক্তব্য সমূহ উপস্থাপিত করিলাম, একবার চিত্তরূপ তুলাদণ্ডে ফেলিয়া দেখুন কোন্ পক্ষ গুরু, এবং কোন্ পক্ষ লঘু হয়। যদি আমাদিগকে মীমাংসা করিতে বলেন, তাহা হইলে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে—

"স্তুবন্তি গুর্ব্বী মভিধেয় সম্পদং বিশুদ্ধি মুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ।
ইতি স্থিতায়াং প্রতি পূরুষং রুচৌ সুদুর্ল্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ॥"

প্রহরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা মহাপাত্র।

সুজন-প্রশংসা।

গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুস্তথা।
পাপং তাপঞ্চ দৈন্যঞ্চ হন্তি সাধোঃ সমাগমঃ॥ ১॥

গঙ্গা নাশ করে পাপ, চন্দ্রমা বিনাশে তাপ,
কল্পতরু দৈন্য দেখি তাহা দূর করে।
কিন্তু মহাশয় যিনি, তিনেরে সম্যক্ জিনি
পাপ তাপ আর দৈন্য সকলই হরে॥ ১॥

উদেতি সবিতা তাম্র স্তাম্র এবাস্তমেতি চ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা॥ ২॥

উদয়ের কালে সূর্য্য লোহিত যেমন,
অস্ত-সময়েও দেখ লোহিত তেমন।

কিবা সুখ, কিবা দুঃখ, সকল সময়
মহতের একভাব, জানিও নিশ্চয় ॥ ২ ॥

অঞ্জলিস্থানি পুষ্পাণি বাসয়ন্তি করদ্বয়ম্।
অহো সুমনসাং বৃত্তির্বামদক্ষিণয়োঃ সমা ॥ ৩ ॥

অঞ্জলি ভিতরে পশি থাকে যদি পুষ্পরাশি,
সুবাসিত হয় করদ্বয়।
বাম দক্ষিণের প্রতি সুমনার এক রীতি,
কভু তার অন্যথা না হয় ॥ ৩ ॥

সজ্জনস্য হৃদয়ং নবনীতং যদ্বদন্তি কবয় স্তদলীকম।
অন্যদেহবিলসৎপরিতাপাৎ সজ্জনো দ্রবতি নো নবনীতম্ ॥ ৪ ॥

কিবা নবনীত, কিবা সাধুর হৃদয়,
দুই তুল্য ;—কেহ কারে নাহি করে জয়।
যে কবি এ কথা বলে, মিথ্যা কথা তার,
তাহার কথায় আর শ্রদ্ধা রয় কার?
পরচিত্তে অল্প মাত্র তাপ যেই হয়,
অমনি গলিয়া যায় সাধুর হৃদয়।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, নবনীত হায়!
সে তাপে হইয়া তপ্ত গলিতে না চায় ॥ ৪ ॥

অহো মহত্ত্বং মহতামপূর্ব্বং বিপত্তিকালেঽপি পরোপকারঃ।
যথাস্যমধ্যে পতিতোঽপি রাহোঃ কলানিধিঃ পুণ্যচয়ং দদাতি ॥ ৫ ॥

কি আশ্চর্য্য মহতের মহিমা অপার,
নিজ বিপদেও করে পর-উপকার।
চন্দ্র পড়িয়াও রাহু-মুখের ভিতরে
মরিতে বসেছে, তবু পুণ্য দেয় নরে ॥ ৫ ॥

পদ্মাকরং দিনকরো বিকচীকরোতি চন্দ্রো বিকাশয়তি কৈরবচক্রবালম্।
নাভ্যর্থিতোঽপি জলদঃ সলিলং দদাতি সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু কৃতাভিযোগাঃ ॥৬॥

নলিনীর দুঃখ দেখি দেব দিবাকর,
দরশন দিয়া তার জুড়ান অন্তর।
কুমুদিনী বড় কষ্ট পাইতেছে মনে,
ইহা ভাবিয়াই চন্দ্র উঠেন গগনে।
জলদ আপনি জল ঢালে মৃত্তিকায়,
কে কোথা তাঁদের কাছে গিয়া ভিক্ষা চায় ?
মাহাত্মা পরের দুঃখ আপনি ভাবিয়া,
মনে সুখ পান তাহা মোচন করিয়া। ৬।

ধবলয়তি সমগ্রং চন্দ্রমা জীবলোকং কিমিতি নিজকলঙ্কং নাত্মসংস্থং প্রমাষ্টি।
ভবতি বিদিতমেতৎ প্রায়শঃ সজ্জনানাং পরহিতনিরতানামাদরো নাত্মকার্য্যে॥৭॥

চন্দ্রদেব নিজরশ্মি করিয়া বিস্তার
নিষ্কলঙ্ক করি দেয় জগৎ সংসার।
নিজের শরীরে কিন্তু কলঙ্ক যা রয়,
চেষ্টা নাহি তাঁর তাহা করিবারে লয়।
পরহিতে রত রন্ যাঁরা সর্ব্বক্ষণ,
নিজকার্য্যে কভু তাঁরা নাহি দেন মন। ৭।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

তত্ত্বমঞ্জরী—ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। রামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কাঁকুড়গাছী যোগেদ্যান হইতে তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রকাশিত; বার্ষিক সাহায্য এক টাকা মাত্র। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সুললিত উপদেশাবলী ইহাতে রীতিমত প্রকাশিত হইতেছে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও বেশ শিক্ষাপ্রদ। এরূপ মাসিক পত্রিকার প্রচার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ১৮৯৯, নবেম্বর। ১৩০৬, অগ্রহায়ণ।

মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲।

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

---

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—আমাদের কি চাই, দ্রব্যগুণ বিচার, শক্তি-লীলা-ষট্‌কম্।

"ঋষি"-পত্রিকার নিয়ম।

১। "ঋষি" বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের "ঋষি" না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার জন্য আমরা দায়ী নহি। আকার (অন্যূন) ডিমাই ১৬ পেজী ৩ ফর্ম্মা।

২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই কথাটীর উল্লেখ করিবেন।

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। } { ১৩০৬, অগ্রহায়ণ।

আমাদের কি চাই?

আমাদের কি চাই? ইহার উত্তর কি দিব? এক কথায় বলিতে গেলে, আমাদের সকলই চাই! আমরা যে এখন দীন হীন দরিদ্র! আমাদের যে কিছুই নাই! আমরা মনে করিতেছি, আমরা এখন শিক্ষালাভ করিয়া মহান্ পণ্ডিত হইতেছি, দুঃসাধ্য বিষয় গুলিও অনায়াসে করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছি; এমন মান এমন পাণ্ডিত্য বুঝি আমাদের আর্য্যবংশীয়গণও লাভ করিতে পারেন নাই। দর্শন বিজ্ঞানের সুরম্য রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা করিতে না পারি কি? যে বিদ্যুৎ মালা বহুদূরে অবস্থান করিয়া মেঘের গলা জড়াইয়া কবিহৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবলহরী ছুটাইত, আজ তাহা বিজ্ঞানবলে Electric light রূপে চন্দ্রদেবকে পরাস্ত করিয়া আমাদিগকে আলোক যোগাইতেছে। বিজ্ঞানবলে আজ আমরা কবির উপমা-খণি সেই বিদ্যুৎমালাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি। যে সকল গিরিশ্রেণী আমাদের দুরারোহ ছিল, যে সকল দেশ আমাদের অদর্শনীয় ছিল, বিজ্ঞানের করুণায়, Baloon রূপ মহা যান আমাদিগকে সে সকল স্থানেও লইয়া যাইতেছে, সে সকল স্থান অনায়াসে দর্শন করিয়া জনসমাজ হইতে আমাদিগকে কত "বাহবা" দিতেছে। বিজ্ঞান সাহায্যে না হইতেছে কি—আমরা না পাইতেছি কি!

পাইতেছি অনেক সত্য, কিন্তু হারাইতেছি যে কত, তাহা কি একবার কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন!

যে দর্শন বিজ্ঞান রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, আমাদিগকে রাশি রাশি

অর্থব্যয় করিয়া আত্মীয় বান্ধবদিগকে ছাড়িয়া স্বদেশের মমতা ত্যাগ করিয়া মহাসাগরোপকূলে যাইতে হয়, আমাদের আর্য্যবংশীয়গণও তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই এমত নহে। তাঁহারা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মরাজ্যে যেরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, আধুনিক পণ্ডিতগণের সেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিবার সময় এখনও বহু পশ্চাতে। বৃক্ষতল বা পর্ণকুটীরবাসী প্রাচীন মুনিঋষিগণ প্রকৃতির অভিধানমাত্র পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, বহুমূল্য রাশি রাশি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও, আধুনিক বিদ্বান্ বা বৈজ্ঞানিকগণের, সেরূপ জ্ঞানার্জ্জন করিবার ক্ষমতা আজও হয় নাই।

তাঁহাদের অতুল জ্ঞান বিজ্ঞানবলেই, আমরা অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের বিজ্ঞান বলেই শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সকল জ্ঞাত হইতেছি। হিন্দুশাস্ত্র কেবল ধর্ম্মরাজ্যে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই নিরস্ত হন নাই; এক এক খানি শাস্ত্রগ্রন্থ মহাবৈজ্ঞানিকতায় পরিপূর্ণ। সেই জগৎপূজ্য ঋষিবাক্য সকল যে, অমূল্য বৈজ্ঞানিকতায় পূর্ণ, তাহার গভীর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিতে, আধুনিক মহামহোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিকগণেরও মস্তক ঘুরিয়া যায়—যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন।

আমরা নিজ ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন পদ-দলিত করিয়া পরদ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছি; তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা, তাই আমরা পদ্মপত্রবৎ অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছি। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় ডুবিয়া গিয়াছি, সুতরাং নিজ ভাণ্ডারের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছি না; কাজেই আমাদের অমূল্য সম্পত্তি সকল বহুদূরে গভীর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

স্বীকার করি, আধুনিক শিক্ষাবলে জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইতেছে, কিন্তু কেবল জড় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনই কি মনুষ্যত্ব! জড় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জাতীয়তা বিসর্জ্জন করিতে হইবে, ধর্ম্মপ্রাণতা পদদলিত করিতে হইবে, ইহা শিখিলে কোথায়!

অনেকে মনে করিতেছেন, আমাদের এখন উন্নতির সময়, "অধঃপতন" কথাটা তাঁহাদের নিকট স্বপ্নলব্ধ বাক্যবৎ। বাস্তবিক আমাদের এখন এতই অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, আমাদের কি অভাব, কি দুঃখ, কিরূপ অধঃপতন হইতেছে, আমরা তাহা নিজেই অনুভব করিতে অসমর্থ। প্রথমতঃ,

আধুনিক শিক্ষা, আমাদের পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রমূর্ত্তি বিদূরিত করিয়া তৎস্থলে Loveএর সুরম্য মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আমরা সেই Love এর ফলে, লাভ করিতেছি—বিষম অশান্তি। কেন? তাহাও কি বলিতে হইবে? আমরা নিজ মনোমত কাহাকেও দর্শন করিয়া তাহার সহিত Love করিলাম, পরিণামে তাহার সহিত পরিণীত হইবার জন্য লালায়িত হইলাম; কিন্তু সমাজের নিয়মানুরোধে বা গুরুজনের প্ররোচনায়, অনেক স্থলেই সেই লালসায় বঞ্চিত হইয়া তীব্র অশান্তি ভোগ করিতে হয়। কোনও স্থলে ঘটনা ক্রমে "My love" এর সহিত সম্মিলন ঘটিলে, তাহাতেই কি তৃপ্তি সাধন হয়! কিয়দ্দিন অতি সুখেই অতিবাহিত হয় সত্য, কিন্তু পরে যখন পরস্পর পরস্পরের হৃদয়-রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, তাঁহাতে কত অভাব দৃষ্ট হয়; তখন বুঝিতে পারেন, যাঁহার সহিত Love ঘটিয়াছিল তিনি প্রবঞ্চক শঠ কামুক মাত্র! তখন Love এর যে আনন্দ যে সুখ তাহা ফুরায়, তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া রাখে—অশ্রুজল ও বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘ-শ্বাস। Love হইতেই গুপ্তপ্রেমের অভিনয়। এই অভিনয়ে, কত পবিত্রচেতা নরনারী যে, কলঙ্কসাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন,তাহার ইয়ত্তা কোথায়! Loveকারী স্ত্রী হউন বা পুরুষই হউন, Love করিয়া কখনই আত্মহারা হইতে পারেন না,আত্মহারা হইবার মত তাহাতে কিছুই পাওয়া যায় না, তাহার কেবল চাকচিক্যশালীতাই সার। হিন্দুর প্রাচীন প্রেম ও বর্ত্তমান Loveএ বহু তফাৎ।

"জীবনে মরণে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি" ইহাই হিন্দু প্রেমের মাধুর্য্য।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই Love আসিল কোথা হইতে! পাশ্চাত্য রুচিই Love সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র বলেন,—

"অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নববর্ষে চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা তদূর্দ্ধে চ রজস্বলা॥"

ইহা মহাত্মা মনুরই উক্তি। বাল্যবিবাহের ন্যায় দাম্পত্যপ্রেম গাঢ় করিতে আর কোন প্রথাই সমর্থ নহে। বাল্যবিবাহিত দম্পতিদ্বয়ের মধ্যে অন্যত্র Love সঞ্চার হইবার সুযোগ ঘটে না; তাহারা পরস্পরে পরস্পরের হৃদয়ে ডুবিয়া যায়, অন্যদিকে চিত্ত ধাবিত হইতে পারে না। সুতরাং Love-সুলভ "হা হতোস্মি" আসিয়া হৃদয় দগ্ধ করে না; অতএব হৃদয়ে শান্তির অভাব

থাকে না, হৃদয়ের অমৃতময় শান্তির ফলে সংসারে স্বর্গীয় শান্তির আবির্ভাব হয়। প্রাচীনকালে বাল্যবিবাহের অমৃতময় ফলেই হিন্দুর পারিবারিক সুখ সুলভ ছিল। অধুনা যৌবনবিবাহ প্রচলনের জন্য, অনেকেই লালায়িত হইতেছে; কিন্তু অনেক স্থলে ইহার বিষময় ফলে, কত নিরপরাধ সহযোগীর হৃদয় পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছে, সমাজ তাহার সন্ধান রাখিয়াছেন কি? বর্ত্তমান রুচির জন্যই আমরা আমাদের চিরারাধ্য সুকোমল সুখময় দাম্পত্য প্রেমরত্ন হারাইতে বসিয়াছি, তাহা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন!

আমাদের সমাজে আর একটি তীব্র অশান্তি 'বরপণ'। কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার ও জামাতাকে যৌতুকাদি প্রদান পদ্ধতি, প্রাচীন কালেও ছিল; কিন্তু তাহা অবস্থা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ অবস্থা এবং ইচ্ছা তিনি সেই অনুসারে কন্যা ও জামাতাকে যৌতুকাদি প্রদান করিতেন। এখন কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে বরকর্ত্তা পীড়ন পূর্ব্বক যৌতুক গ্রহণ করেন। এখনকার বর যৌতুক নীলামের মূল্যবৎ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক স্থলে, সামান্য পরিবারের মধ্যে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে যে বিপন্নাবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে কি বুঝিবে। নিরন্ন মূর্খের হস্তে কন্যা প্রদান করিতে হইলেও অন্ততঃ ৫০০ পাঁচ শত টাকা চাই; কিন্তু অনেক স্থলে কন্যাকর্ত্তার বাস্তু ভীটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও ৫০০ শত টাকা সংগ্রহ করা দায় হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে, যাঁহার দুই চারিটী কন্যা আছে, তাঁহার কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত, সমাজ তাহা একবার ভাবিবেন না কি? এইরূপ বিপন্নাবস্থাপন্ন কন্যাকর্ত্তা যথা সময়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া উঠিতে পারেন না। এ দিকে শাস্ত্র বলেন, কুমারী কন্যার নারীধর্ম্ম ঘটিলে সপ্তপুরুষ নরক গামী হন। সুতরাং কন্যাকর্ত্তাও ধর্ম্মভ্রষ্টতাবশতঃ নরক ভোগ করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যাকর্ত্তার এই ধর্ম্মভ্রষ্টতার কারণ কি? বরপণ নহে কি? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার জন্য দায়ী কে? এই বরপণ নব্য শিক্ষার ফল। আমাদের রুচি রীতি নীতি যতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমরা ততই ধর্ম্মপ্রাণতা হারাইয়া হীনবল হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বরপণের যেরূপ আধিক্য দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সমাজপতিগণের এ বিষয়ে রুচি পরিবর্ত্তিত না হইলে, ভারতে আবার রাজপুতনার ন্যায় সেই শোচনীয় কন্যাহত্যা ব্যাপার সংঘটনের আশঙ্কা হয়।

নব্য সভ্যতায় সুসভ্য হইয়া আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারকে Don't care করিতে শিখিয়াছি। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মহত্ত্ব আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, ইহাও আমাদের অবনতির একটী কারণ। জন সমাজে যতই মিশামিশি হয়, মানুষের ততই শিক্ষালাভ হয়। একান্নবর্ত্তী সংসার, আমাদের জীবনের একটি মহাশিক্ষা ও পরীক্ষার স্থল। এখন আমাদের এই শিক্ষালয়ের অভাব ঘটিয়াছে; আমরা নিজের প্রভুত্ব লাভ করিয়া, আত্মকৃতার্থতা লাভ করিয়া, কেবল হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিতেছি মাত্র। একান্নবর্ত্তী সংসার হারাইয়া আমরা নিঃস্বার্থতা, সহানুভূতি, উদারতা প্রভৃতি সমস্ত অমূল্য রত্নগুলি হারাইয়া ফেলিতেছি।

এ দিকে, যেমন জড় বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি হইতেছে, অপরদিকে আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি চতুর্গুণ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সকল দিক চাহিয়া নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে অনুরাগ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে, মানব ইহলোক ও পরলোক পরম শান্তি ও সুখে অতিবাহিত করে।

আমরা প্রাচীন রীতিনীতি, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া সুখে আছি— এমন কথা কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন? প্রাচীন কালের স্বাস্থ্য, আয়ুঃ, ধর্ম্ম, জ্ঞান, সুখ, শান্তি, প্রেম, প্রীতি, দয়া, মমতা প্রভৃতি আমরা শিক্ষিত হইয়া সবই হারাইতেছি। ঐ অমূল্য রত্নগুলি লইয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। যদি মনুষ্যত্বই হারাইতে হইল, তবে অন্তঃসারহীন উন্নতি লইয়া প্রয়োজন কি? আমরা অধুনা জননীর গর্ভ হইতেই প্লীহা যকৃৎ লইয়া ভূমিষ্ঠ হই, তাহার পর যে কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকি তাহাও নানারূপ পীড়ায় মুহ্যমান হইয়া আমাদের এখন,—"বয়স না হতে কুড়ি আগে পাকে কেশ"। আমরা এখন প্রচীন না হইতেই বার্দ্ধক্যের পথে উপস্থিত হই। এই সমস্ত অধঃপতনেরই একমাত্র কারণ দেশীয় রুচি রীতি নীতি পরিবর্ত্তন।

হিন্দুশাস্ত্রে দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, স্বাস্থ্যোপদেশ, চিকিৎসা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, নাই কি? যাহা চাহিবে, যাহা প্রয়োজন, ঋষিবাক্যানুশীলন করিয়া দেখ, তাহাই পাইবে। যদি আমাদের প্রকৃতই উন্নতিলাভ করিতে হয়, তবে আমাদের চাই—ঋষিবাক্যে অনুরাগ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

দ্রব্যগুণ বিচার।

কমল।

প্রয়োগ—সকল প্রকার পদ্মেরই ন্যূনাধিক রক্তরোধক শক্তি আছে, কিন্তু শ্বেত অপেক্ষা নীলপদ্মে ঐ শক্তি অধিক এবং নীল অপেক্ষা লালপদ্মে উহা আরও অধিক আছে। ইহা শৈত্যগুণাত্মক, তজ্জন্য ঊর্দ্ধগ রক্তস্রাবে স্বভাবতঃ কফের সংস্রব থাকায়, ইহার প্রয়োগ অতি বিরল; অধোগ রক্তস্রাবে অর্থাৎ অর্শের রক্তে, স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদরে ও মলদ্বার হইতে রক্তনিঃসরণে বায়ুর প্রবলতা থাকায় ইহার যথেষ্ট উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু, শাস্ত্রে উক্ত আছে "ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টম্, অধোগং পবনানুগম্।" অর্থাৎ ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে কফের এবং অধোগ রক্তে বায়ুর সংস্রব থাকে। রক্তরোধার্থ পদ্মের দলের রস এক কাঁচ্চা হইতে আধ ছটাক মাত্রায়, একটু পরিষ্কার চিনি সহ দিতে হয়। শীতবীর্য্য ও পিত্তনাশক বলিয়া পদ্মদলের প্রলেপ বাতরক্তের দাহ ও পিত্তজনিত গাত্রদাহ নাশ করে। গ্রীষ্মকালে কোমল পদ্মপত্রোপরি শয়ন করিলে, শীতলপাটী অপেক্ষাও উহা অধিক আরামদায়ক হইয়া থাকে। সংস্কৃত নাটকাদিতে দৃষ্ট হয় যে, নায়ক বা নায়িকার বিরহজনিত গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে, কমলপত্র শয্যা অবলম্বিত হইত। কবি কালিদাস লিখিয়াছেন, দুষ্মন্তের বিরহজ্বালায় শকুন্তলা পদ্মপত্রশায়িতা হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর পদ্ম-পত্রে অবস্থিতি কি তাঁহার প্রকৃতিগত অস্থিরতা নিবারণের জন্য?

কতিপয় মুষ্টিযোগ:—(১) কচি পদ্মপত্রের রস পোড়া-ঘায়ে বিশেষ উপকারী। (২) নীলপদ্মের রস নাসিকা দ্বারা পান করিলে তদ্দণ্ডে প্রবল তৃষ্ণার শান্তি হয়। (৩) নীলোৎপল, বটের ঝুরি, কুড়, মধু ও খই এই সমস্ত এক সঙ্গে পিষিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখমধ্যে ধারণ করিলে শীঘ্র পিপাসার শান্তি হয়। (৪) কচিপদ্মপত্র ও কৃষ্ণতিল, চিনিসহ পেষণ করিয়া ছাগদুগ্ধসহ পান করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। (৫) কচিপদ্মপত্রের রস চিনিসহ পান করিয়া উক্তরূপ কচি পত্র মলদ্বারে লাগাইয়া কৌপীন পরিয়া থাকিলে, মলদ্বার নির্গম (হারিস) দূরীভূত হয়।

(৬) পদ্মের ডাঁটা দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার সোঁদালপত্রের রসের সহিত প্রলেপ দিলে পদ্মিনীকণ্টক (শরীরে ও মুখে, পদ্মকণ্টকাবৃতের ন্যায় যে চক্রাকার উদ্গত হয় তাহা) আরোগ্য হয়।

(৭) পদ্মপত্র, বেণামূল, কুড়, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও কুম্‌কুম একত্র জল সহ পিষিয়া মুখে লেপন করিলে মেচেতা, নীলিকা, ব্রণ প্রভৃতি নানা মুখদূষিকা পীড়া দূরীভূত হয়।

(৮) পদ্মফুলের ভিতরে যে হরিদ্রাবর্ণ রেণু থাকে, তাহা চন্দন-ঘষার সহিত লাগাইলে জ্বালাযুক্ত ঘামাচি আরোগ্য হয়। (৯) রক্তকমলের মূলের (গেঁড়ের) রস রক্তপ্রদরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পদ্মবীজের গুণ।

পদ্মবীজং হিমং স্বাদু কষায়ং তিক্তকং গুরু।
বিষ্টম্ভি বৃষ্যারুক্ষঞ্চ গর্ভসংস্থাপকং পরম্।
কফবাতকরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

পদ্মবীজ শীতল, সুমিষ্ট ও ঈষৎ তিক্ত-কষায়, গুরুপাক, বিষ্টম্ভকর, শুক্রের গাঢ়তাকারক, রুক্ষ, গর্ভসংস্থাপক (শুষ্ক বীজচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনি সহ পায়স প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলে, গর্ভস্রাবের আশঙ্কা দূরীভূত হয়) কফবাতকর, বলবর্দ্ধক, সংকোচক, রক্তপিত্ত ও দাহপ্রশমক।

পদ্মের বীজ শুকাইয়া উৎকৃষ্ট জপের মালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ বীজের শাঁস, মিশ্রীসহ কাঁচা খাইলে উত্তম জল-খাবার হয় এবং যথাবিধি রন্ধন করিলে অতীব সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। উহা মেহ ও বহুমূত্র রোগীর বড় উপকারী।

পদ্মের গেঁড় হইতে যে মূল নিম্নাভিমুখে ভূমিমধ্যে প্রবেশ করে তাহাকে মৃণাল বলে; তাহা দেখিতে অতীব শুভ্র। কাব্যে ইহা কোমল ও শুভ্রবস্তুর উপমানস্থল বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহা সুস্বাদু, তৃষ্ণাহর ও দাহনাশক।

শাস্ত্রোক্ত উশীরাসব ও প্রসিদ্ধ চ্যবনপ্রাশে নীলোৎপল, ফলকল্যাণ ঘৃতে রক্তোৎপল, বায়ুরোগের পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈলে শ্বেতপদ্মের প্রয়োজন হয়।

কমলা গুঁড়ি।

বাঙ্গালা নাম—কমলা গুঁড়ি; হিন্দী—করোলা বা কমীলা; ইংরাজী—Malatus philippensis. সংস্কৃত পর্য্যায়:—কাম্পিল্যঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রোচনোঽপি চ। সংস্কৃত নাম—কাম্পিল্য, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ, রোচন।

ইহা দেখিতে ইষ্টকের সূক্ষ্মচূর্ণের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা সাতিশয় লঘু, হরিদ্রা-চূর্ণ অপেক্ষাকৃত অধিক লাল হইলে যেরূপ হইত ইহা দেখিতে ঠিক্ তদ্রূপ। ইহা একপ্রকার গাছের ফলের গাত্রসংলগ্ন রেণু মাত্র; ঐ গাছ ভারতের সমুদ্র সন্নিকটে, সিংহল, চীন, আরব প্রভৃতি স্থানে জন্মে। কমলাগুঁড়ি বাজারে বণিকের দোকানে ধূলা-বালি-মিশ্রিত অবস্থায় কিনিতে পাওয়া যায়। ব্যবহার-কালে কাপড়ে ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

কাম্পিল্যঃ কফপিত্তাস্র ক্রিমিগুল্মোদর ব্রণান্।
হন্তি রেচী কটূষ্ণশ্চ মেহানাহবিষাশ্মনুৎ॥

রস—ঈষৎ কটু; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—কফ-পিত্তঘ্ন, রক্তদোষ, ব্রণ ও বিষনাশক।

প্রভাব—রেচক, কৃমি, গুল্ম, উদর, মেহ ও অশ্মরীনাশক।

প্রয়োগ—ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা মল-বিরেচক কিন্তু অন্ত্রে বেদনা জন্মায় না। ইহা স্পর্শে অত্যন্ত কর্কশ বলিয়াই বোধ হয় ক্রিমির গাত্র সংঘর্ষণ করিয়া উহাদিগকে নিহত ও রেচন গুণে নিষ্কাশিত করে। চূণের জলসহ সেবন করাইলে শীঘ্র ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ভাবমিশ্র বলেন—কম্পিল্লচূর্ণ কর্ষার্দ্ধং গুড়েন সহ ভক্ষিতম্।
পাতয়েৎ তু ক্রিমীন্ সর্ব্বান্ উদরস্থান্ ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ কমলাগুঁড়ি চূর্ণ ১ তোলা, গুড়ের সহিত সেবন করিলে উদরস্থ সমস্ত ক্রিমি বিনষ্ট হয় (আজকালকার দিনে ১ তোলা দিলে অতিমাত্রা হয়; মাত্রা শেষে দেখুন)। রেচকত্ব হেতু ইহা গুল্ম, জলোদর, বাতোদর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুল্মাদি রোগে ইহার সহিত কোনও ক্ষার বস্তু মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার হয়।

ইহা শ্লোকে 'মেহনাশক' বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কিরূপ মেহনাশক?

(১) বিষাক্ত মেহের প্রথমাবস্থায়, ইহা দ্বারা ঈষৎ পরিমাণে মলভেদ করাইলে, সঞ্চিত দোষের নির্গমন হেতু ও ইহার বিষনাশকগুণে উপকার পাওয়া যায়। (২) ইহা মূত্রাঘাত রোগে উপকারী; উদরস্থ হইলে, মলভাণ্ডে বেগ উৎপন্ন করিবার সম-সময়ে, ইহা মূত্রাশয়েও প্রতিঘাত দিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহার মূত্রনিষ্কাশন শক্তিও দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, উহাতে সোরা প্রভৃতি মূত্রকারক উপকরণ মিশাইলে, উক্ত শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (৩) যদি কোষ্ঠবদ্ধতা ও যকৃতের দোষে ক্ষারমেহ (ফস্ফেট নির্গম) বা লালামেহ উৎপন্ন হয়, তবে ইহার প্রয়োগে উক্ত দোষ নিবারিত হইয়া ফল দর্শাইয়া থাকে। এই রোগে আমলকীর জল অনুপান দেওয়া শ্রেয়ঃ।

ইহা অশ্মরীনাশক,—মূত্রনালীতে প্রতিঘাত দিবার শক্তি আছে বলিয়াই, ইহা পাথরী বাহির করিতে সমর্থ; কিন্তু পাথরী বড় হইলে, ইহা দ্বারা ফল দর্শায় না। কুলত্থকলায়ের ক্কাথের সহিত কমলাগুঁড়ি দিলে ইহার অশ্মরী-নাশক শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

চরক সূত্রস্থানে বলিয়াছেন—কমলা গুঁড়ি, তুঁতে, হরিদ্রা, হীরাকস, গন্ধক, ধুনা, মনঃশিলা ও করবীর ছাল চূর্ণে, সর্ষপ তৈল মাখাইয়া গায়ে দিলে কুষ্ঠ কণ্ডু ব্রণ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

কমলা গুঁড়ির মাত্রা—দেড় আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত। সাধারণতঃ ৵৹ আনা সেবনে দু' তিন দাস্ত হয়। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে ⁄৹ আনা দিলেই যথেষ্ট। অনুপান গরম জল।

শাস্ত্রীয় ধান্বন্তর ঘৃতে, ভাবপ্রকাশ-ধৃত মেহের কম্পিল্লাদি চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধে কমলাগুঁড়ি আবশ্যক হয়।

কমলালেবু।

বাঙ্গালা নাম—কমলালেবু; হিন্দী—মিঠানিমু; ইংরাজী—Orange. সংস্কৃত নাম—মিষ্টনিম্বু, নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বক্‌সুগন্ধ, মুখপ্রিয়। ইহার গাছ প্রায় বাতাবীলেবুর মত উচ্চ হয়, পাতা সাধারণ লেবুপাতার মত। ফল অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন। গাছ অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচে। শুনা যায়

একটী কমলাগাছ, পাঁচশত বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। ইহা উচ্চে প্রায় ৩৩ হাত এবং গুঁড়ী প্রায় ৮ হাত বিস্তৃত হয়। এক একটী গাছে ৫০০ হইতে ৬০০০ ফল ধরিতে দেখা যায়। কমলালেবু নাম হইল কেন বলিয়া মতভেদ আছে। কেহ বলেন, আসামে কমলা নদীর তীরে বহুল পরিমাণে জন্মে, তজ্জন্য এই নাম। কেহ বলেন, ত্রিপুরার রাজধানী 'কমিল্লা' হইতে প্রথম আনীত হওয়ায় এরূপ নাম। কাহারও অনুমান, কমলা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর বর্ণের ন্যায় বর্ণই এই নামের কারণ। এ দেশে নারেঙ্গা বলিলে অন্য এক প্রকার অম্লমধুর লেবুকে বুঝায়। কিন্তু ভাবমিশ্র নারঙ্গ (নাগরঙ্গ) শব্দে কমলাকেই অভিপ্রেত করিয়াছেন। কমলালেবুর প্রধান জন্মস্থান, নেপাল, সিকিম, শ্রীহট্টের খাসিয়া-পর্ব্বতাঞ্চল, নাগপুর ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চল। নাগপুরী কমলা, গ্রীষ্মকালেও কলিকাতায় পাওয়া যায়; উহা অত্যন্ত মধুর, অম্লরস নাই বলিলেই হয়। দার্জ্জিলিঙ্গে ছোট ছোট এক জাতীয় কমলা হয়, তাহা বেশ সুমিষ্ট। দূর-দেশান্তরে বলিয়া, আমরা শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত কমলা খাইয়া ফলের কত প্রশংসা করি, কিন্তু ফলের জন্মস্থানে গাছ-পাকা ফল যিনি আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি যৎপরোনাস্তি প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছেন। গাছ-পাকা ফল দুগ্ধের সহিত খাওয়া যায়, দুগ্ধ নষ্ট হয় না। এই ফলের বিশেষত্ব এই যে, ইহার আদি জন্মস্থান ব্যতীত অন্যত্র রোপণ করিলে, প্রায় সাধারণ অম্ললেবুতে পরিণত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই ফল ভারতবর্ষীয় নহে, চীন বা অন্যদেশ হইতে প্রথম আনীত হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের ধারণা এই—প্রাচীনকালে মধ্যভারত নাগলোক নামে খ্যাত ছিল। এখনও আমরা তাহারই চিহ্নস্বরূপ নাগপুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি নামগুলি দেখিতে পাই। মধ্যভারতকে নাগলোক নামে অভিহিত করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। সংস্কৃত নাগ অর্থে পর্ব্বত, হস্তী, সর্প ও জাতি-বিশেষের নাম বুঝায়। "অগি সঞ্চলনে" অর্থাৎ অগ ধাতুর অর্থ সঞ্চলন, 'ন' ও 'অগ' এই দু'এর যোগে 'নাগ' শব্দের উৎপত্তি। যাহা সঞ্চলন করে না, মূল শব্দার্থ হিসাবে তাহাই প্রথম নাগ নামের যোগ্য। পর্ব্বত সঞ্চলন করে না, তাই পর্ব্বতের আর এক নাম নাগ। হস্তী ও সর্প প্রভৃতি পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রধানতঃ বিচরণ করে বলিয়া উহারাও ক্রমে পর্ব্বতের নামে নাগ নাম প্রাপ্ত

হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যে জাতি, মধ্যভারতের অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্যপ্রদেশে হস্তী ও সর্পের ন্যায় বিচরণ করিত, তাহারাও নাগ নামে খ্যাত না হইয়া যায় নাই। মধ্য-ভারত প্রধানতঃ পার্ব্বত্যপ্রদেশ বলিয়া নাগলোক, মধ্য-ভারত সর্প ও হস্তীর আবাসভূমি ছিল বলিয়া নাগলোক, আবার ঐ স্থান পার্ব্বত্য নাগজাতির আবাসভূমি ছিল বলিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের নিকট নাগলোক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নাগলোকে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু জন্মে বলিয়াই, ঋষিরা কমলালেবুর নাম 'নাগরঙ্গ' দিয়াছেন। নাগলোক রঞ্জিত করিয়া থাকে বলিয়াই 'নাগরঙ্গ' নাম হইয়াছে। এক্ষণেও সেই পুরাকালের ন্যায় নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশ, নাগরঙ্গের স্বর্ণবর্ণে শোভান্বিত হইতে দেখা যায়।

ভারতের মধ্যপ্রদেশের ন্যায়, ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল আসাম প্রদেশও কেবল যে কমলালেবুর জন্য সুপ্রসিদ্ধ তাহা নয়। আসামভূমি নাগপুর প্রদেশের ন্যায় পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া এবং হস্তী, সর্প ও নাগজাতির নিবাসস্থান বলিয়াও সুপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন পৌরাণিক নাগজাতির অবশেষ (আমাদিগের বিশ্বাস) এখনও ভারতে নাগজাতিরূপে বিদ্যমান। খুব সম্ভব জনমেজয়ের নাগযজ্ঞের পর, অবশিষ্ট নাগকুল, আসামের অরণ্যসঙ্কুল গিরি গুহায় পলায়ন করিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, ভারতের যে যে অংশে নাগেরা প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেই সেই অংশ নাগরঙ্গের রঙ্গক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যেমন আমাদের দেশে ইংরাজ জাতির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের উদ্যানে বিলাতী তরুলতাও রোপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ সম্ভবতঃ নাগেরা যে দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দেশে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্মভূমির 'নাগরঙ্গ' রোপণ করিতে ভুলে নাই।

মিষ্টনিম্বুফলং স্বাদু গুরু মারুতপিত্তনুৎ।
গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্তহৃৎ।
শোষারুচি তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিহরং বল্যঞ্চ বৃংহণম্॥ ভাঃ প্রঃ।

রস—অম্লমধুর; বিপাক—অম্ল; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—গুরু, বায়ু ও পিত্তনাশক, কফের উদ্রেক ও নিঃসরণকারী, রক্তস্রাব নাশক, ক্ষয়, অরুচি, তৃষ্ণা ও বমিনাশক, বল ও পুষ্টিকর। প্রভাব—বিষদোষ নাশক

(বিষ শরীরস্থ হইয়া অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনা জন্মাইলে, ইহার রসপানে উহার উপশম হয়)।

নারঙ্গো মধুরাম্লঃ স্যাৎ দীপনং বাতনাশনম্।

কমলালেবু মধুরাম্ল, অগ্নিদীপক, ও বায়ুনাশক।

মধুরং কিঞ্চিদম্লঞ্চ হৃদ্যং ভক্তপ্ররোচনম্।

দুর্জ্জরং বাতশমনং নাগরঙ্গফলং গুরু ॥ (চরক)

নাগরঙ্গ মধুর, কিঞ্চিৎ অম্ল, অন্নে রুচিজনক, অধিক খাইলে জীর্ণ হয় না, বায়ুনাশক ও ঈষৎ গুরুপাক।

কমলালেবু প্রধানতঃ চারি প্রকারের আছে; যথা—মোগলাই, কেওনলা বা নারিঙ্গী, লালকমলা, মান্দারিন্।

মোগলাই—ইহার ছাল বড় পরিষ্কার, দেখিতে একটু বড়, পীতাভ, ত্বক্ অত্যন্ত আল্‌গা একটু টানিলেই উঠিয়া পড়ে। এই লেবুর জন্মস্থান নাগপুর, দিল্লী, আল্‌বার, গুরগাঁও, লাহোর, মুলতান, পুনা, মান্দ্রাজ, কুর্গ, শ্রীহট্ট, ভোটান্, নেপাল ও সিংহল। এই সব দেশে ইহার রীতিমত চাষ হয়।

কেওন্‌লা—মোগলাই অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মে। এই জাতীয় লেবু যত্নপূর্ব্বক আবাদ করিলে, ভারতের সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হইতে পারে।

লালকমলা—(Malta orange) এখন হিমালয় ও দারজিলিঙ্গে যে সবুজ রঙ্গের কমলা হইতেছে, তাহা এই কমলারই অবনতি মাত্র। এই কমলা খুব সুস্বাদু। গুজরানবালায় এই জাতীয় এক প্রকার কমলা জন্মে, উহা খাইতে বড় সুস্বাদু, এ জন্য ইহা ইংরাজের অতি প্রিয়; তাঁহারা ইহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কমলা বলিয়া সমাদর করিয়া থাকেন।

মান্দারিণ—দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, বর্ণ প্রায় লালকমলার ন্যায়, খাইতে ভাল। এই কমলার একটু গুণাধিক্য এই যে, সকল প্রকার কমলা অপেক্ষা ইহার পাতায় ও ফলে সদ্‌গন্ধ অধিক। ইহা চীন হইতে আসিয়া গিরি পর্য্যন্ত পার্ব্বতীয় ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয়।

প্রয়োগ—কমলালেবুর প্রধান প্রয়োগ কি? তিন চারি মাস পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য রসনার সহিত তাহার পরিচয় করণ। যেহেতু, শীতের কয়েকটী দিন ভক্তদিগকে মজাইয়া, সহসা তাহার অন্তর্ধান হয়। অম্লমধুর কমলালেবুর

রস ভক্ষণে যকৃতের ক্রিয়া যথাবৎ পরিচালিত, পিত্তের প্রাবল্য নিবারিত ও বায়ু প্রশান্ত হয়। এতদ্দেশে, কোন কোন কমলালেবু উপর উপর বড় প্রিয়-দর্শন, কিন্তু অভ্যন্তরীণ আস্বাদের অম্লাধিক্য হেতু, ক্রেতার অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক হইয়া থাকে। সে গুলি খাইতে হইলে, সৈন্ধব লবণের সহিত খাওয়া উচিত, নতুবা শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইতে পারে। পিপাসাযুক্ত নবজ্বরে, মিষ্ট কমলা-লেবু অবাধে খাইতে দেওয়া যায়; তাহাতে উপকার বই অপকার নাই।

কাজের লোক হইলে, যেমন তাহাকে সকলে নানারূপে খাটাইয়া লয়, কমলালেবু জিনিসটী ভাল বলিয়া নিপুণ গৃহিণী বা পাচিকারা ইহা হইতে নানাপ্রকার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লন। নিম্নে কয়েকটী উল্লিখিত হইতেছে—

কমলালেবুর পোলাও— কমলালেবুর কোয়া একসের, উহার রস আধসের, চিনি আধ পোয়া, চাউল আধসের, ঘৃত এক পোয়া, ছোট এলাচের দানা দুইআনা, দারুচিনি দুই আনা, লবঙ্গ এক আনা, কিস্‌মিস্ আধ পোয়া, বাদাম আধ পোয়া, পেস্তা আধ পোয়া, জাফরান্ চারি আনা, ক্ষীর আধপোয়া, লবণ এক তোলা ও জল একসের; এইগুলি অগ্রে যোগাড় করিবে। তার পর, প্রথমে ছটাকখানেক ঘৃতে বাদাম, পেস্তা ও কিস্‌মিস্‌গুলি একে একে ভাজিয়া তুলিয়া রাখিবে। পরে পাকপাত্রে আধপোয়া ঘৃত চড়াইয়া, তাহাতে গরম মসলাগুলি আধভাজা করিয়া, চাউলগুলি ঢালিয়া দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। দুই একটী চাউল ফুটিতে আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে উহাতে লেবুর রস খাওয়াইতে থাকিবে। রসটা খাওয়ানর পর, গরমজল ও লবণ দিয়া পাকপাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। পোলাওয়ে যেরূপ মৃদুতাপ দিতে হয়, সেই অনুযায়ী মৃদুতাপ দিতে হইবে। চাউল সিদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়া আসিলে, তাহাতে বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, ক্ষীর, লেবুর কোয়া, চিনি প্রভৃতি বাকি উপকরণগুলি অবশিষ্ট ঘৃতের সহিত ঢালিয়া দিয়া অল্পক্ষণ দমে রাখিয়া নামাইলেই কমলালেবুর পোলাও রন্ধন হইল। তবে ইহার লেবু খুব মিষ্ট ও বেশ বড় দেখিয়া কেনা উচিত।

কমলালেবুর অমৃতী—একটী পাত্রে তিনটী হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়া, তিনটী কমলালেবুর রসের সহিত বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া রাখিতে হইবে।

আর, সেই লেবুর খোলাগুলিতে খানিকটা চিনি ঘষিয়া ঘষিয়া বেশ সুগন্ধ হইলে, দেড়পোয়াটাক পুরুসরওয়ালা ঘন দুগ্ধের সহিত মিশাইবে। পরে পূর্ব্বোক্ত মিশ্রিত ডিমের সহিত একটু জায়ফলের গুঁড়া দিয়া, সমস্তটাই একত্র মিশাইবে। পরে, উহা একটা চীনে মাটীর পাত্রে রাখিয়া গরমজলের উপরে স্থাপিত করিয়া ঘন করিবে। ঘন হইলে উহাতে চিনি ছড়াইয়া বোতলে তুলিয়া রাখিবে।

কমলার মেঠাই—একটা লেবুর খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া নরম হইলে সেই খোলাটীর সঙ্গে দেড়পোয়া গরম সর (দুধের) * আধপোয়া চিনি আর চারিটা ডিমের হরিদ্রাংশ একত্রে বেশ করিয়া চট্‌কাইয়া মিশাইয়া লইয়া, একটী চীনে মাটীর পাত্রে (অর্থাৎ জারে) ঢালিয়া ঐ পাত্রটী গরমজলে রাখিয়া উহা ঘন করিয়া লইবে। পরে কুসুম কুসুম গরম থাকিতে সমস্ত লেবুর রসটা উহাতে দিলেই ইহা প্রস্তুত করা হইবে।

কমলালেবুর পিঠা—আধপোয়া দোবরা অর্থাৎ দানাওয়ালা চিনিতে দুটী লেবুর খোসা ঘষিয়া, তার হলুদ অংশটা তুলিয়া ফেলিবে এবং একপোয়া টাট্‌কা সরের মাখন তুলিয়া, লেবু-ঘষা চিনিটা গুঁড়া করিয়া একত্র মিশাইয়া, তাহাতে একটু লবণ, কিঞ্চিৎ ময়দা ও তিন-চারটী ডিমের হরিদ্রাংশ মিশাইয়া রাখিবে। আর অল্প আধপোয়া চিনির রসে লেবুর খোসাগুলি পাক করিয়া থস্তি দিয়া কুচি কুচি করিয়া লইয়া, ডিমের শাদা অংশটার সঙ্গে বেশ করিয়া ফেনাইয়া, সমস্ত পদার্থগুলি একত্র মিশাইয়া, ইচ্ছামত ছাঁচে একটু ঘৃত মাখাইয়া, আন্দাজমত উক্ত মিশ্রিত পদার্থ ঢালিয়া দিবে। তাহার উপর সামান্য চিনি ছড়াইয়া দশ বা বার মিনিট আন্দাজ সময় ঐ ছাঁচ আগুনের আঁচে রাখিলেই পিঠা প্রস্তুত হইল; তখন ছাঁচ হইতে তুলিয়া লইবে।

কমলালেবুর পায়স—এক সের দুধ ঘন করিয়া জ্বাল দিয়া, তাহাতে আধপোয়া চিনি এবং একটু নূতন গুড় বা পাটালী দিবে। দুধ ঘন হইয়া আসিলে, বেশ বড় বড় কমলালেবু পাঁচ ছয়টা ছাড়াইয়া কোয়া বাহির করিয়া কোয়ার দু'ধারের খোলাটা ফেলিয়া দিয়া, আস্ত আস্ত কোয়া

* সর অভাবে ঘন দুধ হইলেও চলিয়া যায়।

উক্ত দুগ্ধে ফেলিয়া দিবে। একটু ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া লইলেই পায়স প্রস্তুত হইল।

কমলালেবুর সরবৎ—আধসের পরিমাণ কমলালেবুর রসে এক ছটাক মিশ্রীচূর্ণ পুনঃ পুনঃ ঝাঁকি দিয়া মিশাইয়া, উহাতে আধখানি পাতি লেবুর রস দিবে। উহাতে বড় এলাচ ১০।১১টা থেঁতলো করিয়া দু'একটী আস্ত সুগন্ধি গোলাপ (অভাবে ১ তোলা গোলাপজল) অর্দ্ধ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা অত্যন্ত শৈত্যকর ও বায়ুনাশক।

শীতের শেষে, কমলালেবু তাহার গায়ের খোলাগুলি মাত্র চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া, প্রায় এক বৎসরের মত বিদায় লয়। শাঁস বা সার অপেক্ষা খোলা চিরকালই হেয় বলিয়া গণ্য। কিন্তু কমলার পক্ষে সে কথা খাটিবে না। ইহার খোলা উদরাময়, অজীর্ণ, উদরাধ্মান, ক্রিমি প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। ডাক্তারেরা এই খোলা হইতে চোয়ান আরক ঐ সব রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কবিরাজগণ শুষ্কখোলার চূর্ণ বা কাথ (মুউরী প্রভৃতি মশলার সংযোগে) প্রয়োগ করেন। খোলায় বেশ একটু সদ্‌গন্ধ ও সুস্বাদ থাকায় ইহা ছোট এলাচ দারুচিনি প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের পাণের মসলার সহিত এক শ্রেণীতে বসিবার বিশেষ অধিকারী। এমন কি, পূর্ব্বোক্ত নাম-জাদা মসলা দিগের অনুপস্থিতিতে পাণের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক একাই আসর জমকাইতে পারেন,—বিশেষ গুণ এই—ইনি সময়ে একটু আদর পাইলে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য ও গৃহস্থপোষানো।

মুষ্টিযোগ—(১) কমলালেবুর খোসাচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, মুউরী, যোয়ান্‌ ও নিষাদল প্রত্যেক সমভাগ, বিটলবণ অর্দ্ধভাগ, পাতিলেবুর রসে মাড়িয়া ৬।৭ রত্তি প্রমাণ বড়ী করিয়া দিনে দু'তিনবার জল সহ সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, পেটফাঁপা, রক্তের দোষ ও অগ্নিমান্দ্য উপশমিত হয়।

(২) কমলার খোসা, জৈত্রী ও দুধের সর একত্র বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে ব্রণোব্রণাদি আরোগ্য হয়। ভারতবর্ষীয় ফার্ম্মাকোপিয়ার মতে, এই খোসা শুধু অগ্নিবর্দ্ধক ও অজীর্ণহর নহে, (তিক্তত্ব হেতু) সাধারণ দুর্ব্বলতায়ও বিশেষ উপকারী।

খোসা ও ফুল হইতে একপ্রকার অতি তরল তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত স্থানে মর্দ্দনে উপকার দর্শায়।

পাতা চোয়াইয়া যে জল পাওয়া যায়, তাহা অর্দ্ধছটাক মাত্রায় প্রয়োগে স্নায়বিক বিকার ও মূর্চ্ছারোগে উপকার দর্শে।

কমলালেবুর সুগন্ধি পাতা চোয়াইয়া একপ্রকার অতীব মনোহরগন্ধযুক্ত তরল তৈল প্রস্তুত হয়। তাহাকে "নিরোলি অয়েল" বলে। আজকালকার বিলাতী বা দেশীয় অধিকাংশ গন্ধ দ্রব্যেই এই তৈলের কিছু না কিছু সংস্রব থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা উহা হইতে 'নিরোলি ক্যাম্ফর' নামক এক প্রকার মহাসুরভি কর্পূর প্রস্তুত করিয়া থাকেন; উহা উদরাধ্মান অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী।

কয়েতবেল।

বাঙ্গালা নাম—কয়েত বা কৎবেল; হিন্দুস্থানী—কোইথ; ইংরাজী—Feronia elephantum. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কপিত্থস্তু দধিত্থঃ স্যাৎ তথা পুষ্পফলঃ স্মৃতঃ। কপিপ্রিয়ো দধিফল স্তথা দন্তশঠোঽপি চ॥ বাঙ্গালা নাম—কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল, দন্তশঠ। ইহার অন্যনাম—গ্রাহী, মন্মথ, দেবপাদাঢ্য, মালূর, মঙ্গল্য, নীলমল্লিকা, চিরপাকী, গ্রন্থিফল, কুচফল, কপীষ্ট, গন্ধফল, দন্তফল, কাঠিন্যফল, করঞ্জফলক।

কপিত্থ বৃক্ষ ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে। প্রায় মনুষ্যের ৩।৪ গুণ উচ্চ হয়। ফল বেলের মত, কিন্তু তদপেক্ষা ছোট ও ধূসর বর্ণ। পাতা অনেকটা কামিনী ফুলের পাতার মত ছোট ও চক্ চকে। ফুল ক্ষুদ্র ও শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ইহার কলিকা আবির্ভূত হইয়া ক্রমে ফলের আকারে পরিণত হয়। শীতকালে ফলগুলি পরিপক্ক হয়। বাহির হইতে সহসা পকাপক কিছু বুঝা যায় না, তবে পক্কাবস্থায় হাতে করিলে হাল্‌কা বোধ হয় ও অভ্যন্তরের শাঁস মেটে-কাল রং হইয়া যায়।

কয়েৎফলের এইটী বড় আশ্চর্য্য-জনক শক্তি এই যে, একটী ফল হাতীর উদরস্থ হইলে উহার সারভাগ অদর্শন হইয়া যায়, এবং অখণ্ডিত গোলাকার

আবরণটী মলের সহিত বাহির হইয়া আইসে। তাই কবির উক্তি—"নির্জ্জগাম যদা লক্ষ্মীঃ গজভুক্তকপিত্থবৎ" অর্থাৎ লক্ষ্মী যখন চলিয়া যান্, তখন হস্তিভক্ষিত কপিত্থের ন্যায়, মানুষ অকস্মাৎ কখন্ কিরূপে অন্তঃসারহীন হইয়া পড়ে, বুঝিতে পারা যায় না।

কপিত্থমামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘু লেখনম্।
পক্কং গুরু তৃষাহিক্কাশমনং বাতপিত্তজিৎ।
স্বাদম্লতুবরং কণ্ঠশোধনং গ্রাহি দুর্জ্জরম্॥

রস—অম্ল মধুর ও ঈষৎ কষায়; বিপাক—অম্ল; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—অপক্কাবস্থায় অধিক কষায়ত্বহেতু মলমূত্রধারক, লঘু, দেহের রসশোষক। পক্কাবস্থায় ঈষৎ গুরুপাক ও দুর্জ্জর, সংকোচক, কণ্ঠশুদ্ধিকর, তৃষ্ণা ও বাতপিত্তনাশক। প্রভাব—হিক্কানাশক।

পক্কং তু শীতলং বৃষ্যং কণ্ঠশুদ্ধিকরং স্মৃতম্।
শ্বাসং ক্ষয়ং রক্তপিত্তং বান্তিং বাতং শ্রমং তথা।
হিক্কাং কাসং নাশয়তি বীজঞ্চ হৃদ্ব্যথাপহম্।
শীর্ষব্যথাং বিষং চৈব বিসর্পং চাপি নাশয়েৎ॥
বীজতৈলং চ তুবরং গ্রাহকং স্বাদু পিত্তনুৎ।
আখোর্বিষং কফং চৈব হিক্কাং বান্তিঞ্চ নাশয়েৎ॥
বিষনাশকরং পুষ্পং পর্ণং বান্ত্যাতিসারনুৎ॥ (নিঃ রঃ)

ইহার পক্ক ফল শীতল, বৃষ্য, কণ্ঠশোধক, শ্বাস ক্ষয় ও রক্তপিত্তঘ্ন, বমি, বাত, শ্রম, হিক্কা ও কাসের উপশমকর। ইহার বীজ হৃদয়-বেদনা, শিরঃশূল, বিষ ও বিসর্প নাশ করে। বীজের তৈল কষায়-মধুর, সংকোচক, মূষিক বিষ নাশক, কফ, হিক্কা ও বান্তি (বমন) প্রশমক। পুষ্প বিষনাশক। পত্র বমি ও অতিসার প্রতিকারক।

প্রয়োগ—ইহার পত্রের রস, পাকাফলের শাঁস, কচি ফলের ক্বাথ ও গাছের ছাল ঔষধার্থ প্রযুক্ত হয়। পাকা ফলের শাঁস ছাড়া পত্রাদি সমস্ত অঙ্গই ন্যূনাধিক কষায়; সুতরাং সংকোচন-উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কচি পত্রের রস ২ তোলা, পরিষ্কার চিনি সহ সেবন করিলে, বমি ও অতিসার নিবারিত হয়। খাঁটী সর্ষপতৈল, দধি, গোলমরিচ চূর্ণ, কাঁচা লঙ্কা, লবণ,

চিনি ও সুপক কয়েতবেলের শাঁস সংযোগে, যে অতি মধুর চাট্‌নী প্রস্তুত হয়, তাহা মুখরোচক ও অন্নে রুচিপ্রদ।

"লাজা কপিত্থ মধু মাগধিকোষণানাম্।
লেহো ধ্রুবং সকল বমি রুচিপ্রশান্ত্যৈ॥"

খই চূর্ণ, কয়েৎবেলের শাঁস, মধু, পিপুল ও মরিচচূর্ণ মিশাইয়া অবলেহ প্রস্তুত করিয়া খাইলে, সকলপ্রকার বমি ও অরুচি উপশমিত হয়।

"হিক্কাঘ্নং মধুসংযুক্তং কাশীশং দধির্নাম চ"

অর্থাৎ কয়েৎবেলের শাঁসের সহিত অল্প হীরাকস মিশাইয়া মধুসহ লেহন করিলে হিক্কা আরোগ্য হয়।

চূর্ণং পঞ্চ কষায়াণাং কপিত্থরসসংযুতম্।
কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ॥

অর্থাৎ পঞ্চ কষায় চূর্ণ (আম জাম প্রভৃতি), কয়েৎবেলের রস ও মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণ হইতে পুঁজাদি নিঃসরণ উপশমিত হয়।

জম্বাম্রপত্রং তরুণং সমাংশং কপিত্থ কার্পাস ফলঞ্চ সার্দ্রম্।
কৃত্বা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং স্রাবাপহং তং প্রবদন্তি তজজ্ঞাঃ॥

কচি জামপাতা, কচি আমপাতা, কয়েৎবেল, কার্পাসফল ও আদা এই সকলের রস (থেঁৎলো করিয়া আগুনে ঝল্‌সাইয়া বাহির করা), মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণের ক্ষত ও পূঁজ পড়া প্রশমিত হয়।

নল্লকী জিঙ্গিনী জম্বু ধবত্বক্ পঞ্চপল্লবৈঃ।
কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্ বিপ্লুতাপহঃ॥

নল, চোরকাঁচকী, জামছাল, ধবছাল এবং আম, জাম, কয়েৎবেল, টাবালেবু ও বেল ইহাদের পত্রের ক্বাথে তৈলপাক করিয়া তুলা সংযোগে যোনিতে প্রবিষ্ট করাইলে, বিপ্লুতরোগ (নিত্য বেদনাযুক্ত যোনিরোগ বিশেষ) আরোগ্য হয়।

কপিত্থক্রমুকাম্লুলং সলাজং শর্করাযুতং।
সপ্তমে শীততোয়েন গর্ভশূল-নিবারণম্॥

সপ্তম মাসে কয়েৎবেল, সুপারি মূল, খই ও চিনি শীতল জলের সহিত সেবন করিলে গর্ভশূল (গর্ভস্রাবের উপক্রমে) নিবারিত হয়।

পত্রৈর্বদর চাঙ্গেরী কাকমাচী কপিথজৈঃ।
শিশোরুগ্রম্যতীসারনাশনং মূর্দ্ধলেপনম্ ॥

কুলপত্র, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েৎবেলপত্র বাটিয়া মূর্দ্ধকে প্রলেপ দিলে শিশুর বমি ও অতিসার নিবারিত হয়।

কপিথবৃক্ষের কাষ্ঠ, গৃহের আসবাব প্রস্তুত করিবার বিলক্ষণ উপযোগী। ইহা হইতে এক প্রকার শুভ্রবর্ণ গঁদ বাহির হয়; উহা বোম্বাই অঞ্চলে আমশূল, মেহ প্রভৃতির ঔষধ রূপে প্রযুক্ত হয়; অথচ কাগজ প্রভৃতি সংযুক্ত করিবার জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

করঞ্জ।

বাঙ্গালা নাম—করমচা, নাটা বা কাঁটা করঞ্জ, ডালকরঞ্জ বা ডহরকরঞ্জ; হিন্দী—করোঁদা, করঁজুবা; ইংরাজী—Carrissa Corandas & Pongamia Glabra. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—(একঃ) করমর্দ্দঃ পাককৃষ্ণঃ করাম্লশ্চ করাম্লকঃ। (অন্যঃ) করঞ্জো নক্তমালশ্চ পূতিকশ্চিরবিল্বকঃ।

এই গাছ পাঁচ প্রকারের আছে—অম্লকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, বিষকরঞ্জ ও মাকড়াকরঞ্জ। প্রথমোক্ত তিন প্রকারই সচরাচর শাস্ত্রোক্ত ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

(১) অম্লকরঞ্জকে সাধারণ ভাষায় করমচা বলে, ইহা অবশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহার গাছ মানুষের মত বা তদপেক্ষা একটু উচ্চ হয়; ডালপালা কণ্টকযুক্ত; পাতা ছোট ছোট, ভিতর-চওড়া দু'দিকে সরু; ফল ছোট নারকেলী কুলের মত, কাঁচায় সবুজ রং, পাকিলে ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গভীর কাল রং হয়। ইহা অত্যন্ত অম্লরসান্বিত।

(২) নাটাকরঞ্জের গাছ লতানো হয়; ভূমির উপরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। পাতা, ডাল, ফল সমস্তই কণ্টকময়। খাট মোটা শিমের মত অথচ ক্ষুদ্র কণ্টকাবৃত ফল হয়, তাহার ভিতরে গোল গোল ক্ষুদ্র কুলের ন্যায় মসৃণ ধূসরবর্ণ কঠিন আবরণযুক্ত বীজ থাকে। ইহার শাঁস অত্যন্ত তিক্ত।

(৩) ডহরকরঞ্জ প্রায় পনর যোল হাত উন্নত হয় এবং গুঁড়ী প্রায় নারিকেল গাছের মত স্থূল হয়; পাতাগুলি পাকুড় পাতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট, ফল কাঁচি বাদামের ন্যায়। সাধারণ করঞ্জের সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। ইহাকে পশ্চিম দেশে মহাকরঞ্জও বলে।

অম্লকরঞ্জের গুণ।

করমর্দ্দফলং চার্দ্রমম্লং পিত্তকফপ্রদম্।
ভেদনং চোষ্ণবীর্য্যঞ্চ বাতপ্রশমনং গুরু।
পক্কমুক্তং হিতং পিত্তে তন্মূলং ক্রিমিনুৎ সরম্॥ (নিঃ ভূঃ)

কাঁচা করমচা অতি অম্ল, কফপিত্তজনক, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য (পিত্তকে বর্দ্ধিত করে এবং সেই বর্দ্ধিত পিত্ত দেহের উষ্ণতা জন্মায়), বায়ুনাশক ও গুরুপাক। পাকা করমচা পিত্তরোগে হিতকর। অম্ল করমচার মূল ক্রিমি নাশক ও সারক।

নাটাকরঞ্জের গুণ।

করঞ্জো জ্বরত্বগ্‌দোষনাশনং দন্তদার্ঢ্যকৃৎ।
কটুকো ভেদন স্তস্য ফলং নয়নপুষ্পহৃৎ। (নিঃ ভূঃ)

নাটার ফল, কচি পত্র বা মূল জ্বরনাশক, চর্ম্মরোগঘ্ন, দন্তের দৃঢ়তাকারক (চূর্ণ করিয়া দাঁত মাজিলে), তিক্তরস, ভেদক, এবং বিশেষতঃ ইহার ফল চক্ষুর ছানির পক্ষে উপকারী।

ডহর করঞ্জের গুণ।

করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যোষ্ণো যোনিদোষহৃৎ।
কুষ্ঠোদাবর্ত্ত গুল্মার্শো ব্রণ ক্রিমি কফাপহঃ॥
তৎপত্রং কফবাতার্শঃ ক্রিমিশোথহরং পরম্॥ (ভাঃ প্রঃ)

ডালকরঞ্জ তিক্ত, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, যোনিরোগহর (ছালের কাথে ধৌতি দ্বারা), কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, ব্রণ, ক্রিমি ও কফনাশক। ইহার পাতা কফ, বায়ু, অর্শ, ক্রিমি ও শোথের প্রতিকারক।

প্রয়োগ—অম্লকরঞ্জ রন্ধন করিলে উৎকৃষ্ট মুখরোচক অম্ল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঔষধপক্ষে ইহা প্রধানতঃ অগ্নিমান্দ্যাধিকারের বটিকা প্রভৃতির

মধ্যে অম্লরসের ভাবনা দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। নাটাকরঞ্জ, আকন্দ, সিজ, সোঁদালপত্র ও জাতীপত্র গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ, ধবল ও উৎকট চর্ম্মরোগ দূরীভূত হয়।

নাটাকরঞ্জ এদেশে জ্বরঘ্ন বলিয়া বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। গৃহের নিকটে এই গাছ থাকিলে গৃহবাসীদিগের জ্বর হইবার আশঙ্কা কম থাকে—এতদূর পর্য্যন্ত লোকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ নাটাবীজের শাঁস ৵০ আনা মাত্রায়, ২।৩ রতি গোলমরিচ চূর্ণের সহিত কিয়দ্দিন সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়। কাঁচা হরিদ্রা ও কচি নাটার পাতা বাটিয়া গায়ে মাখিলে ব্রণ কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ডহরকরঞ্জের প্রয়োগ, শাস্ত্রীয় ঔষধে অপেক্ষাকৃত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কফ ও পিত্তবিকার, পুরাতন জ্বর, চর্ম্মরোগ, বাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। ডহরকরঞ্জ চূর্ণ, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও রূপাভস্ম কাঁসার পাত্রে স্তনদুগ্ধের সহিত লাগাইলে চোখের পাতায় মাংসবৃদ্ধি দূরীভূত হয়।

ডহরকরঞ্জ বীজ, হরিদ্রা, হীরাকস ও হরিতাল মধুসহ মাড়িয়া প্রলেপদিলে অলস (পাঁকুই) রোগ ভাল হয়। করঞ্জবীজ, ত্রিফলা ও নিমপাতা ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া, সেই ঘৃত লাগাইলে শিশুর মলদ্বারের ক্ষত প্রশমিত হয়।

ডহর করঞ্জ, কৈবর্ত্ত মুথা, আপাং মূল, জাতীপত্র ও করবীর মূল এই সমস্ত কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া, মস্তকে মাখিলে টাক রোগ ও খুস্কি আরোগ্য হয়। শুধু করঞ্জবীজ-নিঃসৃত তৈলও চর্ম্মরোগে উপকারী।

ব্যোষং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রে মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ।
ছায়াবিশুষ্কা গুড়িকা কৃতাস্তা হন্যুর্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ডহর করঞ্জ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোঁড়ালেবুর শিকড় জলে মর্দ্দন করতঃ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া রাখিবে। ইহার অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব সহ বিসূচিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

শাস্ত্রোক্ত জ্বরের মৃত্যুঞ্জয় ঘোটক রস গলিতকুষ্ঠারি রস (কুষ্ঠের) পৃথ্বীসার তৈল ও উপদংশের করঞ্জাদ্য ঘৃতে করঞ্জ আবশ্যক হয়।

শক্তি-লীলা-ষট্‌কম্‌।

প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় সভাপণ্ডিত কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ কেশ-বন্ধন-প্রিয় হইলেও কালী কি কারণে কেশবন্ধন না করিয়া 'এলোকেশী' মূর্ত্তি ধারণ করিলেন?" বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সভায় বসিয়া তৎক্ষণাৎ এই মহাভাবপূর্ণ কবিতাটী রচনা করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন :—

দেব্যাঃ কেশচয়ো নিরীক্ষ্য পতিতান্ দেবান্ মুনীন্ পাদয়োঃ
সর্ব্বারাধ্যতয়া চ তত্র পরমোৎকর্ষং বিদিত্বাহপতৎ।
সা কালী চরণং গতস্য শরণং নো বন্ধনং সম্ভবেদ্
ইত্যাবেদয়িতুং ববন্ধ ন হি তং তন্মুক্তকেশী বভৌ॥ (১)

দেব ঋষি আদি যত যে আছে যথায়,
সবাই আসিয়া মার পড়ে রাঙা পায়;
মাথা হতে দেখি কেশ করিল বিচার
চরণ দুখানি মার একমাত্র সার!
কি ফল হইবে আর থাকিয়া মাথায়,
তাই কেশ ছুটে এসে চরণে লুটায়।
যে জন আশ্রয় করে শ্রীপদ মাতার,
এ ভব-বন্ধন কভু নাহি হয় তার;—
ত্রিজগতে এ কথাটী জানাতে সদাই
কেশ না বাঁধেন মাতা;—"এলোকেশী" তাই! (১)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, "কালী উলঙ্গ হইয়া থাকেন কেন?" বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও তদুত্তরে তৎক্ষণাৎ কহিলেন :—

গিরীশে প্রত্যূষে নিশি চ দিবসান্তে চ দিবসে
প্রসূতৌ জন্তূনাং জগতি জনয়িত্রি প্রতিদিনম্।
পরিব্যাপ্তা বস্ত্রাবরণসময়ং নৈব লভসে
ভবত্যা নগ্নত্বং ভগবতি ভবত্যেব সুতরাম্॥ (২)

দিবসে রাত্রিতে পুনঃ প্রত্যূষে সন্ধ্যায়
জগতের মাতা হয়ে, পড়েছ মা! দায়।

প্রসব করিছ কত, সীমা নাহি রয়,
কাপড় পরিতে মাগো ! না পাও সময় !
তাই বলি, ওমা কালি ! ছেলের ন্যায়ায়
উলঙ্গ হইয়া থাক, লজ্জা কিবা তায় ! (২)

ভগবতী দ্বিভুজা না হইয়া দশভুজা হইলেন কেন, ইহার কারণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন :—

পশুপতে রখিলেষু গলেষু সা যুগপদর্পয়িতুং কুসুমস্রজম্।
পরিণয়ে দ্বিভুজা হিমশৈলজা দশভুজা কিমুজায়ত লীলয়া ॥ (৩)

পার্ব্বতী বিবাহ-কালে শিবের গলায়
আহ্লাদে মাতিয়া পুষ্প-মালা দিতে ধায়।
একবারে পঞ্চানন-গলে কি করিয়া
দুটী হাতে মালা দেন, না পান ভাবিয়া।
দ্বিভুজা না থেকে তাই দশভুজা হয়ে,
শিবের গলায় মালা দেন পরাইয়ে ! (৩)

মহাদেব অদ্যাপি ভগবতীর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন ; ইহার কারণ কি, তাহা জানাইবার জন্য কবি কহিতেছেন :—

মাতঃ কালি তবাঙ্ঘ্রিফুল্লকমলং কৈবল্যদং শীতলং
বিন্যস্তোরসি কালকূটকবলজ্বালাপনুত্ত্যৈ হরঃ।
কালগ্রাসবিনাশকারিণি করালাস্যে মহেশপ্রিয়ে
সংপ্রাপ্যাতুলনির্বৃতিং কিমু ভয়াদদ্যাপি তন্নোজ্ঝতি ॥ (৪)

করাল-বদনা কাল-ভয়-বিনাশিনী
মহেশ-মোহিনী মাগো ! পর্ব্বত-নন্দিনী।
হায় কি অপূর্ব্ব তব চরণ-কমল,
একে মুক্তিপ্রদ, তায় পরম শীতল।
তাই মাগো ! মনে মনে বুঝিয়া শঙ্কর,
চরণ দুখানি তব বক্ষের উপর
রাখিয়া, পরম সুখে বিভোর হইয়া
দুর্জ্জয় বিষের জ্বালা গিয়াছে ভুলিয়া।

ছাড়িলে বিষের জ্বালা পাছে বেড়ে যায়,
অদ্যাপি শঙ্কর তাই ছাড়িতে না চায়! (৪)

কালী দন্ত দ্বারা জিহ্বা কাটিয়া এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন কেন, ইহার হেতু দেখাইয়া কবি কহিতেছেন:—

স্বর্গৌকসাং স্তুতিগিরাভিনবেন্দুচূড়বক্ষোঽধিরূঢ়চরণা শরণাগতানাম্।
সংগ্রামমুক্তবসনা দশনাগ্রদষ্টনম্রপ্রসারিরসনাতিত্রিয়েব কালী॥ (৫)

দেবতা-গণের দুঃখ করিতে বিনাশ
অসুর-বধের হেতু করিয়া প্রয়াস,
উন্মত্ত হইয়া কালী করিলেন রণ,
টলিতে লাগিল ধরা অমনি তখন।
হলো আজ সর্ব্বনাশ, ভাবি দিগম্বর
পেতে দেন নিজ বক্ষ ধরার উপর।
চৈতন্য লভিয়া কালী ভাবেন তখন;—
কি করিনু! স্বামি-বক্ষে দিলাম চরণ!
উলাঙ্গ হইয়া পুনঃ পড়িনু হেথায়!
জিব কেটেছেন কালী, তাই ত লজ্জায়! (৫)

কালী স্বীয় কটিদেশে করশ্রেণী ও গলদেশে মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া থাকেন; ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া কবি কহিতেছেন;—

বদন্তং ত্বন্নাম ক্ষণমপি ভজন্তং তব পদে
জপন্তং বা জন্তুং জননি জন্মুরন্তং তব মনুম্।
চতুর্ব্বাহুং কর্ত্তুং কমপি চতুরাস্যং কমপি কিং
করশ্রেণীকাঞ্চীং বহসি বহুমুণ্ডস্রজমপি॥ (৬)

ওমা কালি! তব নাম যে করে স্মরণ,
যে বা সেবে ক্ষণকাল তোমায় চরণ,
যে মন্ত্র জপিলে জন্ম নাহি হয় আর
সে মন্ত্র মুখেতে যায় রহে অনিবার,
হায়রে সংসারে তার নাহি থাকে দুখ,
কারে কর চতুর্ভুজ, কারে চতুর্ম্মুখ!
কটিতটে করশ্রেণী, মুণ্ডমালা গলে
তাই মাগো! ধর তুমি মহা কুতূহলে। (৬)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি. এ।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। } { ১৩০৬, পৌষ।

চরকীয় নীতি।

ন কার্য্যকালমতিপাতয়েৎ—কর্ত্তব্য বিষয়ের জন্য যে কালটুকু নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার অপব্যয় করিও না।

নাপরীক্ষিত মভিনিবিশেৎ—অপরীক্ষিত বিষয়ে অর্থাৎ যে কার্য্যের দোষ বা গুণ, শুভ বা অশুভ পরিণাম অথবা সাধ্যত্ব বা দুঃসাধ্যত্ব বিষয়ে তোমার কিছু জানা নাই, তাহাতে সহসা হস্তক্ষেপ করিও না।

নেন্দ্রিয়বশগঃ স্যাৎ—ইন্দ্রিয়ের বশগামী হইও না; যথাস্থানে যথা-প্রয়োজন পঞ্চেন্দ্রিয় পরিচালনা কর, তাহাতে দোষ নাই; কিন্তু, মনের উপরে আধিপত্য টুকু হারাইয়া, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবিরত স্বয়ং পরিচালিত হইও না। চক্ষুঃ কর্ণ ত্বগাদি কোনও ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তুর যখন রসাস্বাদন করিবে, তখন ইচ্ছামাত্রেই বিরত হইতে পার এই শক্তিটুকু যেন তোমার হাতে থাকে। শক্তিহীনের ন্যায় স্রোতে গা ঢালিয়া দিও না।

ন চঞ্চলং মনোনুভ্রাময়েৎ—মন যখন চঞ্চল হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে নানা দিকে ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন সেই বিভ্রান্ত মনকে যেন সেই সেই দিকে আরও ঠেলিয়া দিও না।

ন বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামতিভারমাদধ্যাৎ—তোমার বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গণের যত টুকু শক্তি, তদতিরিক্ত পরিচালনা দ্বারা তাহাদিগকে অতিভারা-ক্রান্ত করিও না।

ন চাতিদীর্ঘসূত্রী স্যাৎ—মনঃস্থ ও অভিপ্রেত কার্য্যের সম্পাদন-কালকে আলস্যবশতঃ ক্রমেই উত্তরোত্তর ভবিষ্যৎ-গর্ভে ফেলিও না। (ক্রমশঃ)

গাম্ভীর্য্য।

গাম্ভীর্য্য ক্ষুদ্র কীট হইতে অনন্ত প্রকৃতি পর্য্যন্ত সকল বস্তুতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহতের গাম্ভীর্য্য সর্ব্বানুমেয় এবং মানব-হৃদয়ের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তারক; ক্ষুদ্র পদার্থের সামান্য গাম্ভীর্য্যকে তৎপার্শ্ব-স্থিত বহু পদার্থের চঞ্চলতা চঞ্চলতায় পরিবর্ত্তিত করে, মানুষকে সহজে অনুভব করিতে দেয় না।

যখন মধ্যাহ্নে প্রকৃতি গাম্ভীর্য্যের তানে বাঁধা থাকে, জগৎ নিশ্চেষ্ট হয়, সংজ্ঞাযুক্ত হইয়াও অলসতায় বিজড়িত হয়, কর্ম্মশূন্য হইয়া পড়ে; জগতের বৃত্তি নিচয়ের সংযোজক তন্ত্রী পরস্পর পঞ্চমস্বরে থাকিয়া যায় গাম্ভীর্য্যের নিঃশব্দ তালে বাঁধা পড়ে। পক্ষীর অবিরাম নাদী কণ্ঠ, বৃক্ষ পত্রের অবিরাম মর্ম্মর শব্দ—সেই এক তালে বাঁধা। বায়ু নিশ্চল নিঃশব্দ জীবন্মৃত, সূর্য্য ধীরে ধীরে অনন্যমনে আপন পথে, অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের পশ্চাতে তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া চিত্র পুত্তলিকাবৎ—তারাও সেই একতানে বাঁধা। পুষ্প তন্দ্রাভিভূত, স্ফূর্ত্তিহীন, ম্রিয়মাণ। জগতের বৃহত্তম গ্রহ উপগ্রহ হইতে তৃণকোষ মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সেই একতানে বাঁধা পড়িয়াছে। প্রকৃতির জড়তা মনুষ্যের স্বচ্ছচক্ষু মধ্য দিয়া হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, মনুষ্য-প্রাণ সেই তানে বাঁধা পড়ে। ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র চৈতন্য অনন্ত চৈতন্যের সহিত সাম্য রাখে, সম্পূর্ণ উদাসীন হয়, স্রষ্টা ভুলে, সৃষ্টি ভুলে, আপন ভুলে, অপর ভুলে,—গম্ভীর ঔদাসীন্যের ছবি সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

প্রভাতের নবীন সূর্য্য অনুরাগে সোহাগের করে দীর্ঘিকার কমল উন্মেষ করে, তরঙ্গের শীর্ষককে স্বুবর্ণপাতে মুড়িয়া দেয়, জগৎপ্রাণ মনুষ্যপ্রাণে কার্য্যের লহর তুলিয়া দেয়; সান্ধ্য রবি বিদায়কালে আকাশকে অলঙ্কারে সাজায়; প্রভাতের বাতাসও প্রেমিকের মত সোহাগ করে, ফুলের দামের কাছে "ভয় নাই আমি সন্ধ্যাকালে আবার আসিব" বলিয়া আদর করে,

ফুলও সকল ভুলিয়া আদরে পাপ্‌ড়ী ছড়ায়, ফুলের গন্ধ মানুষকে বিলায়, মানুষ হাসে, সে হাসিতে ফুল আরও হাসে, বাতাস একজনের কথা অপরকে বলে, সে কভু কাঁদে, কভু হাসে, বাতাস আপন মনে নিজের খেলায়, একটী লতাকে একটী বৃক্ষে ফেলিয়া দেয়, বৃক্ষ প্রত্যাখ্যান করে, বাতাস ক্রীড়াশীল বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। বাতাস মানুষ নয়, সে তাহার কথা রাখে, সন্ধ্যাকালে আবার আসিল, আবার ফুল হাসিল, আবার মানুষ জুড়াইল, কিন্তু মধ্যাহ্ন সূর্য্যের গম্ভীর ভাবে, বাতাস ফুলের কথা ভুলে যায়, রঙ্গরস ভুলে যায়, সেই গম্ভীর ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ গাম্ভীর্য্যময়।

নিশীথে জগৎ সুপ্ত, মধ্যাহ্নের অলসতায় বিজড়িত নিস্তেজ ভাব নহে, এখন সংজ্ঞাশূন্য তাই নিস্তেজ, মধ্যাহ্নের অলসতায় প্রভাতের কার্য্য-পরম্পরার যে স্মৃতি থাকে এখন সে স্মৃতি পর্য্যন্ত নাই, নিশীথের ভাব অলসভাব নয়, শান্ত। নিশীথকাল চিন্তার প্রশস্ত সময়। চিন্তাবিদগ্ধ প্রাণ পৃথিবী পানে চাহিয়া সর্ব্বত্র শান্তির ছবি দেখে, চতুর্দ্দিক শান্তিময় দেখিয়া নিজ মনের অশান্তি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, চাহিয়া চাহিয়া শান্তিমূর্ত্তি দেখে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়, পুনঃ চিন্তার স্রোত দ্বিগুণবেগে প্রধাবিত হয়, চিন্তার মধ্যে কোনও পদার্থের শান্তিমাখা ছবি দেখিলে বৈষম্য জাগিয়া উঠে; পুনঃ অধীর হয়, অস্থির হয়, অশান্ত হয়। আকাশে তাহার মনের ছবি দেখিতে পায়, ক্ষুদ্রতম জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে বৃহত্তম পর্য্যন্ত স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত, সকলই কর্ম্মযুক্ত, সুতরাং অধীর অস্থির অশান্ত। একটী নক্ষত্র অপরটীর পানে চাহিয়া নেত্রপ্রান্ত সঙ্কুচিত করিতেছে—বুঝি এ প্রেমের দেখা! মনুষ্যপ্রাণ আকাশেও প্রেমের খেলা দেখিয়া নয়ন অপসারিত করে, আর আকাশ পানে চায় না। নিশীথের গাম্ভীর্য্য দেখিলে স্রষ্টার বিরাট মূর্ত্তি মনে পড়ে। কচিৎ শৃগালের ফুৎকারে, ঝিল্লীর আরাবে, পেচকের নাদে এ শান্তির কিছুই অশান্তি হয় না, বিরাট শান্তির তাৎকালিক স্থিরতা হেরিয়া জাগ্রত অবস্থার স্বপ্ন-দৃষ্ট ভয়ের ন্যায় এই সকল সামান্য উপদ্রবকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

লিখন-পঠনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়, পাতলা কাগজ-পত্রগুলির বায়ুকর্তৃক সঞ্চালন বা অপসারণ নিবারণ-মানসে আমরা তৎসমুদায়ের উপরে

একটী প্রস্তরগোলক অবস্থাপিত করি,—কর্ত্তব্যোন্মুখ মনের পক্ষে গাম্ভীর্য্যও সেই ভার-স্বরূপ। ফলতঃ গাম্ভীর্য্য মনঃক্ষেত্রের বৈষম্য-বন্ধুরতা বিদূরিত করিয়া চিত্তকে সচ্চিন্তা, অন্তর্দৃষ্টি, বিবেকিতা, বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণের আবাস-যোগ্য করিয়া তুলে। তাই, কবি বলিয়াছেন—

তরলতা ত্যজি জল বরফ হয়েছে যাই,
অমনি সে শুভ্রবর্ণ আর মলিনতা নাই।
অনায়াসে ভেদ্য ইহা নাহি ত এখন আর,
সংসর্গ হয়েছে এর অতি প্রিয় সুখাধার।
আরো দেখ এবে ইহা জলোপরি ভাসমান,
স্বজাতি-সমাজে যেন পেয়েছে সর্ব্বোচ্চস্থান,
"এক তরলতা গেলে এত গুণ ক্রমে আসে"
বরফ হইয়া, জল তাই যেন উপদেশে॥ শ্রীএককড়ি দে।

স্বামী ও স্ত্রী।

সরসী রূপিণী নারী,
স্বামী তায় ফুটিত কমল।
আকাশের চাঁদ সে গো,
স্বামী তার চন্দ্রিকা বিমল॥ (১)

প্রফুল্ল-প্রসূন নারী,
স্বামী তার আলো করা হাসি।
সোণার প্রদীপ সে গো,
স্বামী তার স্নিগ্ধ তেজোরাশি॥ (২)

মৃতদেহ সম নারী,
স্বামী তায় জীবন যৌবন।
শুক্তিসম নারী হায়,
স্বামী তায় মুকুতা রতন॥ (৩)

এ বিশ্ব মাঝারে সতী, পতি-পদ-সার।
পতি বিনা অন্য গতি নাই অবলার॥ (৪)

শ্রীচারুচন্দ্র রায়।

দ্রব্যগুণ বিচার।

করবীর।

বাঙ্গালা নাম—করবী; হিন্দী—কনৈলী বা কনের; ইংরাজী—Nerum odorum. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শতকুম্ভো হশ্বমারকঃ। দ্বিতীয়ো রক্তপুষ্পশ্চ চণ্ডাতো লগুড় স্তথা। সংস্কৃত নাম—করবীর, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ, অশ্বমারক; অন্যনাম—প্রতিহাস, প্রচণ্ড, বীর, কুন্দ, স্থলকুমুদ. দিব্য-পুষ্প, হরিপ্রিয়, গৌরীপুষ্প।

করবীর গাছ অনেকেই দেখিয়াছেন; যেহেতু, ইহার পুষ্প নয়ন-রঞ্জক বলিয়া অনেকেই বাড়ীর পার্শ্বে বা বাগানে রোপণ করিয়া থাকেন। এই গাছ মানুষের অপেক্ষা কিছু উচ্চ হয়, ডাল লম্বা লম্বা, পাতা সরু ও দীর্ঘ। পুষ্পের বর্ণভেদে ইহা পাঁচপ্রকারের আছে; শাস্ত্র বচন যথা—"হয়ারিঃ পঞ্চধা প্রোক্তঃ শ্বেতো রক্তশ্চ পাটলঃ। পীতঃ কৃষ্ণঃ সমুদ্দিষ্টঃ শ্বেতস্যৈতান্ গুণান্ শৃণু॥" শ্বেত, লোহিত, পাটল, পীত ও কৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত এই পঞ্চপ্রকারের মধ্যে পাটল ও কৃষ্ণবর্ণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বৃক্ষ সপ্ত উপবিষের মধ্যে একতম, তীক্ষ্ণতায় ধুস্তুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন। শ্বেতকরবীর গুণ—

কটুস্তিক্তশ্চ তুবর স্তীক্ষ্ণো বীর্য্যেণ চোষ্ণদঃ।
ব্রণলাঘবকৃন্নেত্রকোপ কুষ্ঠ বিষাপহঃ।
কফার্শঃ ক্রিমিকণ্ডুঘ্নো ভক্ষিতো বিষবন্মতঃ।
রক্তবর্ণঃ শোধকঃ স্যাৎ কটুঃ পাকে চ তিক্তকঃ॥
কুষ্ঠাদি নাশকো লেপাদথ পাটলবর্ণকঃ।
শীর্ষপীড়াং কফং বাতং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতঃ॥
রক্তাদেশ্চতুরো ভেদান্ বিদ্যাৎ শ্বেতহয়ারিবৎ॥

(শ্বেতকরবীর) রস—কটুতিক্ত কষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—তীক্ষ্ণ; গুণ—দেহের উত্তাপজনক, ব্রণশোধক, কুষ্ঠঘ্ন, বিষহর, কফ ক্রিমি ও কণ্ডু-নাশক, উদরস্থ হইলে বিষবৎ কার্য্য করে। প্রভাব—নেত্রকোপহর ও

অর্শোনাশক। ইহা ক্রিমিনাশক উক্ত হইল, অথচ ভক্ষণেও বিষক্রিয়া করে,—ইহার মীমাংসা কি? ক্রিমি রোগাধিকারের শাস্ত্রোক্ত ঔষধ সমুদয় দেখ,—দেখিবে, কয়েকটার মধ্যে (কুঁচলে ও মনঃশিলা প্রভৃতি) বিষের প্রয়োগ আছে। এইরূপ করবীর-বিষও ক্রিমিনাশক; কিন্তু, লৌকিক ব্যবহার ধরিতে গেলে, উদরস্থ ক্রিমিনাশের জন্য এই বিষ সেবন না করাই ভাল; যেহেতু, ক্রিমির অন্যান্য মৃদু ঔষধও ত আছে। বাহ্যক্রিমি (অর্থাৎ ক্ষতের ভিতরে যে গুলি জন্মে তাহাদের) বিনাশের জন্য ইহার প্রলেপ বিশেষ উপকারী অথচ আশঙ্কাহীন, সুতরাং এস্থলে ক্রিমিহর অর্থে বাহ্যক্রিমিহর বুঝাই উচিত।

লোহিতবর্ণ করবীর—মলভেদক ও বমিকারক; ইহা তিক্তরস ও পাকে কটু। ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগের উপযোগী নহে, কেবল বাহ্য প্রলেপে কুষ্ঠাদি নাশক হইয়া থাকে।

পাটলবর্ণ করবীর—শিরঃপীড়া নাশক ও কফবাতঘ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংক্ষেপে, লোহিতাদি চারিপ্রকার করবীরেরই গুণ প্রায় শ্বেতকরবীর তুল্য। বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে যেখানে শুধু করবীর লিখিত আছে, সেখানে শ্বেতকরবীরই বুঝিতে হইবে।

একটী বিবেচ্য কথা—বঙ্গদেশে 'কল্‌কে ফুল' বা 'ঘণ্টাকরবী' নামে যে এক প্রকার বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তাহার পাতা করবীর পাতারই মত। গাছ অপেক্ষাকৃত বড় ও বিস্তীর্ণ হয়; ফুল সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ, দেখিতে ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা কল্‌কের (হুঁকার উপরিস্থ কল্‌কের) ন্যায়। এই বৃক্ষের ডাল পাতা মূল প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গই বিষাক্ত; বিশেষতঃ, ইহার ফল অধিকতর বিষাক্ত। ফলগুলি দেখিতে অনেকটা ত্বক্‌বর্জ্জিত শৃঙ্গাটকের (পানিফলের) তুল্য। আয়ুর্ব্বেদে এই বৃক্ষের পৃথক্ উল্লেখ না থাকায় এবং ইহার করবীর সহ আকৃতি ও বিষাক্ততা বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায়, আমাদের বিশ্বাস—উদ্ধৃত শ্লোকে যে পীত করবীরের উল্লেখ আছে, তাহা ইহাই—অন্য কিছু নহে। এই বৃক্ষের ফল অত্যন্ত বিষাক্ত; ইহার মূলের ছাল ক্ষতরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগ—সকলপ্রকার করবীর মূল, ছাল এবং পত্র (কখন কখন পুষ্পও) ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার যত শক্তি উল্লিখিত হইয়াছে,

তন্মধ্যে কুষ্ঠহর শক্তিই প্রধান। ইহা আভ্যন্তর ও বাহ্য এই উভয় প্রয়োগেই কুষ্ঠাদি নানাপ্রকার অত্যুৎকট চর্ম্মরোগের প্রতিকারী। ইহার দ্বিতীয় শক্তি জ্বরনাশন। তৃতীয় বাতব্যথা, ব্রণশোথ ও নেত্রকোপন প্রশমন।

ক্ষতনাশক মুষ্টিযোগ—শ্বেতকরবীর শিকড়, ধুনাচূর্ণ, মেটে সিঁদুর, নিমপাতা ও কর্পূর একত্রে তাম্রপাত্রে ঘৃতসহ সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে, নানাপ্রকার দূষিতপচা ঘা, এমন কি গরমী ঘাও আরোগ্য হয়। শ্বেতকরবীর মূলের রস ১৬ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৬৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা দধি প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ দধি মন্থন পূর্ব্বক নবনীত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে, বহুকালীয় দুঃসাধ্য ক্ষতও বিশুষ্ক ও দূরীভূত হয়।

করবীরের ডালে সাবধানে (অর্থাৎ ঢোক না গিলিয়া) দাঁতন করিলে, মুখরোগ ও দন্তরোগ আরোগ্য হয়; শাস্ত্রোক্তি যথা—

"করঞ্জ করবীরার্ক মালতী ককুভাশনাঃ।
শস্যন্তে দন্তপবনে যে চাপ্যেবংবিধা দ্রুমাঃ॥"

কুষ্ঠহরযোগ—করবীরছাল চূর্ণ, মনঃশিলা ও হরিতাল একত্র ঘৃতসহ মাড়িয়া প্রলেপ দিবে। জ্বর নাশক যোগ—শ্বেতকরবীর ছাল চূর্ণ ও শোধিত মনঃশিলা সমভাগে বকফুলের রসে মাড়িয়া, মটর প্রমাণ বড়ী করিয়া খাওয়াইলে, পালাজ্বর ও কম্পজ্বর আরোগ্য হয়।

বাতহর মুষ্টিযোগ—করবীর পাতা সৈন্ধবসহ বাতের ফোলার উপরে প্রলেপ দিলে উহার উপশম হয়। এবং শ্বেত করবীর ছাল চূর্ণ অকিন্দের আঠায় মাড়িয়া, মটর প্রমাণ বড়ী করিয়া, আধ ছটাক গরুর চোণাসহ নিত্য প্রাতঃকালে গিলিয়া খাইলে, বাত উপশমিত হয়। নেত্রকোপ নাশক প্রক্রিয়া—চোখের মধ্যে রক্তাচ্ছন্ন স্ফীতি, প্রদাহ বা ক্লিন্নভাব হইলে, শ্বেতকরবীর পাতার রস জল মিশাইয়া চোখে ফোঁট দিলে বিশেষ উপকার হয়।

মাত্রা—শ্বেত করবীর মূলের বা গাছের শুষ্ক ছাল চূর্ণের আভ্যন্তরিক মাত্রা ২ হইতে ৩ রতি পর্য্যন্ত। ইহা হইতে যতই অধিক হইবে, ততই দেহের গ্লানি, অবশেষে অতিমাত্রায় বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়। বাহ্যপ্রয়োগে মাত্রার তারতম্যে হানি নাই, তবে মস্তিষ্কের নিকটবর্ত্তী স্থানে দিতে হইলে, অত্যল্প পরিমাণে লেপ দেওয়া উচিত।

শ্বেতার্ককরবীরঞ্চ অশ্বিন্যাং মূলমুদ্ধরেৎ ॥
তণ্ডুলোদকপানেন পৃথক্ চাতুর্থনাশনম্॥ বৈঃ রঃ

অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দ কিম্বা শ্বেতকরবীর মূল তুলিয়া (কাঁচায় ৬ রতি মাত্রা) চাউনি জল সহ বাঁটিয়া সেবন করিলে, চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয়।

রক্ত করবীর পুষ্পং জাত্যাশ্চথাশন মল্লিকাশ্চ।
এতৈঃ সমস্তৈস্তৈলং নাসার্শোনাশনং পক্কম্ ॥

অর্থাৎ লাল করবীর ফুল, জাতিফুল, অশনপুষ্প ও মল্লিকাপুষ্প প্রত্যেক ১ তোলা, তৈল এক পোয়া, যথাবিধি পাক করিয়া নস্য লইলে নাসার্শঃ (Polypus) উপশমিত হয়। এরূপ লৌকিক বিশ্বাস আছে—শ্বেত করবীর ডালের লাঠী প্রস্তুত করিয়া হাতে করিয়া বেড়াইলে সর্পভয় থাকে না।

শ্বেতকরবীর মূল যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইলে গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়।

সন্নিপাত-জ্বরের "ত্রৈলোক্যচিন্তামণি" গলগণ্ডের "গুঞ্জাদ্যতৈল" ভগন্দরের "করবীরাদ্য তৈল" কুষ্ঠের "বিষতৈল" "মরিচাদি" "সোমরাজী" ও "করবীর তৈলে" করবীর আবশ্যক হয়।

করলা।

বাঙ্গালা নাম—করলা বা করেলা, উচ্ছে; হিন্দী—করোলী; ইংরাজী Momardica Charansia. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ। সংস্কৃত নাম—কারবেল্ল, কঠিল্ল। অন্যনাম—কঠিল্লক, সুষবী, শুষবী, কারবেল্লক, উদ্ভাসিত, তোয়বল্লী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, নাসাসংবেদন, পটু। ক্ষুদে উচ্ছের সংস্কৃত নাম—কারবেল্লী। ইহা সচরাচর 'উচ্ছে' নামেই প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ "পুটলে উচ্ছেও বলিয়া থাকে।

উভয় প্রকার উচ্ছেই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। করলা উচ্ছে সচরাচর ১০।১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইয়া থাকে। উর্ব্বরা ভূমি হইলে ১৭।১৮ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু, খুদে উচ্ছে প্রায়ই ৩।৪ আঙুলের বড় হয় না।

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডু মেহ ক্রিমীন্ হরেৎ॥
তদ্‌গুণা কারবেল্লী স্যাদ্ বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ॥ ভাঃ প্রঃ॥

(করলার) রস—তিক্ত; বিপাক—কটু; বীর্য্য—শীত; গুণ—কফপিত্ত নাশক, বায়ুর অবিরোধী, লঘু, জ্বর পাণ্ডু ও ক্রিমি (তিক্তত্বহেতু) নাশক। প্রভাব—ভেদক, মেহ নাশক। উচ্ছের গুণাদি করলার ন্যায়; বিশেষতঃ, ইহা অগ্নিদীপক ও করলা অপেক্ষাও লঘু।

প্রয়োগ—করলা উচ্ছে ও গুঁটে উচ্ছের মূল, পাতা, ফল, ফুল প্রভৃতি সমস্তই ঔষধ বা পথ্য রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফল—উৎকৃষ্ট তরকারী; তিক্ত বলিয়া সকলের প্রিয় না হইলেও ইহার কফপিত্ত নাশক, রুচি ও বলকারক গুণ থাকাতে, জ্বরান্তে দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার ফুল—ধারক ও রক্তপিত্ত নাশক। রক্তপিত্তরোগে ঘৃত সৈন্ধব যুক্ত করলা ফুলের তরকারী খাওয়ার ব্যবস্থা করিলে পথ্য ও ঔষধ উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

উচ্ছেপাতার রস আধছটাক, একটু গরম করিয়া ／০ আনা বিট্‌লবণ সংযোগে পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। শুষ্ক লতার প্রলেপে ক্ষত শীঘ্রই আরোগ্য হয়। নিমপাতার অভাবে ইহার শুষ্ক পাতালতা-সিদ্ধ জলে ঘা ধোওয়ান চলিতে পারে। পাতার রস জ্বরঘ্ন। কবিরাজগণ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে অন্য ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন জ্বরেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অনেক পালাজ্বরের ঔষধে ইহার রসের ভাবনা আবশ্যক হয়।

"সুষবীমূললেপেন প্রবিষ্টা তু বহির্ভবেৎ।"

অর্থাৎ করলার মূল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয়।

সুষবী পত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণ সংযুতম্।
রোমান্তী জ্বর বিস্ফোট মসূরী শান্তয়ে পিবেৎ॥

করলা পত্রের রস, হরিদ্রাচূর্ণ সহ সেবন করিলে, হামজ্বর, বিস্ফোট ও বসন্ত উপশমিত হয়।

স্থবরীপত্র পত্তূর কর্ণমোট কুঠারকাঃ।
পৃথগেতে প্রলেপেন গম্ভীরব্রণরোপণাঃ॥

করলা পাতা, শাঁলিঞ্চশাক, কর্ণমোট ও কুঠারক এই কয়েটীর কোন একটী বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই ব্রণ আরোগ্য হয়।

নবজ্বরের বৈদ্যনাথ বটী, জীর্ণজ্বরের শীতারি রস, বিদ্যাবল্লভ রস, প্রভৃতি ঔষধে উচ্ছে পাতার রসের প্রয়োজন হয়।

কচূর।

বাঙ্গালা নাম—কচূর বা শঠী; হিন্দী—কচূর; ইংরাজী—Curouma Gedoaria; সংস্কৃতঃপর্য্যায়ঃ—কচূরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী। সংস্কৃত নাম—কচূর বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক, শটী। অন্য নাম—কর্শ্য, কার্শ্য, দুর্লভ, গন্ধমূলক, গন্ধসার, জটাল।

ইহা একপ্রকার আর্দ্রক জাতীয় গাছের মূল। মৃত্তিকামধ্য হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ধুইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ বণিকের দোকানে রক্ষিত হয়।

কচূরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ।
সুগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্যাৎ কুষ্ঠার্শো ব্রণ কাসনুৎ।
উষ্ণো লঘুঃ হরেচ্ছাসং গুল্ম বাত কফ ক্রমীন্॥ ভাঃ প্রঃ।
রোচনো দীপনো হৃদ্যঃ সুগন্ধিস্তগ্বিবর্জ্জিতঃ।
কচূরঃ কফবাতঘ্নঃ শ্বাস হিক্কার্শসাং হিতঃ॥ চরক।

রস—কটু তিক্ত; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—অগ্নিদীপক, রুচিকারক, লঘু, সুগন্ধি, বাতশ্লেষ্মহর, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও ক্রিমিরোগ নাশক। ইহা শুণ্ঠীর সমগুণ। প্রভাব—কুষ্ঠ, অর্শ ও গুল্ম নাশক।

প্রয়োগ—ইহা প্রাধানতঃ কাসরোগে ও বাতব্যাধির নানাবিধ তৈলে, জ্বর ও অন্যান্য অনেক রোগের পাচনাদিতে এবং গৃহস্থগণ কৃত সাধারণ সুগন্ধি তৈলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কর্ণিকার।

বাঙ্গালা নাম—কর্ণিয়ার বা ছোট সোঁদাল; হিন্দী—লঘু বাহবা; ইংরাজী—Species of Cassia; সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি।। সংস্কৃত নাম—কর্ণিকার, পরিব্যাধ, পাদপোৎপল। অন্য নাম—দ্রুমোৎপল, বৃক্ষোৎপল। ইহা একপ্রকার সোঁদালজাতীয় বৃক্ষ, পুষ্পপত্রাদি অপেক্ষাকৃত ছোট, বৃক্ষও সাধারণ সোঁদাল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্তস্তুবরঃ শোধনো লঘুঃ।
রঞ্জনঃ সুখদঃ শোথশ্লেষ্মাস্র ব্রণ কুষ্ঠজিৎ॥ ভাঃ প্রঃ।

রস—কটু তিক্ত কষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—কফনাশক, লঘু, রঞ্জন, সুখসেব্য, শোথনাশক। প্রভাব—মলশোধক, ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তগত রোগনাশক।

প্রয়োগ—সোঁদালের ন্যায়; কালিদাসকৃত গ্রন্থে ইহার পুষ্প সাতিশয় প্রিয়দর্শন বলিয়া বর্ণিত আছে; সাধারণ ঔষধাদিতে ইহার প্রয়োগ কম।

কর্দ্দম।

বাঙ্গালা—কাদা; হিন্দী—কাদো; ইংরাজী—Clay; সংস্কৃত—কর্দ্দমঃ পঙ্কঃ মৃদ্ ইত্যাদি।

মৃত্তিকা জল-মিশ্রিত ও মর্দ্দিত হইলেই কর্দ্দম হয়, কিন্তু এস্থলে ঔষধ-শক্তিধারী যে কর্দ্দমের উল্লেখ হইতেছে, তাহা ঐরূপ অবস্থাপন্ন মৃত্তিকা পর্য্যুষিত (বাসী) হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দিনে সূর্য্যকিরণ ও রাত্রে চন্দ্র-রশ্মির বিকীরণ হেতু উহাতে গুণান্তর উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক ভেদে কর্দ্দম দুই প্রকারে উদ্ভূত হয়। প্রথম, মনুষ্যকর্ত্তৃক জলক্ষেপ ও হস্তালোড়ন দ্বারা যে কোনও ঋতুতে উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয়, বর্ষাকালে ধরাতলে বৃষ্টিপাত ও তদুপরি গো-মনুষ্যাদির পদ নিপীড়ন দ্বারা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শেষোক্ত কর্দ্দমেই ঔষধীয় শক্তি অধিক আছে। মৃত্তিকা-শব্দ চলিতভাষায় তুচ্ছতাসূচক; এরূপ লৌকিক উক্তি প্রচলিত আছে—"কার্য্য মাটী হইল বা

মাটীর দরে পাওয়া"; সুতরাং "মাটীতে ঔষধীয় শক্তি," একথা শুনিলে সহসা বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, যে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া অগণিত উদ্ভিজ্জাদি নিজ নিজ অপূর্ব্ব শক্তিনিচয় সংগ্রহ করিতেছে তাহাতে শক্তির অভাব কেন হইবে? মৃত্তিকা "ক্ষিত্যপ্ তেজো-মরুদ্ব্যোম" এই পঞ্চভূতের অগ্রগণ্য; ইহাতে অন্যান্য ভূতের অংশও আছে—সোজাকথায় মাটিতে জল, তেজঃ, মরুৎও রহিয়াছে। পাশ্চাত্যমতে—এক মৃত্তিকা ভিন্ন চারিটীর অধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে গঠিত পদার্থ অতীব বিরল। উক্ত মতে, মৃত্তিকার গঠনোপকরণ চতুর্দ্দশটী মৌলিক পদার্থ, তন্মধ্যে আটটী বাষ্পীয় প্রভৃতি নানাবিধাত্মক এবং ছয়টী ধাতব পদার্থ।

কর্দ্দমো দাহপিত্তার্ত্তি শোথঘ্নঃ শীতলঃ সরঃ।

কর্দ্দমের রস—স্থানভেদে মধুর, লবণাক্ত ও কষায় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কষায় বায়ুর, লবণাক্ত পিত্তের এবং মধুর মৃত্তিকা কফের প্রকোপক হইয়া থাকে। উক্তি আছে—"কষায়া মারুতং পিত্ত মূষরা মধুরা কফম্।" বীর্য্য—শীতল; গুণ—দাহ, পিত্তরোগ ও শোথঘ্ন এবং সারক। দাহঘ্ন অর্থাৎ শৈত্যবশতঃ ইহার প্রলেপ দেহগত বা অঙ্গগত জ্বালা নিবারণ করিতে সমর্থ। পিত্তরোগঘ্ন অর্থাৎ ইহার বাহ্যপ্রয়োগ ভ্রাজকপিত্তের প্রশমক বলিয়া তজ্জনিত ব্রণাদি উদ্গম বিদূরিত করে। পুনশ্চ, ইহা "শোথঘ্ন" উক্ত হইয়াছে, তবে কিরূপ শোথের উপকারী? বাতপিত্তজনিত (হস্ত-পদাদির) স্থানিক শোথে প্রলেপ দিলে, দুই কারণে উপকার দর্শায়; প্রথম, ইহা উক্ত দোষদ্বয়ের স্বতঃই প্রশমক; দ্বিতীয়, ইহার প্রলেপ শুষ্ক হইবার কালে সংকোচনক্রিয়া সংঘটিত হয়, তদ্দ্বারা শোথের উপশম হইতে পারে।

মৃত্তিকা যে নানাবিধ উৎকট চর্ম্মরোগের উপকারী, তাহার প্রত্যক্ষপ্রমাণ এই—অনেক বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসান্তে হতাশ হইয়া পরিশেষে তুলসীতলার মাটী বা গঙ্গাতটের মাটী সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে পরিশেষে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। অবশ্য, এস্থলে বিশ্বাস এবং দ্রব্যশক্তি দুইই ধরিতে হইবে।

মাটীর ঈদৃশী শক্তি থাকিলেও অনাবৃত ক্ষতমধ্যে অসাবধানে মাটী নিক্ষেপ করা উচিত নহে, যেহেতু তন্মধ্যে উহা আবদ্ধ হইয়া চারিদিক হইতে

পূরিয়া উঠিলে অভ্যন্তর পূঁজ ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি, এমন কি নালী পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কর্দ্দম "সারক" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এ কিরূপ? তবে, বেল পেঁপে প্রভৃতি না খাইয়া কাদা খাইলেই ত হয়? তাহা নহে। উক্ত ফলাদি যেরূপ পরিপাক পাইয়া উহাদের নিঃসারাংশ মলরূপে স্বয়ং বহির্গত হয়, অন্য আবদ্ধ মলকেও বহির্গত করে, কর্দ্দমের সেরূপ শক্তি নাই। কর্দ্দম স্বয়ং পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া, উহার প্রায় সর্ব্বাংশই অধঃপথে নির্গত হইয়া যায়, তৎসঙ্গে কোষ্ঠ-সংলগ্ন মলকেও নিঃসারিত করে।

(১) কলসীতে গঙ্গাজল বা অন্য কোনও স্রোতস্বতীর জল ধরিয়া রাখিলে, নীচে যে কর্দ্দম সঞ্চিত হয়, তাহার শৈত্যগুণ সমধিক। ইহা নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিয়া শয়ান থাকিলে, পেট ফাঁপা ও আবদ্ধবাত ও মূত্ররোধের প্রতিকার হয়।

(২) প্রান্তরে শস্যক্ষেত্রে কলায় উৎপন্ন হইলে, ক্রমে পরিপক্ক ও সংগৃহীত হইবার পর যখন গৃহে আনীত হয়, তখন সেই কলায়স্তূপের মধ্য হইতে মাটীর চটা উঠাইয়া রাখিতে হয়। এই চটা উদরে প্রলেপ দিলে কলসীর নিম্ন-সঞ্চিত মাটীর যে যে গুণ, তদপেক্ষা সমধিক গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) কোনও কোনও নদীর তটে যে কোমল পাতলা মৃত্তিকার স্তর পাওয়া যায় তাহারও এই শক্তি আছে।

(৪) আঠালো মাটী দিয়া নিত্যনিত্য দাঁত মাজিলে, দাঁত বহুকাল শক্ত থাকে।

(৫) ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর তীরে একরূপ অত্যন্ত আঠালো সুন্দর লালবর্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকায় পুত্তলিকাদি প্রস্তুত করিয়া শুধু রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলেই পোড়ানো জিনিস্ বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ শক্তও হয়। এই মাটীর গুণ প্রায় গৈরিকের (গিরিমাটীর) তুল্য, গিরিমাটীর গুণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

(৬) কর্দ্দম শুষ্ক ও দগ্ধ হইলে তাহাতে গুণান্তর উপনীত হয়। পোড়া-মাটী শোধক, সঙ্কোচক ও কিয়ৎপরিমাণে রক্ত রোধক। ফোলা ও ব্যথাযুক্ত স্থানে পোড়ামাটীর গুঁড়া (তামাকের গুল প্রভৃতি দ্রব্যান্তরের সহিত)

প্রলেপ দিবার নিয়ম আছে। পোড়ামাটীর চূর্ণের সহিত দাঁত মাজিলে মাড়ীর পুঁজ কোলা ও রক্তপড়া নিবারিত হয়। এই চূর্ণ ৩।৪ রতি যথাযুক্ত অনুপানে সেবন করাইলে রক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। আঠালো মাটী পোড়াইয়া লইলে, এই শক্তি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মূলকথা এই—মৃত্তিকার মধ্যে যে স্বাভাবিক ধাতব অংশ আছে, উহা অগ্নি-দগ্ধ হইলে অন্যান্য অংশের হ্রাসপ্রাপ্তি হেতু সেই ধাতবাংশের সমধিক প্রকটন হইয়া থাকে; এই ধাত্বংশই উল্লিখিত শক্তির হেতুভূত। চরকসংহিতায় সূত্রস্থানে শোণিতাস্থাপক দশবর্গ যথা—"মধু মধুক রুধির মোচরস মৃৎকপাল লোধ্র গৈরিক প্রিয়ঙ্গু শর্করা ইতি দশেমানি শোণিতস্থাপকানি ভবন্তি।" মৃৎকপাল শব্দের অর্থ "খাপরা বা খোলা"।

(৭) স্ত্রীলোকেরা পোড়া মাটী খাইতে ভালবাসে, ধাতুবিশেষে ইহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর হইয়া থাকে, ইহা রজঃসংকোচক ও পাণ্ডুরোগজনক।

কর্পূর।

বাঙ্গালা নাম—কর্পূর; হিন্দী—কপূর; ইংরাজী—Champhor. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ। ঘনসারশ্চন্দ্র-সংজ্ঞো হিমনামাপি স স্মৃতঃ॥ ভাঃ প্রঃ॥ সংস্কৃত নাম—কর্পূর, সিতাভ্র, হিমবালুক, ঘনসার, চন্দ্র, হিম। এতদ্ভিন্ন কর্পূরের আরও অনেক গুলি নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, জ্ঞাতার্থ সে গুলির উল্লেখ করা গেল; যথা—তরুসার, ভস্মাহ্বয়, রেণুসার, রেণুসারক, স্ফটিকাদ্রিভিৎ, স্ফটিকাভ্র, ভস্মবেধক, শিলা, তারাভ্র, সিতাভ্রক, হহু, হিমাহ্বয়, চন্দ্রভস্ম, হিমবালুকা, সিতাভ, ওষধীশ, কুমুদ, গৌর, চন্দ্রার্দ্দিক, এবং চন্দ্রবাচক শব্দগুলি।

কর্পূর একপ্রকার বৃক্ষের সার। ঐ গাছ যাবা, সুমাত্রা, বর্ণিয়ো, জাপান, চীন প্রভৃতি স্থানে জন্মে। সচরাচর কর্পূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় বাজারে বিক্রীত হয়। উহা শ্বেতবর্ণ ও উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট; বাতাসে রাখিলে উবিয়া যায়, এজন্য কাচের শিশির ভিতরে রাখিয়া উত্তমরূপে ছিপি বন্ধ করিয়া

রাখিতে হয়। প্রচলিত নিয়মানুসারে উবিয়া যাইবার ভয়ে, গোটাকতক গোলমরিচ উহাতে দিয়া রাখা হয়; কিন্তু ইহাতে কতদূর ফল হয় বলা যায় না।

ইহার পোতকাদি নানা প্রকার ভেদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সচরাচর উহা দুষ্প্রাপ্য ও চলিত না থাকায়, সে বিষয়ের উল্লেখ করা গেল না।

কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ।
সুরভির্মধুরস্তিক্তো কফপিত্ত বিষাপহঃ।
দাহতৃষ্ণাস্যবৈরস্য মেদো দৌর্গন্ধ্য নাশনঃ॥

রস—কটু তিক্ত মধুর; বিপাক—কটু; বীর্য্য—শীত; গুণ—কফপিত্ত নাশক, লঘু, লেখন, বৃষ্য, সুগন্ধি, চক্ষু রোগে হিতকর, মেদোনাশক; প্রভাব—দাহ, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা ও দুর্গন্ধ নাশক। কর্পূর ত গরম জিনিস্ বলিয়া সকলেই জানেন, তবে কেন ইহা "শীতল" অভিহিত হইল? ইহার মর্ম্ম এই,—(১) স্পিরিট প্রভৃতি উদ্বায়ি বস্তুমাত্রই স্পর্শ-শীতল হইয়া থাকে; কর্পূরও অনেকাংশে এই জাতীয়। তবে কর্পূরের সহিত জলমিশ্রিত হইলে, এই শক্তির অধিকতর উপলব্ধি হয়। এই জাতীয় বস্তুগুলি উবিয়া যাইবার কালে সংস্পৃষ্ট পদার্থের তাপহরণ করে। (২) জ্বরাদি রোগে দৈহিক উষ্মা বর্দ্ধিত হইলে, কর্পূর এই উত্তাপ অপনোদনে সমর্থ। (৩) ধনুষ্টংকার অপস্মার প্রভৃতি বায়ুরোগে স্নায়বিক উত্তেজনা ও আক্ষেপ (খেঁচুনী) প্রশমিত করিয়া রোগীকে "ঠাণ্ডা" করে। তজ্জন্যও ইহাতে শীতলতা আরোপিত হইয়াছে। ফল কথা অনেক স্থলে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণের শাস্ত্রোক্ত বিশেষণ গুলি সহসা বোধগম্য না হইলেও, সকলগুলিই সার্থক সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানীরা কর্পূর শীতল বলিয়াই ব্যবহার করে।

প্রয়োগ—সচরাচর ইহা পানের অন্যতম মসলা রূপে ব্যবহৃত হয়; দ্রব্য-বিশেষের দুর্গন্ধ নাশ এবং কোন কোন মিঠাই সুগন্ধ করিবার জন্যও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কর্পূর, খেঁচুনি ক্রিমি শূল অজীর্ণ ভেদ নিবারক।
ওলাউঠায় রক্ষাকারী, বাতাসের দুর্গন্ধহারক। স্বাঃ সাঃ।

স্বাস্থ্যসাধনের এই শ্লোকটিতে কর্পূরের প্রধান প্রয়োগ সংক্ষেপে উল্লিখিত

আছে। যখন গ্রামের মধ্যে বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট কর্পূর বড় আদর পাইয়া থাকে। সকলের বিশ্বাস—কর্পূরের আঘ্রাণ লইলে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না। কেহ শিশি'র, ভিতর পূরিয়া, কেহ বা পুঁটুলি বাঁধিয়া, সঙ্গে রাখিয়া দেন, মধ্যে মধ্যে উহার আঘ্রাণ লইয়া থাকেন। বস্তুতঃ কর্পূর (বিষঘ্ন, আক্ষেপনাশক ও ধারক গুণ বশতঃ) ওলাউঠা রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রবল ভেদ বমি বন্ধ করিতে ও আক্ষেপ (খেঁচুনি) নিবারণ করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ। ওলাউঠার প্রথম অবস্থায়, কর্পূরের জল সেবন করিলে, রোগ আর প্রবল অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় ডাক্তারেরা স্পিরিট্‌ক্যাম্ফর (একপ্রকার কর্পূরের আরক) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "খটিকা মিশ্র" এই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় (ঋষির ২য়বর্ষ, ১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ওলাউঠায় বা জ্বরাদির প্রবল অবস্থায়, যখন নাড়ী ক্ষীণ, জিহ্বা শুষ্ক, অল্প অল্প প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে ও ক্রমে হস্তপদাদি শীতল হইয়া আইসে, তখন মকরধ্বজ কর্পূর ও মধুসহ প্রয়োগ করিলে, ক্রমে হস্তপদ উষ্ণ হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় মকরধ্বজ, কর্পূর ও মৃগনাভি মধু অনুপানে সেবনে সদ্য ফল দৃষ্ট হয়। সান্নিপাতিক বিকারের উৎকৃষ্ট ঔষধ "বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব" প্রভৃতি ঔষধে কর্পূরের প্রয়োগ আছে। গ্রীষ্মকালে অনেকে জলে কর্পূর দিয়া পান করিয়া থাকেন; ইহাতে জল দোষহীন, শীতল ও সুগন্ধ হয়। ওলাউঠার মারি ভয়ের সময় ঐরূপে জল পান করা ভাল।

হিঙ্গুল মহিফেনঞ্চ মুস্তকেন্দ্রযবং তথা।
জাতীফলঞ্চ কর্পূরং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ॥
জলেন বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জা পরিমাণতঃ।
ঘোরাং বিসূচিকাং হন্তি বটিকা নাত্র সংশয়ঃ॥
জ্বরাতিসারিণে দেয়া তথাতীসার রোগিণে।
গ্রহণী ষট্‌ প্রকারে চ রক্তাতীসার উল্বনে॥

হিঙ্গুল, আফিং, মুথা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর সমভাগ, জলে মাড়িয়া দুই রত্তি প্রমাণ বড়ী করিবে। ইহার নাম কর্পূর রস। ইহা বিসূচিকার প্রবল অবস্থাতেও বিশেষ ফল দর্শায়। জ্বরাতীসার ও প্রবল রক্তাতীসার

প্রভৃতির পুরাতন অবস্থায় ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চিকিৎসক-পরিশূন্য স্থানে "খটিকা মিশ্র" নামক ঔষধ ও এই কর্পূর রস এই দুইটী ঔষধ প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহেই থাকা আবশ্যক; কারণ, ওলাউঠা অতি ভয়ঙ্কর রোগ; দূর হইতে চিকিৎসক আনিতে আনিতেই হয়ত রোগীর অবস্থা খারাপ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ঐ দুইটী ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অধিকাংশ স্থলেই চিকিৎসকের বিনা সাহায্যেই রোগের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়া থাকে। এই ঔষধে দাস্ত বন্ধ হইলে, আর প্রয়োগ করা উচিত নয়। গোলমরিচ চূর্ণ ১, শোধিত হিং ১ ও কর্পূর ২ ভাগ; ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় এই যোগটী সহজ অথচ উৎকৃষ্ট ঔষধ। আতপ চাউল ধোয়া জল সহ সেব্য।

অতিসার রোগের অন্যান্য ঔষধের অনুপান স্বরূপে কর্পূরের জল প্রযুক্ত হয়। শিশু দিগের পেটের অসুখে, পাতলা দুধের সঙ্গে অল্প কর্পূরের জল মিশাইয়া খাওয়ান উচিত। শিশুদিগের উদরাময়ে দুগ্ধের সহিত শুধু চূণের জল না দিয়া, অত্যল্প কর্পূরের জলও দেওয়া ভাল।

কর্পূর ঘর্ম্মকারক। কর্পূরের জল সেবনে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া জ্বরাদির দাহ প্রশমিত হয়। নবজ্বরে, এক ঝিনুক তুলসী পাতার রসে ১ রতি কর্পূর ও এক বা দেড় আনা সোরা দিয়া সেবনে ঘর্ম্মাদি নির্গত হইলে জ্বর ভাল হয়।

সর্দ্দি হইলে অনেকে কর্পূর শুঁকিয়া থাকেন। ইহাতে নাক দিয়া জল পড়া, মাথা কট্‌কটানি প্রভৃতি প্রশমিত হয়। বস্তুতঃ, ইহা সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় ঐরূপে ব্যবহার করা ভাল; কিন্তু সর্দ্দি বসিয়া গেলে উহাদ্বারা উপকার হয় না, অনিষ্ট হইতে পারে।

সর্দ্দিতে খালি পানের ভিতর ছোটএলাচ, তুলসী পাতা, লবঙ্গ, একটুকরা আদা ও কর্পূর দিয়া খাইলে, শীঘ্রই সর্দ্দির উপশম হয়। (আয়ুর্ব্বেদ সোপান)

সর্দ্দি হইয়া যদি শ্বাসের ভাব হয়, নিশ্বাসে টান লাগে, গলা সাঁই সাঁই করে, তাহা হইলে কর্পূরের প্রয়োগে বেশ ফল হয়। কর্পূরের একটী প্রধান গুণ এই যে, ইহা আক্ষেপ নিবারক; এজন্য আক্ষেপ যুক্ত রোগে (শ্বাসাদিতে) প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই ফল দর্শে।

১৫৷২০ ফোঁটা তুলসী পাতার রসে আধ রতি কর্পূর দিয়া সেবন করাইলে, শিশুর কাসি ও বুকের টান শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

জননেন্দ্রিয়ের অযথা উত্তেজনা নিবারণার্থ কর্পূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বপ্নদোষ রোগে এই উদ্দেশ্যেই কর্পূরের প্রয়োগ দেখা যায়। কর্পূর ২ রতি ও কাবাবচিনির গুঁড়া ⁄০ আনা একত্রে পাতলা চূণের জল সহ অথবা কর্পূর ২ রতি ও আফিং আধ ধান, ঠাণ্ডা জলসহ শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়। স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ ও যোনি কণ্ডূয়ন প্রভৃতিতেও উহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। প্রসবান্তে হেঁতাল ব্যথা ও কষ্টরজঃরোগে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দূর্ব্বার শিকড়, বকুলের বীচি ও শাঁস, আমলকী ও কর্পূর সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত বাটিয়া, ছোট কুল আঁঠী প্রমাণ বড়ী করিয়া নারিকেল জলের সহিত রাত্রে শয়নকালে সেবন করিলে স্বপ্নযোগে শুক্রক্ষয় হয় না। (আয়ুর্ব্বেদ সোপান)।

বিষাক্ত মেহে যখন অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, প্রস্রাব করিতে কষ্ট, ভিতরে ঘা ও টাটানি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, তখন সামান্য উত্তেজনাতেই রোগী বিষম যন্ত্রণা অনুভব করে। এই অবস্থায় কর্পূর, সোরা, শ্বেতচন্দন, কাবাবচিনি ও অত্যল্প আফিং সহ প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই উপকার দর্শে। কিন্তু এস্থলে আফিং সাবধানে ব্যবহার কর্ত্তব্য, নতুবা উহার শক্তিতে প্রস্রাবের অল্পতা হইয়া মূত্রনালীর জ্বালা বাড়িতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণে মূত্রকারক বস্তু খাইলে উক্ত বিঘ্ন না হইয়া যথেষ্ট উপকার হয়।

মূত্রে বিবদ্ধে কর্পূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ। ভৈঃ রঃ।

অর্থাৎ মূত্ররোধ হইলে লিঙ্গমধ্যে কর্পূর চূর্ণ প্রবেশ করাইলে মূত্র নির্গত হয়।

বটক্ষীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষ্ণং কর্পূরজং রজঃ।
ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি শুক্রঞ্চাপি ঘনোন্নতম্ ॥ চক্রদত্ত।

বটক্ষীর ও কর্পূরের সূক্ষ্মচূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া চক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে ঘনোন্নত নেত্রশুক্রও শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

একছটাক শিমুল মূলের রসে ২ রতি কর্পূর ও ⁄০ আনা কাবাবচিনি চূর্ণ

প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, শুক্র গাঢ় ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বপ্নদোষাদি ধাতুদৌর্ব্বল্যের বিবিধ উপসর্গ দূরীভূত হয়।

কর্পূরের ক্রিমি (রক্তজ, বাহ্যমলজ বা পুরীষজ) নাশক শক্তিও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। খোস পাচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগে, ইহাদ্বারা অন্তরস্থ ক্রিমি (কণ্ডু উৎপাদক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট) বিনষ্ট ও ইহার কফপিত্ত নাশক শক্তিতে পূঁজ রসাদি শোষিত হওয়াতে, শীঘ্রই উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। শ্বেত-চন্দন ঘষার সহিত কর্পূর মিশাইয়া দেহে মাখিলে, গ্রীষ্মকালের ঘামাচি চুল-কানির বিশেষ উপশম হয়। নারিকেল তৈলে কর্পূর মিশাইয়া মাখিলে মাথার উকুন ও সামান্য রকমের খোস পাচড়া ভাল হইতে দেখা যায়। কর্পূর ও গন্ধক সমভাগে লইয়া নারিকেল তৈলে মিশাইয়া লাগাইলে ২।৩ দিনেই পাঁচড়া শুকাইয়া যায়। নিমপাতার জলে উত্তমরূপে পাঁচড়া ধুইয়া ইহা লাগান উচিত।

কর্পূর পূরিতং বদ্ধং সঘৃতং সংপ্ররোহতি।
সদ্যঃ শস্ত্রক্ষতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবর্জ্জিতম্॥

কর্পূর চূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া সদ্যোক্ষতে (কাটা ঘা প্রভৃতিতে) পূরণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, বেদনাদির নিবৃত্তি হয় ও ক্ষত পূরিয়া উঠে।

যে সকল ঘায়ে বেদনা, টাটানি প্রভৃতি থাকে না; অথচ শীঘ্র আরাম হইতেও চায় না, অল্পাধিক পরিমাণে পূঁজ ঝরিতে থাকে, সেরূপ স্থলে ঘা উত্তমরূপে ধোয়াইয়া কর্পূর যুক্ত কোন প্রলেপ লাগাইলে, উহা ঈষৎ রক্তিমাভ ও পরিষ্কার হয় এবং পূঁজাদি নিঃসরণ ক্রমে বন্ধ হইয়া শীঘ্রই আরোগ্যোন্মুখ হইয়া থাকে।

দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বেদনা জন্মাইলে, কর্পূর গোলমরিচ, বিট্‌লবণ ও তামাকপাতা চূর্ণ সহ ঐ বেদনার উপর চাপিয়া ধরিয়া থাকিলে, অল্প সময়ের মধ্যেই উহার কট্‌কটানি ফোলা প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়। বালক দিগের দাঁতে পোকা লাগিলে, ফুলখড়ির গুঁড়া সহ কিঞ্চিৎ কর্পূর ও সামান্য পরিমাণ কুড়চীছাল চূর্ণ মিশাইয়া দাঁত মাজিতে দেওয়া ভাল। কর্পূরের দুর্গন্ধ নিবারক শক্তিও থাকাতে, এইরূপে প্রস্তুত দন্তমঞ্জন সচরাচর ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিট্‌লবণ মরিচের গুঁড়া কর্পূর আর সুপারী পোড়ায়।
টিপিয়ে লাগালে সারে ফোলাব্যথা দাঁতের গোড়ায়॥ স্বাঃ সাঃ

কর্পূরের কিঞ্চিৎ পরিমাণে রজঃকারক শক্তি দৃষ্ট হয়। হিং মুসব্বর প্রভৃতি অন্যান্য রজঃকারক ঔষধের সহযোগে কর্পূর উহাদের শক্তি বর্দ্ধিত করে ও বাধকের (রজঃ বন্ধ হওয়ার জন্য বাধকের) পেটবেদনা শিরঃপীড়া প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত ও রজঃস্রাবকে নিয়মিত করে।

হিং কর্পূর দারুচিনি পুরাণ সিদ্ধি দুর্ব্বামূলী।
ঋতুর পূর্ব্বে বেটে খেলে শীঘ্র সারে বাধকশূল॥ স্বাঃ সাঃ

নানাবিধ শূল রোগেও কর্পূরের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আপাংক্ষার, তেঁতুল-চটাভস্ম ও শোধিত হিং চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায়, কর্পূর জলের সহিত সেবন করিলে নিঃসন্দেহে শূল যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শূলের বেদনা কালে বড় এলাচের দানা, কর্পূর ও একটুকরা মিশ্রী মুখের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ঢোক গিলিলে, কথঞ্চিৎ বেদনার উপশম হয়। (আয়ুর্ব্বেদ সোপান)।

নানাবিধ বাতের বেদনা ও নানা প্রকার ফিঁকব্যথার তৈল সহ কর্পূর মিশাইয়া মালিশ করা যায়। কেরোসিন তৈল ও তার্পিন তৈল সমভাগে মিশাইয়া তাহাতে কর্পূর দিয়া ফিঁকব্যথা ও বাতের ব্যথায় মালিশ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যথা ভাল হয়। (আয়ুর্ব্বেদ সোপান)।

ডাক্তার ডিউইস্ ঋতুর প্রাক্কালীন অপস্মারে হিং বা আফিং সহযোগে ৫ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় কর্পূর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাক্তার টিল্ট বলেন, ঋতু এক কালে বন্ধ হওয়ায় যদি শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, তবে ওডিকলোনের সহিত কর্পূর মিশাইয়া মস্তকে মর্দ্দন করা উচিত।

শাস্ত্রোক্ত মেহরোগের কর্পূরাদি লৌহ ও বৃহদ্বঙ্গেশ্বরে এবং অজীর্ণের মহারাজ নৃপবল্লভ ও কতিপয় মোদকে, কফের লক্ষ্মীবিলাস এবং বাতব্যাধির নানাবিধ তৈলে ও বীর্য্যস্তম্ভের মন্মথাভ্ররস, বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজে ও বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রসে কর্পূর আবশ্যক হয়।

ভগবৎ প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্

(ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতম্)

(১)

প্রাতঃ স্মরামি ফণিরাজতনৌ শয়ানং নাগামরাসুরনরাদিজগন্নিদানম্ ।
বেদৈঃ সহাগমগণৈরুপগীয়মানং কান্তারকেতনবতাং পরমং নিধানম্ ॥

ফণিরাজ অনন্তের মাথার উপর
শয়ন করিয়া যিনি রন্ নিরন্তর,
দেব-দৈত্য-নাগ-নর-যুত ত্রিভুবন
যাঁর সৃষ্টি-কার্য্য বলি খ্যাত সর্ব্বক্ষণ,
নিগম আগম যাঁর গায় গুণচয়,
বনবাসী ঋষিদের যিনিই আশ্রয়,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করি
তাঁহারেই ভক্তিভরে মনে মনে স্মরি !

(২)

প্রাতর্ভজামি ভবসাগরবারিপারং দেবর্ষিসিদ্ধনিবহৈ র্বিহিতোপহারম্ ।
সন্দৃপ্তদানবকদম্বমদাপহারং সৌন্দর্য্যরাশিজলরাশিসুতাবিহারম্ ॥

পার ক'রে দেন যিনি ভব-পারাবার,
দেব-ঋষি-সিদ্ধগণ পূজা করে যাঁর,
পরম দুর্দ্দান্ত যত রহে দৈত্যগণ
তাহাদের দর্প যিনি করেন হরণ;
যিনি সিন্ধুসুতা, যিনি সৌন্দর্য্য-আধার
সেই লক্ষ্মীদেবী সনে বিহার যাঁহার,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করি
তাঁহার ভজনা করি মন প্রাণ ভরি !

(৩)

প্রাতর্নমামি শরদম্বরকান্তিকান্তং পদারবিন্দমকরন্দজুষাং ভবান্তম্।
নানাবতারহৃতভূমিভরং কৃতান্তং পাথোজকম্বুরথপাদকরং প্রশান্তম্॥

শরতের সুনির্ম্মল আকাশের মত
যাঁহার সুন্দর কান্তি শোভে অবিরত,
যাঁর পাদপদ্ম-মধু পিলে একবার
এ সংসারে জন্মভয় নাহি থাকে আর,
যিনি নানা অবতার ধারণ করিয়া
এই ত্রিলোকের ভার দিলেন নাশিয়া,
শঙ্খ চক্র আর পদ্ম নিত্য যাঁর করে,
কৃতান্ত প্রশান্ত যিনি সংসার ভিতরে,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করি
তাঁর পদে প্রণিপাত করি প্রাণ ভরি !

(৪)

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং ব্রহ্মানন্দেন কীর্ত্তিতম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ব্রহ্মানন্দ-বিরচিত এই শ্লোকচয়
অতি সারবান্ বস্তু মহাপুণ্যময়।
প্রাতঃকালে যদি ইহা পঠে কোন জন,
যত কিছু পাপ তার পলায় তখন !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি. এ

আদর্শ কুলস্ত্রী।

হিন্দু কুলস্ত্রীকে ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা কি ভাই তোমার এখন আর মনে আছে?—থাকিবে কিরূপে? চতুর্দ্দিকে যখন পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও পাশ্চাত্য-রুচির প্রলয়ঙ্করী মহাবাত্যায় বিতাড়িত হইতেছে, তখন আর গৃহাভ্যন্তরে সেই সুখ-শীতল মন্দ-মলয়ানিল কিরূপে অনুভব করিবে? কুলস্ত্রীর যে সেই শাস্ত্রোক্ত "অসূর্য্যম্পশ্যা" মহা গৌরবান্বিত উপাধিটী ছিল, তাহা সুরুচি শবরীর অকুতো-বিমুখ ওত-প্রোত লুণ্ঠনে এককালীন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন বহির্দ্দেশে বৈঠকখানায় বাবুরা যখন পরস্পর খাদের সুরে আলাপ করিতে থাকেন, অন্তঃপুর হইতেও কাংস্য-বিনিন্দী পঞ্চমস্বর নিঃসৃত হইয়া ঐকতানের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

কিরূপে কথা কহিবে, কিরূপে চাহিবে কিরূপে উঠিবে বসিবে এসমস্ত বিষয়ে পূর্ব্বে একটা নিয়ম ছিল—এই নিয়ম মাতা হইতে কন্যায়, শ্বশ্রূ হইতে বধূতে সংক্রামিত হইত। এক্ষণে সেরূপ অভিভাবিকা নাই, শিক্ষার্থিনীও নাই। কুলবধূর সমস্ত ক্রিয়াকলাপই সুনির্দ্দিষ্ট, পদ্ধতি-সম্মত ও সীমাবিশিষ্ট ছিল। তাহার পদসঞ্চারের সীমা আবাস গৃহ পর্য্যন্ত, আর অধিক দূর নয়। তাহার বাক্যোচ্চারণের সীমা সমবয়স্কা সঙ্গিনীর কর্ণবিবর পর্য্যন্ত। তাহার হাস্যের সীমা স্বকীয় অধরপল্লব-পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে,—সেই হাস্যরেখা দন্ত-বিস্তারী তার-শব্দে পর্য্যবসিত হইত না। আর তাহার কদাচিৎ কখন অভিমান হইলে সেই অভিমানের একটা সীমা থাকিত—সীমা মৌনের নিঃশব্দ রাজত্ব পর্য্যন্ত। তাহার কামনার সীমা পতিদেবের সন্তোষসাধন-প্রয়াস পর্য্যন্ত, তাহার দৃষ্টির সীমা নিজ চরণাঙ্গুলির অগ্রদেশ পর্য্যন্ত। এইরূপে কুলবধূর সমস্তই সীমা-বিশিষ্ট। নিঃসরণোন্মুখ জলৌঘের অন্যান্য সব পথ বন্ধ করিলে, যেমন অবশিষ্ট একটী পথের স্রোত বড়ই প্রবল হইয়া পড়ে, যেমন অন্ধের দৃষ্টিশক্তির অন্তর্ভূত ক্ষমতানিচয় বিলুপ্ত হওয়ায়, স্পর্শ শক্তি শতগুণ বাড়িয়া যায়, সেইরূপ উল্লিখিত নীতি-নিয়ন্ত্রিত কুলস্ত্রীগণের একটী দিকে বড়ই প্রচণ্ড বেগবত্তা আসিয়া পড়ে। তাই তাঁহাদের সকলই সীমাবদ্ধ, সকলই গণ্ডী-

প্রেমারও কেবল তাঁহাদের প্রেমের সীমা নাই, তাহা অগাধ, অসীম, অনবচ্ছিন্ন। এই কথা গুলি প্রাচীনকবি সংক্ষিপ্ত সুললিত শ্লোকে গাঁথিয়াছেন—

সঞ্চারো রতি মন্দিরাবধি সখীকর্ণাবধি ব্যাহৃতম্
হাস্যং চাধর পল্লবাবধি মহামানোঽপি মৌনাবধি।
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষণম্
সর্ব্বং সাবধি নাবধিঃ কুলমুবাং প্রেম্ণঃ পরং কেবলম্ ॥

গ্রন্থাদির সমালোচনা।

নবযুগ—সাপ্তাহিক পত্র। বিশেষ দক্ষতা ও উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইতেছে। সম্পাদক বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় একজন ক্ষমতাবান্ স্বনামধন্য পুরুষ। বাহাদুরী এই যে, এমন সুন্দর কাগজ খানি কেবল ডাকমাশুল লইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার দিন দিন উন্নতি হউক এই প্রার্থনা।

আনন্দকানন—৺কাশীধাম হইতে শ্রীঅন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিষয়—ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা। উদ্দেশ্য অতি মহৎ। বার্ষিক মূল্য ১৶০ আনা মাত্র। ঈদৃশ পত্রিকার প্রচার যত হয় ততই দেশের মঙ্গল।

চৈতন্য পত্রিকা—শ্রীচৈতন্য ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রীযুক্ত ভবকিঙ্কর মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ও পরিচালিত। আকার ক্ষুদ্র হইলেও সারকথা আছে।

দৈনিক চন্দ্রিকা—পূর্ব্বে এই দৈনিক পত্রিকা খানি বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইত। এক্ষণে ইহার ভার দক্ষতর হস্তে উপনীত হইয়াছে। শুধু সংবাদাদি না লিখিয়া ইহার অঙ্গ নানাবিধ সাহিত্য ও নৈতিক প্রসঙ্গ দ্বারা পরিশোভিত দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত মহাশয় ইহার পরিচালক ও সত্ত্বাধিকারী। কালীবাবুর সুদক্ষতায় সহস্র ধন্যবাদ!

মিনার্ভা ও বেঙ্গল থিয়েটার—এই দুই রঙ্গালয়ে নীতিশিক্ষানুকূল ও ধর্ম্মরুচি প্রবর্ত্তক পৌরাণিক প্রসঙ্গের অভিনয় হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা শ্রোতৃগণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হয় কিন্তু যেখানে (বেশ্যার মুখে) শুধুই নাটকনভেলের কথা, সেখানে কেবল সেই হৃদ্‌ভেদিনী ছুরিকা, তাহাও আবার বিষ-মাখানো !!

ঋষি।

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। } { ১৩০৬, মাঘ।

চরকীয় নীতি।

(ভোজন-দোষ)

মানবদেহের প্রপীড়নকারী রোগ সমুদায়ের মধ্যে অনেক গুলি ভোজন-দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ভোজন-দোষ বহুপ্রকারে সংঘটিত হয়, যথা দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন, সুপাচ্য দ্রব্যের অতিমাত্রায় ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন, অধ্যশন অর্থাৎ ভোজনের পরেই ভোজন, বিষমাশন অর্থাৎ কথন অত্যল্প কথন অত্যধিক এবং কথন যথাকালে কথন অকালে আহার, বিরুদ্ধাশন অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ আহার্য্য সমুদায় মিশ্রণপূর্ব্বক ভোজন ইত্যাদি। ভোজন সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত অনিয়ম গুলিই লোকে ন্যূনাধিক অবগত থাকিতে পারেন, কিন্তু কোন্ বস্তুর সহিত কোন্ বস্তুর বিরোধ,—কোন্ গুলি একত্র আহার করিলে উৎকট রোগাশঙ্কা আছে, তাহা শাস্ত্রোপদেশ ব্যতিরেকে জানা দুর্ঘট। তজ্জন্য এস্থলে চরকোক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ দ্রব্যসমুদায়ের তালিকা প্রদত্ত হইল।

দুগ্ধের সহিত—মৎস্য, মাংস, লবণ, নারিকেল, অধিক কাঁঠাল, বংশাঙ্কুর, বনমুগ, মাষ, লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি কোন প্রকার লতাফল, তণ্ডুলের পিষ্টক, শুষ্ক শাক, ছাতু, কোন প্রকার অম্ল, গাব, কৎবেল, জাম, মদ্য, প্রভৃতি। মূলা, রসুন, সজনাশাক ও তুলসী আহারান্তে দুগ্ধ সেবন বিরুদ্ধ।

ঘৃতের সহিত—মধু ও অন্য কোন প্রকার স্নেহ (তৈল, চর্ব্বী প্রভৃতি) সমপরিমাণে, মাদার, মৎস্য প্রভৃতি। ঘৃত সেবন করিয়াই বৃষ্টির জল পান করিতে নাই। কাঁসার পাত্রে ১০ দিনের অধিককাল ঘৃত থাকিলে বিষাক্ত হয়। উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃত ভোজন নিষিদ্ধ।

ঘোলের সহিত—অধিক কলা। কমলা গুঁড়ী ঘোলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে নাই।

দধির সহিত—দুগ্ধ, (বিনা জল মিশ্রণে) বেল, কলা, পিপুল, মরিচ। দধি গরম করিয়া খাওয়া বা গরম দ্রব্যের সহিত খাওয়া নিষিদ্ধ।

মধুর সহিত—জল ঘৃত ও তৈল (সমভাগ) গুড়, লবণ, মূলা, মাছ, মাংস, মদ্য, মাদার প্রভৃতি। কোন প্রকার উষ্ণ দ্রব্যের সহিত বা উষ্ণক্রিয়াদির (উষ্ণস্বেদাদির) পর মধু সেবন কিম্বা মধু সেবনের পর কোন প্রকার উষ্ণ ক্রিয়া নিষিদ্ধ।

মাছ ও মাংসের সহিত—মধু, তিল, গুড়, দুধ, মাষকলাই, অন্য কোন চর্ব্বী, ইক্ষু গুড় প্রভৃতি। মাছের হাঁড়ীতে পিপুল বা কাকমাচী সিদ্ধ করিয়া খাওয়া নিষিদ্ধ।

উষ্ণজল—মধু ও ভেলা সেবনের পর উষ্ণজল পান নিষিদ্ধ।

অম্ল—যে প্রকার অম্ল হউক না কেন তাহার সহিত দুগ্ধ সেবন নিষেধ।

গুড়ের সহিত—মাদার, মাছ মাংস, মধু, কাকমাচী।

ছাতুর সহিত—মাংস ও ঘন দুধ।

জামের সহিত—দুধ ও কলা।

গাবের সহিত—দুধ।

কলার সহিত—ঘোল, আম, জাম, শূকরমাংস, তালফল, গাঢ় দুগ্ধ ও দধি।

কপোত মাংসের সহিত—সর্ষপ তৈল।

গিমে শাকের সহিত—পিপুল ও মরিচ।

পুঁইশাকের সহিত—তিলের বাটনা।

মাদারের সহিত—মধু, গুড়, ঘৃত, দুগ্ধ কিম্বা মাংসকলায়ের যূস্।

সজনার শাক বা ফলের সহিত—দুধ।

রসুনের সহিত—দুগ্ধ বা রসুন খাইয়া দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ।

ভবপারের কড়ি।

মানুষ সঞ্চয় করিবার জন্য স্বতঃই ব্যস্ত, শুধু মানুষ কেন এই সঞ্চয় বৃত্তি ক্ষুদ্র জীবাদিতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, ক্ষুদ্রপ্রাণী পিপীলিকা ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ স্থল। সঞ্চয় ব্যতীত পরিণামে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় তাহা জীব মাত্রেই অনুভব করিতে পারে। সেই জন্যই জীব মাত্রেই অসময়ের জন্য যথাসাধ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

জীবের ধারণা এই মর-ভূমিই তাহাদিগের চির আবাস স্থান, চিরদিনই তাহারা ইহসংসারে আত্মীয় বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া এমনই সুখে অতিবাহিত করিবে। জীব জীবনে মৃত্যুরূপ একটি যে মহা-পরিবর্ত্তন আছে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই আমরা ইহাতে এমন তন্ময়, তাই আমরা ইহ সংসার ফেলিয়া, মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না, করিতে প্রবৃত্তি হয় না, মনে হয় না; যেন ইহার কি জানি কেমন এক মোহন বংশী ধ্বনিতে মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পবৎ আমরা নীরব নীস্তব্ধ। তাই আমরা সেই অসময়ের—সেই শেষের সে দিনের জন্য কিছু মাত্র কড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি না। সেই জন্যই আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইতে হইবে তাহাও ভাবিবার অবসর পাইনা। অমরা সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া আমাদের সেই চির-সন্তাপ-হারিনী স্বদেশ-ভূমিকে ভুলিয়া গিয়াছি। একি কথা! চির প্রিয় স্বদেশ খানিকে কেহ কি কখনও ভুলিতে পারে? আমরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অথবা কোন কার্য্য বশতঃ জীবনাধিক প্রিয় স্বদেশ খণ্ডকে ছাড়িয়া যখন প্রবাস-বাসে অবস্থান করি, তখন কি আমাদের সমগ্র হৃদয়খানি মন্থন করিয়া স্বদেশের নির্ম্মল স্মৃতিটুকু অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হয় না? সে দেশের তরুলতা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদিতে আমাদের কি স্বদেশের স্মৃতি জাগিয়া উঠে না? বসন্তের কোকিল যখন "কুহুকুহু" রবে পঞ্চমে সুর চড়াইয়া আমাদের প্রবাসী হৃদয় খণ্ডকে আলোড়িত করিয়া তুলে, তখন কি স্বপ্নলব্ধ সঙ্গীতবৎ আমাদের হৃদয়ে সেই স্বদেশের "কুহু"—ধ্বনি আসিয়া জাগরিত হয় না? প্রতি-বিষয়েই যখন স্বদেশের স্মৃতিবিজড়িত, তখন কেমন করিয়া বলিব স্বদেশ ভুলিতে পারা যায়? যায়না সত্য, কিন্তু যে পাপী পাপের প্রলোভনে পড়িয়া

আনন্দ লাভ করে, সুদূরস্থিত মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাহার অক্ষুন্ন মমতা থাকে না, তবে যে স্মৃতিটুকু থাকে তাহা ক্ষণস্থায়ি বিদ্যুৎ-গতিবৎ। যখন সেই অন্তর্ভেদিনী স্মৃতি হৃদয়ে ওতোপ্রোত হয়, হৃদয় ঝলসিয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যে ক্ষণস্থায়ী, চকিতেই সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আর ফল কি! সে স্মৃতির আর কার্য্যকরী ক্ষমতা কোথায়? আমাদের সেই আদিম দেশের স্মৃতিও আজ আমাদের পক্ষে সেইরূপ।

কিরূপে দশের নিকট বাহবা পাইব, কিরূপে প্রতিষ্ঠার উচ্চাসনে স্থান লাভ করিব, আমরা সেই চিন্তাতেই জর্জ্জরীভূত, কিন্তু নিজের পরিণাম চিন্তা করিবার অবসর বিন্দুমাত্র নাই। ইহ সংসারের জন্য যাহা আবশ্যক আমরা প্রাণপাতে করিয়া জগতের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া তাহা সঞ্চয় করিতেছি—কিন্তু এতাবৎ ভব পারে যাইবার জন্য একটি কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতে পারিলাম না। আমরা সংসার সুখে নিমগ্ন, যেন এই নশ্বর সংসার আমাদের জন্য অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে, যেন তাহার সুখময় ক্রোড়ে আমাদের নশ্বর জীবন অবিনশ্বর হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিবে। ধরণীর সহিত জীবের যে গাঢ় সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট আছে তাহা নিশ্চয়, নচেৎ কর্ম্মনিষ্ঠ জীব পুনঃপুন সংসার ক্ষেত্রে যাতায়াত করিবে কেন? কিন্তু সকলেরই সীমা আছে, ইহ সংসারের সহিতও জীবের সমন্ধের সীমা আছে, যখন তাহারা সেই সীমার অতীত হয় তখন তাহাদিগকে আর জড়ীয় যাতনা ভোগ করিতে হয়না, তখন তাহারা চিন্ময় রাজ্যে অবস্থান করিয়া চিন্ময়ানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। সূক্ষ্ম জীবগণের দ্বারাই তখন মর্ত্তরাজ্য চলিতে থাকে। বিশ্বময়ের বিশ্ব রাজ্যে এই রূপ কত কোটি কোটি জীব সৃষ্ট ও মুক্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব আমাদের আদিম নিবাস মর্ত্ত্য ভূমি নহে, সেই চিন্ময় রাজ্যকেই আমাদের আদিম নিবাস বলিয়া অনুমিত হয়। আমরা সেইখান হইতে আসিয়াছি, সেইখানেই যাইব, সেই স্থানই আমাদের আদি, সেই স্থানই আমাদের অন্ত। অতএব এই নশ্বর ধরণীকে আমরা প্রবাস বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। যেমন ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ার্থে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া লাভাশায় সুদূর প্রবাসে গমন করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ আসিয়াছি; এই সংসার আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থানমাত্র। আমরা সংসার ক্ষেত্রে আসিয়া-

ছিলাম, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতিরত্নগুলি লাভ করিবার জন্য, কিন্তু লাভ করা দূরে থাকুক, আমরা নিজ অকর্ম্মণ্যতার দোষে মূলধন শুদ্ধ অপব্যয় করিয়াছি, এখন ভব পারের কড়ি হীন হইয়া আকুলপ্রাণে হে ভবপারের কাণ্ডারী! তোমার দয়ার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছি। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া যে রোদন আরম্ভ করিয়াছি সে রোদন আর ইহজীবনে শেষ হইল না।—সে হাহাকার আর ঘুচিল না।

বহুদিনের পর আজ সেই অমৃতময় রাজ্যের মধুর স্মৃতি আসিয়া হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু আমার সেই আদিম দেশে যাইবার উপায় দেখিতে পাইতেছিনা, কেননা এযাবৎ ভবপারের কড়ি কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারি নাই—ভব সমুদ্র তরিব কিরূপে ?

বল, প্রভো! তবে উপায় কি হইবে! তোমার মত দয়াল প্রভু থাকিতে দীন আমি ভব সাগরের তীরে গড়াগড়ি যাইব, তুমি কি ডাকিয়া লইবেনা, তুমি কি দয়া করিবেনা—আমি কি পারে যাইতে পারিব না? সামান্য নাবিকের ন্যায় পারের কড়ি না পাইলে তুমি কি পার করিবে না? তুমি কেবল সাধুকেই তরাইবে, তুমি কি পাপীর কেহ নহ? সাধুগণ আপন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ অতএব তাহাদের তরাইয়া তোমার আর পৌরুষ কি? আমার মত পাপীকে যদি পার না করিয়া, গর্ব্বিত মনুষ্যের ন্যায়, ভ্রুকুটি নেত্রে চাহিয়া, পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবে, তবে আর তুমি দয়াল কিসের! অথবা তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর! তোমার যদি দয়া থাকিবে, তোমার যদি বিচার থাকিবে, তবে প্রাণদানে প্যারী তোমাকে না পাইয়া চন্দনদানে কুব্জা তোমাকে পাইবে কেন?

অথবা তুমি রহস্যময়, তোমার রহস্য বুঝিতে আমার ক্ষমতা নাই। না প্রভো, কে বলে তুমি নিষ্ঠুর! তুমি দয়াল—পরমদয়াল! তুমি না জীবের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে তাহাদের পাপভিক্ষা করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছ। না না, কে এমন হৃদয়-হীন আছে যে তোমাকে নিষ্ঠুর বলিবে? তবে যে মানব যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে তাহাদের স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফল ভোগ মাত্র। তুমি জগতের রাজা, ত্রিলোকের রাজা, দোষগুণ বুঝিয়া সকলকে দণ্ড পুরস্কার করিতেছ, তোমার দোষ কি!

আমি ত প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার করুণার পরিচয় পাইতেছি, তুমি আমার

আপনার জন, বড় আপনার জন, যেন কতকালের পুরাতনসম্বন্ধ অথচ তাহাতে কত মধুরত্ব, কত নূতনত্ব, কত গাঢ়ত্ব, কত গুরুত্ব তাহা কেমন করিয়া বলিব! তুমি দূরে রহিয়াও নিকটে, নিকটে রহিয়াও দূরে, তুমি কাছে এস এস না, ধরা দাও দাওনা, হে রহস্যময়! তোমার রহস্য আমি কি বুঝিব? যাই হোক এখন তুমি আমাকে ভবপারের কড়ি দাও, তুমি যাহা দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলে আমি সেগুলি খোয়াইয়াছি, তুমি চিরকালই দাতা, আমি চির কালই গ্রহীতা, এখন তুমি না দিলে আমি কোথায় যাইব! হে রসময়! আমি শুনিয়াছি আমি বুঝিয়াছি তোমার ওই নামই ভব পারের কড়ি। তাই দয়াল দুভাই গৌর নিতাই জীবের দ্বারে দ্বারে তোমার ওই পবিত্রতাপূর্ণ রসময় নাম বিতরণ করিয়াছিলেন। তাই যখন জীব ইহলোক পরিত্যাগ করে আত্মীয় বান্ধবগণ তাঁহাকে তারক ব্রহ্ম নাম দেন। আমি বুঝিয়াছি এরূপ নাম দেওয়ার কারণ আর কিছুই নহে কেবল ভব পারের কড়ি সঙ্গে দেওয়া মাত্র। সেদিনও শ্রীপুরীধামস্থিত কোন সাধুভক্ত নাম প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে করিতে একস্থলে বলিয়াছেন,—

"এ ভব সাগর, হবে বালুচর,
হাঁটিয়া হইবি পার।"

কি মধুর প্রাণস্পর্শিনী কাহিনী! যাই হোক তোমার নামই ভব পারের কড়ি, তোমার রসময় নাম সম্বল না করিলে ক্ষেপনী ভব পারে লয়না বা ভব সাগর বালুচর হয় না। অতএব তোমার মধুর নামই ভবপারের এক-মাত্র কড়ি। দাও প্রভো! একবার প্রাণ ভরিয়া তোমার ওই নাম লইতে দাও, একবার ঐ মধুর নামে ঐকান্তিক রুচি দাও, আমি হাসিতে হাসিতে ভবপারে চলিয়া যাই, ভবসাগরের তীরে পড়িয়া আর কাঁদিতে পারি না প্রভো!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)।

সরস্বতী-বন্দনা।

যে ভক্ত-বৎসলা দেবীর আরাধনায় বৈমুখ্য-নিবন্ধন শৈশবে পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের নিদারুণ বেত্র-বিভীষিকা, তৎপশ্চাৎ উচ্চশিক্ষা কালে যাঁহার কৃপালেশ প্রাপ্তির প্রয়াসে, নিশীথের সুখ-সুপ্তি-বিসর্জ্জন, জ্ঞাননেত্রের সম্যগ্ উন্মীলনে, যাঁহার প্রসাদ-কণিকা লাভালাভের ফলে উত্তর কালসুলভ যশঃ সৌখ্যসম্ভোগ বা সানুতাপ কপাল-করাঘাত, সেই সরস্বতী দেবীর বন্দনায়, এস ভাই, এই মাঘের উৎসব দিনে আমরা সকলে সমকণ্ঠে মিলিত হই।

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজশৃঙ্গাটকবিহারিণীম্।
নিত্যং প্রগল্‌ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্॥

চতুর্ম্মুখ-মুখপদ্মে চতুষ্পথ রয়, তাহাতে বিহার যাঁর হইয়া তন্ময়,
নিরন্তর বাক্য-ছটা বদনে যাঁহার, সেই সরস্বতী-পদে প্রণাম আমার!

করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥

যাঁহার করুণাবল করিয়া আশ্রয়, কুশাগ্র-সমান-সূক্ষ্ম-বুদ্ধি কবিচয়
বদরীর মত এই অনন্ত ভুবন মুষ্টির ভিতর সদা করেন দর্শন,
জয় জয় জয় সেই দেবী সরস্বতী, দরিদ্র কবির যিনি একমাত্র গতি!

পাতু বো নিকষগ্রাবা মতিহেম্নঃ সরস্বতী।
প্রাজ্ঞেতরপরিচ্ছেদং বচসৈব করোতি যা॥

মতি-স্বর্ণ-পরীক্ষার স্থলে নিরন্তর একমাত্র যিনি তার নিকষ-প্রস্তর,
কেবা সুপণ্ডিত, আর কেবা মূর্খ জন এ দুটীর ক'রে দেন যিনি নির্ব্বাচন,
সেই দেবী সরস্বতী যেন সর্ব্বক্ষণ তোমাদের সুমঙ্গল করেন বর্দ্ধন!

শরণং করবাণি শর্ম্মদং তে চরণং বাণি চরাচরোপজীব্যম্।
করুণামসৃণৈঃ কটাক্ষপাতৈঃ কুরু মামম্ব কৃতার্থসার্থবাহম্॥

ওমা সরস্বতি! বলি হইয়া তন্ময় স্থাবর জঙ্গম যত এ সংসারে রয়,
সকলেরি একমাত্র জীবিকা-কারণ পরম মঙ্গলময় তোমার চরণ।
প্রাণধন বিদ্যাধন ব্যাপারের তরে বণিক্ হইয়া মাগো! ঘুরি এ সংসারে!

মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি অবিরল
কর এই দরিদ্রের বাসনা সফল!

তরুণশকলমিন্দো র্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥

কলামাত্র চন্দ্র যাঁর ললাট উপর,
শুভ্র-কান্তিময় যাঁর দেহ নিরন্তর,
স্তনভরে অবনত শরীর যাঁহার,
শ্বেত পদ্মোপরি যাঁর স্থিতি অনিবার,
করপদ্মে থাকি যাঁর পুস্তক-লেখনী
ধরিয়া রয়েছে শোভা ভুবন-মোহিনী,
বাক্যের দেবতা যিনি, সেই সরস্বতী
সবে সর্ব্ব-সিদ্ধি-দানে সদা দিন মতি!

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভি র্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

কুন্দপুষ্প, চন্দ্র আর তুষার মতন
যাঁর শ্বেতবর্ণ-রাশি ভুবন-মোহন,
শ্বেত বস্ত্র পরিধান যাঁর নিরন্তর,
যাঁর নিত্য স্থিতি শ্বেত পদ্মের উপর,
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর আদি দেবগণ
সর্ব্বদাই করিছেন যাঁহার চিন্তন,
বীণাদণ্ডে কর যাঁর পরম শোভন,
জড়তা নাশের যিনি পরম কারণ,
ঐশ্বর্য্য-শালিনী যিনি, দেবী সরস্বতী
তিনি যেন হন মোর একমাত্র গতি!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি. এ

দ্রব্যগুণ বিচার।

কর্ম্মরঙ্গ।

বাঙ্গালা নাম—কামরাঙা; ইংরাজী—Averrhoa Carambola; সংস্কৃত পর্য্যায়:—কর্ম্মরঙ্গঃ শিরালশ্চ বৃহদম্লো রুজাকরঃ। ভাঃ প্রঃ। সংস্কৃত নাম—কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ল, রুজাকর। অন্য নাম—কর্ম্মরক, কর্ম্মারক, পীতফল, কর্ম্মর, কর্ম্মার, ধরাফল, মুদ্গর। কামরাঙা এক প্রকার অম্ল ফল; একটু লম্বা; গায়ে ৫।৬টা শিরাযুক্ত। ফলের মধ্যে সরু নরম মজ্জা থাকে। ইহার গাছ মানুষের প্রায় ৫।৬ গুণ উচ্চ হয়; মানুষের চক্ষের আকৃতি যেরূপ ইহার আকার ঠিক সেইরূপ তবে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়; ডাঁটার দুই পাশে ফলগুলি সারি সারি লাগান থাকে। বকুলফুলের মত ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল হয়। ফুলের পাপড়ীগুলি ঝরিয়া গেলে মধ্যে কামরাঙা থাকে উহা ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হয়। অপক্ক অবস্থায় সবুজ রং থাকে তখন একটু দূর হইতে পাতা ও ফলে চেনাই দুষ্কর হয়। পাকিলে লালের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ হয়।

কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতকৃৎ। ভাঃ প্রঃ।

(পক্কের) রস—অম্ল মধুর; বিপাক— বীর্য্য—শীত; গুণ—বাতশ্লেষ্মনাশক, ধারক, বলপুষ্টি ও রুচিপ্রদ। প্রভাব—ধারক। কাঁচাফল অত্যন্ত অম্ল, পিত্তশ্লেষ্মকর ও বায়ুনাশক।

প্রয়োগ—ইহার অম্ল রন্ধন করিলে বেশ সুস্বাদু হয়। ইহাতে নানারূপ চাট্‌নিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁচা ফলের রস মন্দাগ্নির কোন কোন ঔষধের ভাবনাস্বরূপ প্রযুক্ত হয়। ইহার কচি পাতার রস অল্প চিনি সহ প্রয়োগ করিলে আমাশয় রোগে উপকার হয়। পাকা ফল মহিষ দুগ্ধে পিশিয়া লাগাইলে ফোড়া পাকাইবার উত্তম পুল্‌টিস্ হয়।

কলম্বী।

বাঙ্গালা নাম—কল্‌মীশাক। হিন্দী—করেবু বা কলম্বী; ইংরাজী—Convolvulus repens. সংস্কৃত নাম—কলম্বী, কড়ম্বী, শতপর্ব্বা, কলম্ব, কলম্বিকা, শম্বর। কলমীশাক অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, ইহা এক প্রকার

জলজ লতা বিশেষ; জলের উপরে ভাসে, শিকড় জলেই নামে—মৃত্তিকার আশ্রয় আবশ্যক হয় না, যে গুলি তীরের নিকটে থাকে সে গুলির শিকড় মাটির ভিতরেই প্রবেশ করে। পাতা লম্বা লম্বা। ফুল ঈষৎ বেগুণে রঙের, আকৃতি অনেকটা কল্‌কে ফুলের মত। ডাঁটা গুলি ফাঁপা ও পর্ব্বযুক্ত, কোমল বলিয়া শিশুর দুধ খাওয়াইতে অন্য নলের পরিবর্ত্তে পল্লীগ্রামে ইহাই ব্যবহৃত হয়। পাড়াগাঁয়ের অধিকাংশ পুরাতন পুষ্করিণীতে কলমী দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় হ্রদে যে কলমী শাক জন্মে তাহার ডাঁটা লম্বা ও শক্ত, তদ্দ্বারা লেখনী প্রস্তুত হয়; এই জন্যই "কলম" এই কথা প্রচলিত হইয়াছে।

কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্র কারিণী।

রস—মধুর কষায়; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—বায়ুপিত্ত নাশক, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর, গুরু, শুক্রকর (তাই বলিয়া অবশ্য শিমুলাদির ন্যায় অতটা নয়)। প্রভাব—স্তন্য বৃদ্ধিকর।

শাককে অনেকে অতি তুচ্ছ দরিদ্রোপযোগী খাদ্য বলিয়া মনে করেন এবং পথ্যাপথ্য বিচারেও অনেক স্থলে রোগীর পক্ষে শাক নিষিদ্ধ বটে কিন্তু কলমী-শাক এই অপবাদ হইতে অনেকাংশে অব্যাহত। প্রথমতঃ ধরিতে গেলে কোন শাকই তুচ্ছ জিনিষ নহে; ইহা সংযমি-বিধবা-ঋষি প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তি-দিগের আহার্য্য। দ্বিতীয়তঃ ইহাই জীবের অযত্নলব্ধ পাপস্পর্শশূন্য আদিম খাদ্য। তাই উক্ত আছে—

"স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্যদগ্ধোদরস্যার্থে কঃকুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥"

তার মধ্যে কলমীর অনেকগুলি বিশিষ্ট গুণ আছে। ইহা রন্ধনপূর্ব্বক উপাদেয় আহার্য্যরূপে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাতপিত্তঘটিত রোগে চিকিৎসকগণ কল্‌মীশাক-ভাতে ঘৃত সৈন্ধবযোগে পথ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার মস্তিষ্কস্নিগ্ধকারক ও চক্ষুর জ্যোতিঃবর্দ্ধক শক্তি আছে বলিয়া কথিত হয় এজন্য চিকিৎসকগণ দৃষ্টিদৌর্ব্বল্যে ও মস্তিষ্ক অধিক গরম হইলে ইহার রস চিনিসহ বা উপরিউক্ত প্রকারে পথ্য ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই প্রকারে ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকের স্তন্য ও পুরুষের শুক্র বর্দ্ধিত হয়। উপদংশ রোগের পরিণামে কলমীর রস পানে উপকার দর্শে।

টাট্‌কা কলমীর রস অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহাদ্বারা বমন হইয়া থাকে, এজন্য আফিং সেঁকো প্রভৃতি বিষ সেবিত হইলে ইহা দ্বারা বমন করাইতে অনেকে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

কলায়।

বাঙ্গালা নাম—মটর বা মটর কলায়; হিন্দী—কেরাও; ইংরাজী—Pisum Satwum. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কলায়ো বর্ত্তুলঃ প্রোক্তঃ সতীনশ্চ হরেণুকঃ॥ সংস্কৃত নাম—কলায়, বর্ত্তুল, সতীন, হরেণুক। মটরগাছ ময়দানে হয়। রবিশস্য সমূহের মধ্যে মটরও একটী। ইহার পাতা প্রায় ১ ইঞ্চি চওড়া ও প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা, পাতাগুলি সুন্দর সবুজ ও কোমল, মধ্যে মধ্যে শাদা দাগযুক্ত, গাছগুলি ভূমির উপরে লতাইয়া গিয়া নিবিড়ভাবে অবস্থিত হয়। ফুলগুলি বেগুণের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। এই গাছে লম্বা ছোট শিমের মত ফল উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে গোল গোল বীজ থাকে, তাহাই পাকিলে "মটর" নামে অভিহিত হয়। এই বীজ স্থানভেদে বা দেশভেদে ছোট, মাঝারি ও খুব বড় হইয়া থাকে।

কলায়ো মধুরঃ স্বাদুঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ।
পিত্তদাহকফ ধ্বংসী কষায় আমদোষকৃৎ॥

রস—মধুর ও ঈষৎ কষায়; বিপাক—মধুর, বীর্য্য—শীতল; গুণ—রুক্ষ, পিত্ত দাহ ও কফনাশক এবং (অধিক ভোজনে) আমদোষজনক। প্রয়োগ—মটরের ডাইল উত্তমরূপে রন্ধন করিলে অতীব সুস্বাদু হয়, মুগ, মসুর, বুঁট প্রভৃতি কয়েকটী ডাইলের যেরূপ সমাদর, ইহার সেরূপ আদর দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু আমরা অনেকবার দেখিয়াছি—পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণে ডাল তরকারী প্রভৃতি যত কিছু আয়োজন হয়, তন্মধ্যে মটর-ডাল বিশেষ সুস্বাদু ও সুগন্ধি হয়, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত স্মরণযোগ্য হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় পূজনীয়া সদ্‌ব্রাহ্মণীদিগের হাতের গুণ। মটর বীজ পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেও কোমল অবস্থায় কাঁচকলা, কপী, গোলালু প্রভৃতির সহযোগে রন্ধন হইয়া থাকে, তখন উহার মর্য্যাদা বড় কম

নয়। উক্ত কচি অবস্থায় ইঁহার নাম "মটরশুঁটী বা কলায়শুঁটী"। ইহা কিঞ্চিৎ গুরুপাক, কিন্তু দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যই হিতকর। মটরশুঁটি খোলায় অল্প সর্ষপতৈল ও কাঁচা লঙ্কার টুকরা সহ ভাজিয়া লইলে খাইতে বড় মুখরোচক হয়। শুনা যায় সহরে মদ্যপায়ীদিগের নিকটে ইহা বড়ই সোহাগের ধন। পক্ব মটর- ভাজিয়া তেল নুন মাখিলে বড় সুস্বাদু হয়, ইহা অগ্নি ও দন্তের সাহায্যবান্ যুবকদিগেরই যথার্থ সেব্য। যাঁহারা পাখী পুষিতে ভাল বাসেন, মটরের ছাতুকে তাঁহারা বিলক্ষণ চেনেন্। মটর-শাক শাক-সমূহের মধ্যে সুস্বাদুতায় উচ্চশ্রেণীস্থ বলিতে হইবে। পাড়াগাঁয়ে কৃষিজীবি-দিগের শরীরে যে শক্তি, তাহার অধিকাংশেরই মূলীভূত ঐ মটর-শাক, মটর-ডাল ও সেই অধমতারণ লবণ। অপিচ, পূর্ব্ববঙ্গে গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি উপনীত হইলে যে প্রায় কদাপি ফেরে না, তাহার কারণ প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতেই ক্ষেত্রজাত তণ্ডুল ও অন্ততঃ মটর-ডাল সঞ্চিত থাকে। জ্বালানি কাঠ ত কেবল-সংগ্রহ সাপেক্ষ। ক্ষুধারোগের প্রতিকারিত্ব ছাড়া মটর গাছের অন্য ঔষধীয় প্রয়োগ বড় দৃষ্ট হয় না। তবে রস—বিপাক বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে রোগবিশেষে ফল দর্শাইতে পারে সে কথা অবশ্য বিভিন্ন। প্লীহা, যকৃৎ, আমাশয়, বহুমূত্র, কাস প্রভৃতি রোগে মটর নিষিদ্ধ।

কসেরুক।

বাঙ্গালা নাম—কেশুর; পশ্চিমদেশে বলে—কসেরুয়া; ইংরাজী নাম—Kysoor Cipuss. সংস্কৃত পর্য্যায়:—গুণ্ডকন্দঃ কশেরুঃ স্যাৎ ক্ষুদ্রমুস্তা কসেরুকা। শূকরেষ্টঃ সুগন্ধিশ্চ সুগন্ধো গন্ধকন্দকঃ॥ সংস্কৃত নাম—গুণ্ড-কন্দ, কশেরু, শূকরেষ্ট, সুগন্ধি, সুগন্ধ, গন্ধকন্দক. ক্ষুদ্রমুস্তা কসেরুকা।

ইহা মুথা-জাতীয় ছোট গাছ, মুথা গাছ অপেক্ষা একটু বড় হয়, বালুকাময় ময়দানে, বিশেষতঃ নদীতীরে ঘাসের সহিত জন্মে। ইহার মূল গোলাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ, এক একটী সোয়া ইঞ্চ চওড়া হয়। ইহার অভ্যন্তরে দিব্য শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধ ও খাইতে মিষ্ট। একপ্রকার ছোট কেশুর আছে তাহা প্রায় মুথার মত। নদীর স্রোতে অনেক সময়ে ভাসিয়া আসে এবং বালকেরা কুড়াইয়া খায়।

কসেরুক দ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
পিত্তশোণিত দাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মরুচি স্তন্যকরং স্মৃতম্॥

(দুই প্রকার কেশুরের) রস—মধুর কষায়; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—গুরু, রক্তপিত্ত নাশক, দাহপ্রশমক; নেত্ররোগহর, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও শ্লেষ্মকর, অরুচি নাশক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

প্রয়োগ—কেশুরের ত্বক্ ফেলিয়া ধুইয়া একটু মিছ্‌রি সহকারে উৎকৃষ্ট 'জলখাবার' হয়, কলিকাতা অঞ্চলে ইহা এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে ইহা সর্ব্বদাই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। রক্তপিত্ত-রোগী, পিপাসার্ত্ত, জ্বর রোগী, স্বপ্নদোষগ্রস্ত ব্যক্তি ও স্তনদুগ্ধহীন প্রসূতির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা কিঞ্চিৎ শৈত্যকর, সুতরাং অতিরিক্ত শ্লেষ্মা থাকিলে নিষিদ্ধ। ঢোক গিলিতে বেদনা হইলে লোকে গোলমরিচের সঙ্গে কেশুর চিবাইয়া খাইয়া থাকে। রোগীর পক্ষে সমস্ত শাঁসটী না খাইয়া চিবাইয়া শুধু উহার রস খাওয়াই ভাল।

কস্তুরী।

বাঙ্গালানাম—মৃগনাভি বা কস্তুরী; হিন্দী—কস্তুরী; ইংরাজী—Musk. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—মৃগনাভি, মৃগমদঃ কথিতস্তু সহস্রভিৎ। কস্তুরিকা চ কস্তুরী বেধমুখ্যা চ সা স্মৃতা। সংস্কৃত নাম—মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তুরিকা কস্তুরী, বেধমুখ্যা। অন্যনাম—গন্ধধূলি, মৃগনাভিজা, অণ্ডজা, নাভী, মিশ্রা, যোজন-গন্ধিকা, মদলতা, যোজনগন্ধা, গন্ধবোধিকা, কালাঙ্গী, ধূমসঞ্চারী, গন্ধপিশাচিকা, বাত্মামোদ, মদনী, গন্ধকোকিলা, সুভগা, শ্যামা, কামান্ধা, ললিতা, মোদিনী।

মৃগনাভি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইহা একজাতীয় হরিণের নাভি মধ্যে উৎপন্ন হয়, ঐ হরিণকে বধ করিয়া লোকে উহার নাভি কাটিয়া লয়। ঐ নাভিকে চলিত কথায় 'নাভা বা নাফা বলে। উহার আকার গোল, উপরে ছোট ছোট লোম, বর্ণ ফিঁকে-ধূসর, এক একটী ওজনে তিন চারি

তোলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নাফা দেখিলেই বুঝা যায় যে জীব দেহ হইতে কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, যেহেতু কর্ত্তন-স্থান শুষ্ক কুঞ্চিত বিবর্ণ রক্তমাংসান্বিত দৃষ্ট হয়। এই নাফা চিরিয়া কস্তুরী বাহির করা হয়। কোনটীর মধ্য হইতে কৃষ্ণবর্ণ শক্তুর ন্যায়, কোনটী হইতে তিলের ন্যায়, কোনটার ভিতর হইতে বড় এলাচের দানা বা কুলথ কলায়ের সদৃশ, কোনটা হইতে ছোলা বা তদপেক্ষাও বড় দানা বহির্গত হয়। শুনা যায় একটী নাফা হইতে কদাচিৎ একটী জমাট দানা ও নির্গত হয়। উহা শতাধিক রৌপ্যমুদ্রায় বিক্রীত হইয়া থাকে। নেপাল দেশের রাজার নাকি ঐ রূপ বড় দানার একটী সুদীর্ঘ মালা আছে। উহা তিনি বিশিষ্ট পর্ব্বদিনে পরিধান করেন। মৃগনাভি প্রধানতঃ তিন প্রকার আছে, বচন যথা—

কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নৈপালী নীলবর্ণ যুক্।
কাশ্মিরী কপিলচ্ছায়া কস্তুরী ত্রিবিধা স্মৃতা॥

অর্থাৎ আসামের অন্তর্গত কামরূপে যে মৃগনাভি জন্মে তাহার বর্ণ কৃষ্ণ; নেপাল হইতে প্রাপ্ত মৃগনাভি নীলের আভাযুক্ত এবং কাশ্মিরী মৃগনাভির বর্ণ কপিল অর্থাৎ ঈষৎ ফিঁকে ধূম্রবর্ণ।

প্রকর্ষ নিকর্ষ বিষয়ে উক্ত আছে——

কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীর দেশ সম্ভূতা কস্তুরী হ্যধমা মতা॥

কামরূপজ মৃগনাভি শ্রেষ্ঠ, নেপাল দেশোৎপন্ন মধ্যম ও কাশ্মীরজ মৃগনাভি এই দু'য়ের অপেক্ষা হীন গুণ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উৎকর্ষাপকর্ষবিচারে অধিক ফল নাই, যেহেতু মৃগনাভির যেরূপ নকল চলে ও চলিতেছে, এরূপ অন্য কোনও মূল্যবান্ বস্তুরই সম্ভবে না। ধূর্ত্ত-বিক্রেতারা নানারূপ সুগন্ধি মশলা পিশিয়া যথাযথ বর্ণ উৎপাদন করিয়া তাহার সহিত অত্যল্প মৃগনাভি মিশ্রণ পূর্ব্বক আসল জিনিস্ বলিয়া বিক্রয় করে। এক তোলা বাজে জিনিসের মধ্যে ৵০ আনা মৃগনাভি থাকিলেও বিলক্ষণ গন্ধ থাকে। সোণা রূপা পরিচয়ের জন্য কষ্‌তি পাথর আছে, হীরা মুক্তার কৃত্রিমতাও নিপুণ চক্ষুর সমক্ষে ধরা পড়ে, কিন্তু মৃগনাভি শুধু দৃষ্টি ও ঘ্রাণ মাত্রেই চিনিবে এরূপ সাধ্য কার? ক্রেতার সন্দেহ

পরিহারের জন্য শঠ ব্যবসায়ীরা (মৃগনাভি শূন্য) খালী "নাফা" সংগ্রহ করিয়া, উহা জলে ভিজাইয়া কোমল করে, পরে উহার মধ্যে মৃগনাভির রূপ-গন্ধধারী কৃত্রিম বস্তু পূরিয়া বোঁটার স্থানে দড়ী বাঁধিয়া রৌদ্রে রাখে, উহা শুকাইয়া গেলে ঐ দড়ী খুলিয়া ফেলে; তখন উহা দেখিতে ঠিক মৃগনাভি পূর্ণ সত্য নাফা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ব্যবসায়ীরা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক অজ্ঞ ক্রেতার সম্মুখে উহা কাটীয়া বাহির করিয়া অধিক মূল্য লয়।

যাহা হউক মৃগনাভি চিনিবার জন্য শাস্ত্রে এই লক্ষণ উল্লিখিত আছে—

যা গন্ধং কেতকীনাং হরতি পরিমলৈর্ব্বর্ণতঃ পিঞ্জরাভা।
স্বাদে তিক্তা কটুর্বা লঘু রথ তুলিতা মর্দ্দিতা চিক্কণা স্যাৎ॥
দাহং যা নৈতি বহ্নৌ চিমিচিমি কুরুতে চর্ম্মগন্ধা হুতাশে।
সা কস্তুরী প্রশস্তা বরমৃগ তনুজা রাজতে রাজ-ভোগ্যা॥

অর্থাৎ যাহা কেতকী ফুলের ন্যায় গন্ধযুক্ত, যাহার বর্ণ হস্তীর চর্ম্মের বর্ণ সদৃশ, আস্বাদে কটু ও তিক্ত, ওজনে লঘু, মর্দ্দনে চিক্কণ হয়, যাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে না জ্বলিয়া চিম্ চিম্ শব্দ করিতে থাকে এবং দগ্ধ চর্ম্মের গন্ধ নিঃসারণ করে, সেই কস্তুরীই প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট মৃগোৎপন্ন ও রাজগণের ব্যবহার যোগ্য।

পরীক্ষান্তর—

করতল জলমধ্যে স্থাপনীয়া মহদ্ভিঃ।
পুনরপি তদবস্থং চিন্তনীয়ং মুহূর্ত্তম্॥
যদি ভবতি চ রক্তং তজ্জলং পীতবর্ণং।
ন ভবতি মৃগনাভিঃ কৃত্রিমোয়ং বিকারঃ॥ কাঃ

অর্থাৎ করতলমধ্যে জল রাখিয়া তদভ্যন্তরে একটু মৃগনাভি স্থাপন করিবে, তদনন্তর নিপুণ দৃষ্টি পূর্ব্বক মুহূর্ত্তেক উহা প্রণিধান করিবে; ঐ জল যদি লাল বা পীত বর্ণ হয় তবে নিশ্চয়ই উহা মৃগনাভি নহে; কোনও কল্পিত বিকার মাত্র।

গন্ধ বৈলক্ষণ্যের স্বাভাবিক কারণ।

বালে জরতি চ হরিণে ক্ষীণে রোগিণি চ মন্দগন্ধ যুতা।
কামাতুরে চ তরুণে কস্তূরী বহুল-পরিমলা ভবতি॥ রাঃ নিঃ

অত্যল্প বয়স্ক, বয়োজীর্ণ, ক্ষীণ বা রোগগ্রস্ত হরিণের কস্তুরী মন্দগন্ধ যুক্ত

হয়। কামাতুর ও তরুণবয়স্ক মৃগের কস্তুরী উজ্জ্বল ও বহু সৌরভান্বিত হইয়া থাকে।

কস্তূরিকা কটু স্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ।
কফবাতবিষচ্ছর্দ্দি শীত দৌর্গন্ধ্য শোষহৃৎ॥ ভাঃ প্রঃ

রস—কটু ও তিক্ত; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, গুরু, কফ ও বায়ুনাশক, বিষহর, বমি ও দৌর্গন্ধ নাশক (অর্থাৎ ইহার সাহায্যে বস্ত্বন্তরে সৌগন্ধ্য হয়)। প্রভাব—(১) শুক্রল (কটু-তিক্ত রস অবৃষ্য, তথাপি প্রভাব বশতঃ ইহা শুক্রল) 'শুক্রল' বলিতে এখানে শুক্রজনক, উত্তেজক ও শুক্রস্তম্ভকর বুঝিতে হইবে, যেহেতু প্রত্যক্ষে মৃগনাভিতে এই গুণত্রয় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(২) শীতহর, অর্থাৎ দেহের উষ্ণতা জনক। (৩) শোষহর অর্থাৎ ক্ষয় নিবারক, যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তির সপ্তধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে ইহার তন্নিবারণ শক্তি প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবের সহিত কোনও দৈহিক ধাতু নির্গত হইতে থাকিলে ইহাদ্বারা তাহার নিবারণ হয়।

গুণে ইহা বায়ুনাশক উক্ত হইয়াছে। ইহা কিরূপ বায়ুনাশক? ইহা কি রাত্রি জাগরণান্তে বা অতিশ্রমান্তে ডাবের জল বা মিশ্রী-সরবতের ন্যায় কথায় কথায় ব্যবহার্য্য? তাহা নহে। ইহা হিক্কা শ্বাস অপস্মার ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি আক্ষেপাত্মক বায়ুর ও স্নায়বিক শিথিলতার (nerve-prostration) প্রতিষেধকারী। পুনশ্চ ইহা বমি নাশক, অর্থাৎ ক্ষয় ও রক্তপিত্ত রোগীর কফ-মিশ্র বমিতে অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োজ্য, অজীর্ণ বমিতে নহে।

কস্তুরী বিষয়ে নূতন শ্লোক।

আক্ষেপহরণঃ স্বেদজননঃ কামদীপনঃ।
হিক্কাঘ্নো মূত্রলো বল্যঃ কিঞ্চিন্মদকরঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ ইহা আক্ষেপ নাশক, স্বেদজনক, কামদীপক, হিক্কাহর, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক ও কিঞ্চিৎ মত্ততাজনক। ভাবপ্রকাশধৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী হইতে এই গুণগুলি পাওয়া যায়না মনে করিয়া জনৈক আধুনিক কবিরাজ ইংরাজি হইতে এই শ্লোক রচনা করিয়া তৎকৃত দ্রব্যগুণ গ্রন্থে সমাবেশিত করিয়া-

ছেন। আমাদের ধারণা এই শ্লোক দ্বারা নূতন কিছু বলা হয় নাই; তবে অর্থাভিব্যক্তির জন্য অধিকন্তু ন দোষায়। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে শরীর উষ্ণ ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ মাদকতা প্রকাশিত হইয়া থাকে, নতুবা নহে।

কস্তরীকে শুধু "মূত্রল" বলিয়া জানিয়া রাখিলে চলিবে না, যেহেতু ইহার মূত্রাধিক্যনাশ শক্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই শক্তি থাকায় ইহা আয়ুর্ব্বেদ মতে বহুমূত্রের ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। ইহা স্বেদ ও মূত্রজনক কিরূপে হয়? না,—ইহা অনেক সময়ে, উদরস্থ হইবার পর শোষিত হইয়া দেহোত্তাপ উৎপাদন পূর্ব্বক মূত্রগ্রন্থি (kidney) ও লোমকূপদ্বারা আংশিক নির্গত হইয়া যায়, তৎকালে প্রস্রাব ও ঘর্ম্ম আবির্ভূত হয়। ইহা সোরা, শ্বেত পুনর্ণবা প্রভৃতির ন্যায় মূত্রল নহে।

নির্ঘণ্ট রত্নাকর শ্লোকঃ।

কস্তুরিকাতু চক্ষুষ্যা কট্বী তিক্তা সুগন্ধিকা।
উষ্ণা শুক্রপ্রদা গুর্ব্বী বৃষ্যা ক্ষারা রসায়নী॥
কিলাস কুষ্ঠ মুখরুক্ কফ দৌর্গন্ধ্য নাশিনী॥
অলক্ষ্মীমল বাত তৃট্ ছর্দ্দি শোষ বিষাপহঃ।
শীতঞ্চ কাস রোগঞ্চ নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতঃ॥

কস্তুরী চক্ষুর উপকারী, কটু ও তিক্তা, সুগন্ধি, উষ্ণ, শুক্রপ্রদ, গুরু, বৃষ্য (কামোদ্দীপক) ক্ষারযুক্ত, রসায়ন, কিলাস ও কুষ্ঠহর, মুখরোগঘ্ন, কফ ও দৌর্গন্ধ্য নাশক। অলক্ষ্মীহর, মলশোষক, বায়ুপ্রশমক, তৃষ্ণা-বমি-ক্ষয়-বিষ নাশক, দেহশৈত্য ও কাসরোগের প্রশমকারী বলিয়া প্রখ্যাত।

প্রয়োগ—মৃগনাভির প্রধানপ্রয়োগ বাতশ্লেষ্মজ্বরের বিকারাবস্থায় ক্ষয়কাসে, পুরাতন বহুমূত্র রোগে এবং যে কোনও রোগ জন্য দেহোষ্মার হ্রাস ও নাড়ী ক্ষীণতায়।

জ্বরবিকারে যখন রোগীর জীবনীশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, মৃদু মৃদু প্রলাপ ও তন্দ্রাভাব, শয্যান্বেষণ আদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, চক্ষু আবিল ও শূন্যাভ, আকস্মিক চমক বা মৃদু আক্ষেপ, নাড়ী ক্ষীণ দ্রুত সূক্ষ্ম হয়, হৃৎস্পন্দন

জনিত শব্দ দ্বয়ের প্রথমটী শুনা যায় না, রোগী নির্জ্জীব জড় বস্তুর ন্যায় শ্লথ ও উত্তান হইয়া থাকে, এমন অবস্থায় মৃগনাভি মহোপকারক।

বহুমূত্র রোগে অবশেষে রোগীর দেহ যখন অতীব শিথিল, অবসন্ন, থসথসে ও কফাধিক্য সূচক এবং পৃষ্ঠব্রণ বা অন্য স্ফোটকাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে থাকে তখনই মৃগনাভির যথার্থ উপকার দৃষ্ট হয়। সাধারণ বহুমূত্রে ইহার প্রয়োগ ততটা ফলপ্রদ নহে বরং উত্তাপ ও পিপাসা বর্দ্ধিত করে।

বাতশ্লেষ্ম ঘটিত ধনুষ্টঙ্কার ও হিষ্টিরিয়া রোগে মৃগনাভির প্রয়োগ সদ্য-ফলপ্রদ; তদবস্থায় স্নায়বিক উত্তেজনা হ্রাস করিয়া অনিদ্রা নিবারণ করে। ক্ষয়রোগেও অন্যবিধ দূষিত কাসরোগের ফুস্ ফুস্ প্রদাহ হইলে এবং তৎসঙ্গে মৃদু মৃদু জ্বর ও অধিক অবসন্নতা থাকিলে ইহার প্রযোগ দৃষ্টফল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারে সাতিশয় "বুক্ ধড় ফড়ানি"র সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী মূর্চ্ছা লক্ষিত হইলে মৃগনাভি দ্বারা বিশেষ ফল হয়। মৃগনাভির বাহ্য প্রয়োগে দূষিত ক্ষত ও কুষ্ঠাদি আরোগ্য হয়, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে এই মূল্যবান্ বস্তুর প্রয়োগাপেক্ষা করবীরাদি বহুবিধ সুলভ উদ্ভিজ্জ বিশ্বসংসারে রহিয়াছে।

ডাঃ কলেন বলেন রসবাত রোগ (gout) আরোগ্যোন্মুখ হইলে তখন মৃগনাভি ব্যবহার করা উচিত, তদ্দারা সম্পূর্ণ প্রতিকার লাভ হয়, ও দেহ সবল হইয়া রোগবীজ এককালীন্ দূরীভূত হয়। ডাঃ উড বলেন—ইহা হিক্কা নিবারণেরও মহৌষধ এবং এই উপদ্রবে অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে ইহার শক্তি অমোঘ। যাবতীয় রোগের শেষাবস্থায় যখন দেখা যায়, নাড়ী ক্ষীণ, হস্তপদ শীতল হইয়া প্রাণবায়ু উড্ডীন হইবার সূচনা, তখন ইহার প্রয়োগ চিরপ্রসিদ্ধ। দেখা গিয়াছে মৃগনাভি খাঁটী হইলে সেই অন্তিমাবস্থায় লুপ্ত নাড়ীও পুনঃপ্রকাশ পায়, শরীরের উত্তাপ ফিরিয়া আসে, তবে বাঁচা না বাঁচা ঈশ্বরাধীন। মকরধ্বজের সহিত প্রযুক্ত হইলে এই শক্তি সমধিক প্রক-টিত হয়। বৃদ্ধাবস্থায় যখন সর্ব্বদা রোগপ্রবণতা বা কফ কাশী হইতে থাকে, তখন একটু একটু মৃগনাভি সেবন অভ্যাস করা ভাল, ইহাতে দেহ সবল ও দৃঢ় এবং জরার দ্রুত নিপাতন হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হয়। বার্দ্ধক্যজনিত জীর্ণাবস্থায় যাঁহারা আফিং অভ্যাস করেন, তাঁহাদের আফিঙ্গের সঙ্গে সামান্য

পরিমাণে মৃগনাভি সংযুক্ত হইলে দেহের তেজঃ অপেক্ষাকৃত অধিক অনুভূত হইতে পারে।

প্রসবান্তে অবসন্নাদি নিবারণজন্য আজকাল স্ত্রীলোকদিগকে ভাল ব্র্যাণ্ডী পোর্ট (মদ্যবিশেষ) খাওয়ান হইয়া থাকে ; ইহার পরিবর্ত্তে একটু একটু মৃগনাভি সেবন করাইলে, এই অভীষ্ট অধিকতর সিদ্ধ হইতে পারে।

মৃগনাভির মাত্রা—সিকিরতি হইতে পাঁচ রতি পর্য্যন্ত। সাধারণ মাত্রা ১ রতি। ধাতু বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে কমবেশী করা আবশ্যক হয়। মৃগনাভি ঘটিত শাস্ত্রোক্ত ঔষধ যথা,—জ্বর বিকারের "কস্তুরীভৈরব," মেহাদির "বসন্তকুসুমাকর," যক্ষ্মার "বসন্ততিলকরস" ও কাঞ্চনাভ্র" বহুমূত্রঘ্নও রসায়ন "মহানীলকণ্ঠ রস, মেহ ধাতুদৌর্ব্বল্যের "কস্তুরী মোদক" রসায়ণও বাজীকরণের বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, অমৃতপ্রাশঘৃত, বাতব্যাধির মহারাজ প্রসারণী তৈল ইত্যাদি।

কাঁটানটে।

বাঙ্গালা নাম—উপরি উক্ত ; হিন্দী নাম—চোলাই বা চৌড়াই ; ইংরাজী—Prikly Amaranth. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডের তণ্ডুলেরক। ভণ্ডীর স্তণ্ডুলীবজো বিষঘ্ন স্বল্পমারিষঃ। সংস্কৃত নাম—তণ্ডুলীয়, মেঘনাম, কাণ্ডের তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলীবীজ, বিষঘ্ন, অল্পমারিষ।

কাঁটানটের গাছ ঝোপযুক্ত, এক বা দেড় হাত উচ্চ পাতা ঈষৎলম্বা—এক বা দেড় ইঞ্চ চওড়া, ডালে কাঁটা থাকে জঙ্গলে বা পতিত জমিতে অযত্নে ও বহুল পরিমাণে জন্মে। এই গাছ নানা জাতীয় আছে ক্ষুদেনটের উল্লেখকালে দ্রষ্টব্য।

তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্ত কফাস্রজিৎ।
সৃষ্ট মূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষ হারকঃ॥

রস—মধুর, বিপাক—মধুর ; বীর্য্য—শীত ; গুণ—রুক্ষ, কফপিত্তঘ্ন, রক্ত রোধক, রুচিকর, অগ্নিদীপক, প্রভাব—মলমূত্র শোধক, বিষহর (বাটিয়া প্রলেপ দিলে কীটজ বিষনাশক।)

কাঁটানটের পাতার গুণ।

তণ্ডুলীয়কদলং হিমমর্শঃ পিত্তরক্তবিষকাসবিনাশি।
গ্রাহকং সমধুরং চ বিপাকে দাহশেষশমনং রুচি-দায়ি॥
রাজনির্ঘণ্ট।

কাঁটা নটের পাতা শীতল এবং অর্শ, রক্তপিত্ত, বিষ দোষ (প্রলেপে) ও কাসনাশ। মলরোধক, পাকে মধুর, দাহ ও ক্ষয় (রক্ত ও শুক্রের) প্রশমক, এবং রুচিপ্রদ।

মূলের গুণ।

তণ্ডুলীয়ক মূলং স্যাদ্ উষ্ণং শ্লেষ্মবিনাশনম্।
রজোরোধকরং রক্তপিত্ত প্রদর সংহরম্॥ (সংগ্রহোক্ত)

কাঁটা নটের মূল উষ্ণবীর্য্য, শ্লেষ্মনাশক, রজোরোধক, রক্তপিত্ত ও শ্বেত-প্রদর নিবারক।

প্রয়োগ—সচরাচর ইহার মূলের রস বা পিষ্ট মূল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ঈষৎ ধারকগুণ যুক্ত বলিয়া মেহ আমাশয় রক্ত পিত্ত ও প্রদর প্রভৃতি রোগের স্রাব নিবারণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। উর্দ্ধগ অপেক্ষা অধোগ-স্রাব নিবারণেই ইহার অধিকতর শক্তি। কাঁটানটের মূল অল্প গোলমরিচসহ বাটিয়া লাগাইলে মাথাধরা ও শির-দব-দবানি আরোগ্য হয়। কাঁটানটের মূল, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, শ্যামালতা ও শিরিষ বল্কল একত্র জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের জ্বালা নিবারণ হয়। ভাঃ প্রঃ। কাঁটানটের মূল ও রসাঞ্জন, তণ্ডুলজল ও মধুসহ সেবনে রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়। ভাঃ প্রঃ। শুঁঠ, কাঁটানটের মূল ও বামনহাটী ঈষদুষ্ণ জলসহ সেবন করিলে শ্বাস দুরীভূত হয়। ভাঃ প্রঃ। শাস্ত্রোক্ত অশোকঘৃতে কাঁটানটের মূল আবশ্যক হয়।

কাঁঠাল।

বাঙ্গালা নাম—ঐ, হিন্দী কট্‌হর; ডাক্তারী নাম—Jack or Artocarpus. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—পনসঃ কণ্টকিফলঃ পনশোতি বৃহৎফলঃ। সংস্কৃত নাম—পনস, পনশ, কণ্টকি ফল, অতি বৃহৎ। অন্যান্য নাম—অপুষ্প, ফলদ,

স্থূলকণ্টফল, আশয় মুরজফল, পনস্, চম্পাকোষ, মৃদঙ্গফল, মহাসর্জ্জ, ফলিন, কণ্টাফল, পূতফল।

কাঁঠালের গাছ বোধ হয় কাহারও অজ্ঞানা নাই। ফলের ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ব এবং মিষ্টতার অল্পাধিক্য হেতু ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আছে। এক জাতীয় কাঁঠাল আছে, তাহারি অধিকাংশ ফলই মূলদেশের নিকটে জন্মে, ফল বড় হইলে ক্রমে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ও তথায় পরিপক্ক হইলে বাহির করিয়া লইতে হয়। আর এক প্রকার কাঁটালের কোষের অভ্যন্তর হইতে গোলাপজলের মত রস বাহির হয়।

পনসং শীতলং পক্বং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্।
তর্পণং বৃহণং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্॥
বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্ত ক্ষতব্রণান্।
মজ্জাপনসজো বৃষ্যো বাতপিত্তকফাপহঃ।
বিশেষাৎ পনসো বর্জ্জ্যো গুল্মিভির্মন্দবহ্নিভিঃ॥

কাঁঠালের মজ্জা শুক্রবর্দ্ধক, বাতপিত্তকফঘ্ন; গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্য রোগীর ইহা বিশেষরূপে পরিত্যাজ্য।

(পক্কের) রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীতল; গুণ—স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, তর্পণ (আপ্যায়নকারী বা পোষণ) বৃংহণ (স্থূলতাকর) মাংসবর্দ্ধক, অত্যন্ত শ্লেষ্মপ্রদ, বলকর শুক্রজনক ও জীর্ণ রক্তপিত্তরোগী ও ক্ষত এবং ব্রণ রোগীর উপকারী।

অপক্ক কাঁঠালের গুণ।

আমং তদেব বিষ্টম্ভি বাতলং তুবরং গুরু।
দাহকৃন্ মধুরং বল্যং কফ মেদোবিবর্দ্ধনম্।

কচি কাঁঠাল (ইঁচড়) গুরুপাক উদরের স্তম্ভজনক, বায়ুবর্দ্ধক, (অতি ভোজনে) দাহজনক, মধুর কষায়রস, বলকর ও কফমেদো বৃদ্ধিকর।

কাঁঠালবীজের গুণ।

পনসোদ্ভূত বীজানি বৃষ্যানি মধুরানি চ।
গুরুনি বদ্ধবিট্কানি সৃষ্ট মূত্রানি সংবদেৎ॥

কাঁঠালের বীজ শুক্রকর ও কামোদ্দীপক, সুমধুর, গুরুপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা-কর, মূত্রনিঃসারক।

প্রয়োগ—পক্ক কাঁঠালের কোষ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে গুলি স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ কঠিন তাহা উত্তম "জলখাবার" হয়, আর যেগুলি অতি কোমল তাহার রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইলে অতীব রসনাসুখকর হইয়া থাকে। কাঁঠাল অতি উৎকৃষ্ট ফল, তবে যে উহা আধুনিক ভদ্রসমাজে ততটা আদৃত হয় না, তাহার কারণ যে উহা পরিপাক করা বড় সহজ নয়। এতদ্ ব্যতীত ইহার কোনও অপরাধ নাই; সমধিক ভোজন-শক্তি শিক্ষিত সমাজের অভ্যন্তরে ক্রমে গল্পকথা হইয়া দাঁড়াইতেছে, সুতরাং কাঁঠাল অপথ্য বই আর কি? জীর্ণ হইলে ইহা অত্যন্ত বলকর পুষ্টিকর ও শুক্রের গাঢ়তা বৃদ্ধিকারক। বিশেষতঃ কাঁঠালের বীজ অতীব উপাদেয় জিনিস্। ইহা যেমন সুস্বাদু, তেমনি বলপুষ্টিকর, বহুল-প্রচলিত গোলালু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাঁঠালের সময়ে যত্ন করিয়া বালুকার অভ্যন্তরে রাখিলে তদ্দারা সারাটা বৎসর রন্ধনের এক সুন্দর উপকরণ সর্ব্বদাই গৃহে প্রস্তুত থাকে। অভাবে শুধু ভাতে দিয়া তৈল-লবণ মাখিয়া খাইলেও বেশ্ রুচির সঙ্গে অন্ন উদরসাৎ করা করা যায়। কি নিরামিষ তরকারীতে কি মৎস্যের ঝোলে উভয়ত্রই ইহা বেশ্ মজে। সিদ্ধ হইলে ইহার ভিতরে যে আঠাবৎ অংশ লক্ষিত হয় তাহা শরীরের ও মস্তিষ্কের পুষ্টি সাধক এবং শুক্রের গাঢ়তা সম্পাদক। ইহা কাট খোলায় বা বালুকাসহ ভাজিয়া লইয়া খাইতে অতীব সুস্বাদু হয়; এমন কি, ভাজার চূর্ণসহ যদি কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যথাপ্রয়োজন সুজি চিনি ঘৃতাদি মিশাইয়া এক নূতন খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারেন তবে উহার নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সমাদর হয়, বিশেষতঃ উহা বিলাতে পাঠাইতে পারিলে নীরস-বিস্কুট-সেবী ইংরাজদিগের নিকটে সম্ভবতঃ আদ-রের পরাকাষ্ঠা পাইতে পারে। ফলতঃ কাঠাল ফল সুপক্ক কোষের জন্য না হউক নিজ-প্রসূত বীজগুলির জন্য যে বিশেষ সমাদর যোগ্য তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। রীতিমত বীজের ব্যবসায় প্রচলিত থাকিলে গোলালুর অতটা গুমর থাকিত না। ঔষধীয় ভাবে দেখিতে গেলেও ইহার কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তি আছে। কোমরে দদ্রু হইলে ইহার কচি পাতা কোমরে লাগাইয়া

কাপড় পরিয়া থাকিতে হয়; তাহাতে অনেকের আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি, কাঁঠালের ভোঁতা (অন্তর্ধূমে) উত্তমরূপে পোড়াইয়া ক্ষার করিয়া লইয়া তাহার সহিত সিজের আঠা ও হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে উহা বিলীন হয়। এই ক্ষারে শোধিত হিং চূর্ণ মিশাইয়া গোমূত্রসহ পান করিলে প্লীহার নির্যাতন হয়। পল্লীগ্রামে এরূপ বিশ্বাস আছে যে প্লীহারোগী একটী সমগ্র কাঁঠাল একলা একযোগে খাইতে পারিলে প্লীহা আরোগ্য হয়, এ প্রক্রিয়া অবিশ্বাস-যোগ্য নয়, তবে সহুরে লোকের পক্ষে ইহা কদাপি খাটেনা। বহুমূত্র ও অজীর্ণ রোগীর পক্ষে কঁাঠালবীজ অনিষ্টকর। কাঁঠালের আদা ক্ষীর জমাইয়া পাখী ধরিবার আঠা প্রস্তুত হয়।

সমালোচনা।

ভৌতিকতত্ত্ব—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ বসু প্রণীত। মূল্য ১৲। ইহাতে প্রকৃতিদেবীর বাহ্যান্তর গঠনসৌষ্ঠব ও নিগূঢ় প্রক্রিয়া কলাপের বিচারণা আছে। এই নুভেল-নাটক-বিভ্রাটের দিনে এমন সুরুচি-সম্পন্ন জ্ঞানপ্রদ পুস্তক যিনি রচনা করেন তিনিও ধন্য, আর যাঁহার পড়িবার স্পৃহা হইবে তিনিও ধন্য। অমৃত বাবু যদিও কালের দুর্দ্দম পরিবর্ত্তনে জীবিকার জন্য পর-বৃত্তি ভোগী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ধমনীতে স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানপিপাসুতার অপ্রতিহত প্রবণতা সঞ্চারিত হইতেছে; যেহেতু তাঁহার পিতা (৺নবীনকৃষ্ণ বসু) ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এক প্রধান আদর্শস্থানীয় অধ্যাপক ছিলেন। তাই অমৃত বাবুর লেখা ও মুখের কথা—এতদুভয়ের কোনটাই বাজে দেখিতে পাইনা—সকলই শিক্ষাপ্রদ ও গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ। এ পুস্তক স্কুলের পাঠ্যরূপে প্রচলিত হওয়া উচিত।

কবিতা কুঙ্কুম—মূল্য ৵০ আনা মাত্র। বেশ সুলভ। উপরে গ্রন্থ-কারের নাম শ্রীশ্যামলাল বসাক;—বিদ্যারত্ন, কবিরত্ন বা এম্ এ বিএ, প্রভৃতির কিছুই নয়। কিন্তু ভিতরে প্রবেশমাত্রই চমৎকৃত হইলাম, বুঝিলাম উপাধি ব্যাধিরেবচ" বহন করিয়া কি হয়? ঈশ্বর দত্ত ও অধ্যবসায়-বর্দ্ধিত

শক্তিই যথার্থ সারবস্তী। স্বর্গ ব্রাহ্মণ, এবং পল্লীটিকা ছন্দোবিরচিত কয়েকটী কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। বাহাদুরী এই, ইহাতে একটীও চাঁদিমা মু’খানি প্রভৃতি হুলি-চালানের ভুঁইফোড় কবিদিগের সদা-সেবিত কথা নাই। লেখায় বেশ্ খাঁটী বাঙ্গালা, গাম্ভীর্য্য ও ভাবুকতা আছে। স্থানে স্থানে কেবল একটু শ্রুতিকটু হইয়াছে। তা’ অত গুণের ভিতরে ক্ষমনীয় বটে।

সঙ্গীত-সমিতি—বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে অবস্থিত। উদ্দেশ্য, সারাদিনের নিজ নিজ পরিশ্রমান্তে দশ ভদ্রলোকে মিলিত হইয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে পারেন। উদ্দেশ্য বড় মহৎ। কলিকাতা শ্যামবাজারের সুনামখ্যাত উদারচেতাঃ শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ বসু মহাশয় ইহার স্থাপয়িতা। তিনি এই সমিতির জন্য কায়িক আর্থিক নানাভাবে বহু ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক্ষণে সুযোগ্য অধ্যক্ষ দ্বয়ের হস্তে ভারার্পণান্তে স্বয়ং অবসর লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপালবাবু, সতীশবাবু ও প্রসাদদাস ইহার প্রধান স্তম্ভত্রয় স্বরূপ, তজ্জন্য প্রথম হইতেই সমিতির বেশ উন্নতি হইতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে মাননীয় ছোট লাট মহোদয় সমিতির কার্য্য কলাপ ও আয়োজন দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন—সেদিন সমিতিভবনে “ন স্থানং তিলধারণং” হইয়াছিল। সঙ্গীত সমাজ নামে এই জাতীয় আর একটী সভা আছে, সেইটী প্রথমে গঠিত হইয়াছিল, আমরা উভয় সভারই হিতকামনা করি। বারান্তরে উভয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

জুয়েলার—শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ একজন সিদ্ধ-হস্ত প্রসিদ্ধ জুয়েলার। ইহার দোকানে অতি উৎকৃষ্ট সুবর্ণালঙ্কার স্বল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত হয়। অবিনাশ বাবু কলিকাতার এক সুবিখ্যাত বুনিয়াদী বংশোদ্ভূত। আমরা তাঁহার দ্বারা কএকটী কার্য্য করাইয়া দেখিয়াছি তাঁহার কাছে প্রবঞ্চনা বা প্রপীড়নের আশঙ্কা নাই। দোকানের ঠিকানা ১।১৬৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। ১৯০০, ফেব্রুয়ারী। ১৩০৬, ফাল্গুন।

মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲।

ঋষি

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যামন্দির

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—গোপাল-স্তোত্রম্, অহঙ্কারের দোষ ও গুণ, সফল অনুতাপ, বিধবারা হিন্দু সমাজের ভূষণ, চিনির-বলদ, হিন্দু-ললনা, চরকায় নীতি, দ্রব্যগুণ বিচার।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। } { ১০৩৬, ফাল্গুন।

গোপাল-স্তোত্রম্।

(৺ ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-বিরচিতম্)

পরম পূজ্য, প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্তবটীর রচয়িতা। যখন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি এই শ্লোকগুলি এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে রচনা করিয়া ছিলেন। ভাবের মাধুর্য্য, ভক্তির প্রাচুর্য্য, ভাষার সৌন্দর্য্য ও রচনার চাতুর্য্য দেখিলেই তাঁহার কবিত্ব ও হৃদয়বত্তার আশ্চর্য্য প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। বাল্যকালেই বড়লোকের যে প্রতিভার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্লোক গুলিই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। কি সূত্রে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্তবটী রচনা করিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের কথায় বলিয়া দিলাম :—

"সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে, মধ্যে মধ্যে, পদ্য রচনা করিতে বলিতেন। তদনুসারে, অনেকেই, তাঁহার সমক্ষে বসিয়া, পদ্য রচনা করিতেন। আমি, অক্ষম বলিয়া, পদ্য রচনায় কদাচ প্রবৃত্ত হইতাম না। বার্ষিক পরীক্ষার রচনায় পারিতোষিক পাইবার পর, তিনি বলিলেন, আর আমি তোমার ওজর শুনিব না; অদ্য তোমায় পদ্য রচনা করিতে হইবেক। এই বলিয়া, তিনি পীড়াপীড়ি করাতে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, আমায় পদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। "গোপালায় নমোঽস্তু মে," এই চতুর্থ চরণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, এক ঘণ্টা সময় দিয়া, সকলকে শ্লোকরচনায় নিযুক্ত করিলেন। আমি, পরিহাস করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, আমরা কোন্ গোপালের বর্ণনা করিব।

এক গোপাল আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন; আর এক গোপাল বহু-কাল পূর্ব্বে বৃন্দাবনে লীলা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এ উভয়ের মধ্যে, কোন্ গোপালের বর্ণনা আপনকার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া বলুন। পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়, আমার এই কৌতুককর জিজ্ঞাসা-বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, হাস্যপূর্ণ বদনে বলিলেন, বৃন্দাবনের গোপালেরই বর্ণনা কর। তিনি এক ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; ঐ এক ঘণ্টায়, আমি পাঁচটির অধিক শ্লোক লিখিতে পারিলাম না। তিনি শ্লোক পাঁচটি দৃষ্টিগোচর করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তদ্দর্শনে, আমার, যার পর নাই, আহ্লাদ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। সেই পাঁচটি শ্লোক এই:—

(১)

যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥

যশোদা মাতার যিনি আনন্দ-কারণ,
নীলোৎপল সম যাঁর শ্যামল বরণ,
গোপাল বালক যিনি শ্রীনন্দ রাজার,
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার!

(২)

ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকূলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥

গোপালন-কার্য্যে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ,
কালিন্দীর কূলে যিনি করেন ভ্রমণ,
বেণুবাদ্য করিবার স্বভাব যাঁহার,
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার!

(৩)

ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥

পীত ক্ষৌমবস্ত্র যিনি করেন ধারণ,
বনমালা পাইলেই মজে যাঁর মন,
গোপীদের প্রেম-রসে পিপাসা যাঁহার,
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার!

(৪)

বৃষ্ণিবংশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

যাদব-কুলের যিনি সুন্দর ভূষণ,
দুরন্ত কংসের যিনি ধ্বংসের কারণ,
দৈত্যগণে করিলেন যিনিহ সংহার,
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার!

(৫)

নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্ভাণ্ডকুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

ননীচোর নাম যাঁর এই ত্রিভুবনে,
একমাত্র কর্ত্তা যিনি চতুর্বর্গ-দানে,
বিশ্বভাণ্ড রচিবার যিনি কুম্ভকার,
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

অহঙ্কারের দোষ ও গুণ।

প্রায় সকলেই বলেন—"অহঙ্কার একটা মহাদোষ।" শাস্ত্রেও আছে—"নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।" অর্থাৎ অহঙ্কারের অপেক্ষা বড় শত্রু আর নাই। কিন্তু শুধু দোষময় কি জগতে কিছু আছে? সদ্যঃ প্রাণহর বিষও সুপ্রয়োগের গুণে অমৃতাধিক গুণকর হইয়া থাকে। শিরোভেদী বজ্রও বিজ্ঞান-কোবিদের হস্তে পরিচালিত হইয়া মনুষ্যের উপকার সাধন করে।

এইরূপ, মানব চিত্তের কোনও বৃত্তিই বিশ্বনিয়ন্তৃ-কর্তৃক বৃথা আরোপিত হয় নাই। যে বৃত্তি নিতান্ত অহিতকরী বলিয়া আমাদের আপাত-প্রতীতি হয়, তাহার মূলেও জগদ্ বিধাতার একটী নিগূঢ় শুভ উদ্দেশ্য আছে। খাটাইতে পারিলে তাহা হইতেও কাজ পাওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক—'অহঙ্কার' শব্দের অর্থ কি? অহং অর্থ আমি। কারের অর্থ ক্রিয়া, ভাব বা অনুভব। অহঙ্কার বলিলে আমিত্বের বুদ্ধিকে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সোজাকথায়, "আমি নিজ কৌশলে করিয়াছি, আমি ঐশ্বর্য্য প্রভাবে কিনিয়াছি, আমি শক্তিদ্বারা পরাজিত করিলাম, আমি পরিশ্রম বা বুদ্ধির গুণে এম এ পাশ করিয়াছি" ইত্যাদি আত্মগত উৎফুল্ল অনুভূতিকেই অহঙ্কার বলা যায়। এই আত্মগত গৌরব-বুদ্ধিই মানবের উন্নতির মূল। আমি পরিশ্রম গুণে আরব্ধ কার্য্যে উত্তীর্ণ হইলাম এ ধারণা আমার না থাকিলে আমি কার্য্যান্তরে হস্তক্ষেপ করিব কেন? যদি সকল প্রকার সিদ্ধি-লাভ কাকতালীয় বা অন্ধ দৈবাধীন—এরূপ বিশ্বাসে নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে সাধনীয় কার্য্যে উদ্যম ও অধ্যবসায় আসিবে কোথা হইতে? তা হলে ত সম্মুখস্থিত প্রত্যেক কার্য্যে হস্তপ্রসারণ না করিয়া হাত দুটী গুটাইয়া সাশ্রু-লোচনে উর্দ্ধমুখ ও উর্দ্ধবাহু হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

আমার যে বিষয়টী লইয়া অহঙ্কার, আমি তাহা ভাল বাসি, আমি যাহা ভালবাসি, আমার তাহা থাকিলে সংরক্ষণের চেষ্টা স্বাভাবিকী। যদি তাহা না থাকে, তাহা উপার্জ্জনের প্রয়াসও স্বতঃপ্রসৃত। যদি আমার কৌলীন্যের অহঙ্কার থাকে, আমি নীচের সহিত কখনই মিশ্রিত হইব না। আমি যদি বিদ্যাকে অহঙ্কার-যোগ্য বস্তু মনে করি, বিদ্যালাভ ব্যতীত আমার আত্ম-প্রসাদ দুর্ঘট। যদি ধনকেই গৌরবার্হ মনে করি, দারিদ্র্য নিশ্চয়ই আমার শিরঃপীড়ার ন্যায় দুঃসহ।

মনে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইলে আমরা যে আস্ফালন-গর্ব্ব, কর্ণ কঠোর ভাষা অবলম্বন করিয়া থাকি, সেটা অহং-বুদ্ধির দোষ নহে, দোষ আমাদের মানসিক দৌর্ব্বল্যের, আমাদের অসংযমিতার। যেমন ক্রোধের বাহ্যবিকাশ ব্যক্তিভেদে নানারূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অহঙ্কারের প্রকট মূর্ত্তিও

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে বিভিন্ন রূপ হয়। এক ব্যক্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঈষদ্ হাস্য পূর্ব্বক কেবল প্রতিকার চেষ্টাই অন্তরে আন্দোলন করিতে থাকেন, অপর ব্যক্তি সেই ক্রোধকে দুঃশ্রব্য কর্কশ ভাষায় প্রকাশ করে। এতদুভয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি হয় ত আবার হস্তপদাদির আক্ষেপ বা প্রহারাদির দ্বারা সেই ক্রোধোষ্মাকে বহির্গত করে। তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে ক্রোধের সৃষ্টি করিয়া জগৎপিতা ভুল করিয়াছেন? কখনই নহে, ক্রোধের উদ্দেশ্য আত্ম-রক্ষা, দুষ্টের দমন ও বিপত্তির প্রতিবিধান। শিশুর হস্তে পড়িলে অগ্নির মহিমা হস্ত-বস্ত্রাদি-দাহ পর্য্যন্ত, কিন্তু বিজ্ঞের হস্তে সেই অগ্নিরই অনির্ব্বচনীয় উপকারিতা পদে পদে লক্ষিত হয়। অগ্নির কোনও দোষ নাই, অগ্নি জগতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে। এইরূপ, অহঙ্কার সজ্জনের চিত্তে সৎ-কার্য্যের প্রবর্ত্তক, অসংযমীর কাছে তাহা অনর্থের মূল। ক্রোধের নিকৃষ্ট-তম পরিচয় যেমন প্রহারাদি প্রচণ্ড ব্যাপার, অহঙ্কারের জঘন্যতম বিকাশ তেমনি পরনিন্দা। যদি শুধু বলি আমি সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি বলি আমি বিদ্যাসাগরকে দশবৎসর শিখাইতে পারি-তাম, তিনি আমার তুলনায় কিছুই জানিতেন না,—একথা শ্রোতৃ-মাত্রেরই দুঃসহ। নিকৃষ্ট-চিত্ত অসংযতব্যক্তিরা স্বকীয় গুণলেশকে পর্ব্বতোপম করিয়া পরগত গুণকে নিন্দা রাহুর করালকবলে নিক্ষিপ্ত করে বলিয়াই অহঙ্কার-বৃত্তি প্রচলিত দুর্নামটী প্রাপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে, অহঙ্কারের প্রথম মূর্ত্তি মানসিক গৌরব বুদ্ধি; দ্বিতীয় মূর্ত্তি তাহার ভাষায় প্রকটন, তৃতীয় ও নিকৃষ্টতম মূর্ত্তি পরগুণে দোষারোপ। দ্বিতীয় মূর্ত্তি কিয়দংশে ক্ষমনীয়, ইহা অস্থানস্থ হইলেই দূষ্য হয় নতুবা নহে। কুবের যদি বলেন ত্রৈলোক্যের মধ্যে আমার মত ধনাঢ্য কেহই নাই, তবে কি তাহাতে তত অপরাধ হয়? অন্যদেবের ঈদৃশোক্তি দোষ বটে।

অহঙ্কারের ঐ নিকৃষ্টতম মূর্ত্তি যথার্থ অহঙ্কারের সহিত কোনও রূপে সম্পৃক্ত নয়। সোণার যেমন খাদ; ধান্যের যেমন মৃৎকণা, বস্ত্রের যেমন ময়লা, অহঙ্কারের পার্শ্বে তেমনি পরকুৎসা। খাদ দেখিয়া সোণার নিন্দা অনুচিত।

যাহার পরনিন্দা করা চির স্বভাব, তাহারই মনে অহঙ্কারের ভাব উদিত হইলে ঐ স্বভাবটী জাগরিত হইয়া পড়ে। যাহার পুরাতন শ্বাসরোগ আছে, শৈত্যসেবায় তাহারই শ্বাস বহির্গত হইয়া পড়ে, অন্যের নহে।

অহঙ্কারের দ্বিতীয় মূর্ত্তি অর্থাৎ নিজমুখে স্বগুণ-কীর্ত্তন তত দোষনীয় নয় বলিয়াছি; কিন্তু তথাপি তাহা শ্রুত-মাত্র শ্রোতার কর্ণপীড়া উৎপাদন করে কেন? তাহার কারণ এই, তুল্য গুণান্বিত সকলেই নিজেকে বড় মনে করেন। সুতরাং তন্মধ্যে একব্যক্তি অপরের কাছে বড়াই করিলে, তাহার কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোট হইয়া পড়ে, সুতরাং উহার কথা তাঁহার অসহ্য হয়। অথবা যেগুণ সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি অহঙ্কার করে, সে গুণ শ্রোতার না থাকিলে, তদ্‌গুণযুক্ত তাহার বন্ধুবর্গের কিঞ্চিৎ গৌরব হ্রাস হয়, তাহাও সে ভাল বাসেনা। দ্বিতীয়তঃ প্রশংসা টা বড় দুর্লভ বস্তু, তাহা কেহ দিলে, তবে পাওয়া যায়; এমন দুর্লভ ধনটী কেহ নিজে নিজে আত্মসাৎ করিতে থাকিলে একটা অত্যাচার বলিয়া শ্রোতৃমাত্রেরই মনে প্রতীতি হয়। পুরোহিতের স্বহস্ত-কৃত বণ্টন অপেক্ষা না করিয়া নৈবেদ্য নিজেই কাড়িয়া লইলে কাহার দেখিতে ভাল লাগে? সুতরাং ঐ প্রকার অত্যাচার কেহই ভালবাসে না। অজ্ঞাত ব্যক্তির উদ্যানেও যদি কেহ বলাৎকার পূর্ব্বক পুষ্পগুলি অযথা ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকে তবে কি সম্পর্ক-বিহীন দর্শকেরও অপ্রীতিকর হয় না?

আর এক জাতীয় গর্ব্বপরায়ণ লোক আছে, তাহারা নিজের কোনও গুণ না থাকিলেও তদ্‌গুণ সম্বন্ধে তারস্বরে আত্মকীর্ত্তন করিতে থাকে। এই স্বভাবকে অহঙ্কার বলা উচিত নহে, ইহা বিশুদ্ধ মিথ্যা ভাষণ ও অতি-রঞ্জন; এই প্রক্রিয়া পরের উপরে পরিচালিত না করিয়া দুর্ব্বুদ্ধি লোকে সময় সময় আপনার উপরে খাটাইয়া দেখে।

এক্ষণে অহঙ্কারের দোষের কথা বলিব। ক্ষণভঙ্গুরদেহ-মনোধারী মনুষ্য যতই চেষ্টা করুক, কিছুতেই সর্ব্ব সময়ে সমভাবে সতর্ক ও অবহিত থাকিতে এবং নিজ গুণাবলিকে স্বেচ্ছায়ত্ত রাখিতে পারে না। গায়কাগ্রণী প্রতিদিন সমান গায়না, বক্তা সর্ব্বদা শ্রোতার সমান প্রীতি জন্মায় না। এরূপ স্থলে বিনয়ীকে বড় চতুর বলিতে হইবে। "কিছু জানি না" বলিয়া আরম্ভান্তে যদি কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তবে ফল শ্রোতার আশার অতিরিক্ত হওয়ায় স্নেহেই

সন্তোষ সাধন হইয়া থাকে। আর "খুব জ্বানি" বলিয়া আরম্ভ করিবার পর যদি দুর্দ্দৈবাধীন আশানুরূপ ফল না মিলে, তবে শ্রোতা বা দর্শকের ক্ষোভের, এমন কি উপহাস-প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। সুতরাং অহঙ্কার বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

দ্বিতীয় অহঙ্কার অনেকস্থানে আত্মবিস্মৃতিকে আনয়ন করে। নিজের গুণ সম্বন্ধে অতিমাত্র বিশ্বস্ত থাকিলে, তাহার ক্রমিক অপচয় ও দোষের সমাগম সংঘটিত হইতে পারে। শশক নিজের দ্রুতগতিতে অহঙ্কৃত হওয়ায় ভ্রমক্রমে ঘুমিয়া পড়িল; নতুবা সে মন্দগতি কচ্ছপের দ্বারা পরাজিত হইবে কেন? অতএব অহঙ্কার অধিকাংশ সময়েই অহিতকর। বিধি-মত সেবিত মদ্য "অশেষ গুণাবহ" বটে, কিন্তু "অভীস্ত হইলে বিধিটী রাখা দায়, তজ্জন্যই "মদ্য অপৃশ্য"। অহঙ্কারের কথাও সেইরূপ।

শেষ কথা—অহঙ্কারবৃত্তি মূলে অতীব কল্যাণদায়িনী। পাত্র-দোষে দোষ বলিয়া গণিত হয়। এই বৃত্তির সম্বন্ধে নিশ্চিতই বলা উচিত সেই রামপ্রসাদের কথা—"আবাদ ক'ল্লে ফল্‌তো সোণা।"

সফল অনুতাপ।

মানুষ ভগবানের সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। জীবনামে অভিহিত চেতন পদার্থ-গুলির মধ্যে, মানবের সমকক্ষ আর কেহই নাই। তিমি মৎস্যের বিশাল দেহ এবং কৃমি কীটের ক্ষুদ্র শরীর, উভয়েরই উপর মানবের সমান আধিপত্য। অভ্রংলিহ হিমাদ্রি এবং সৈকতলীনা ক্ষুদ্র বালুকা, এই উভয়েরই উপর মানব সমান দর্পে পাদবিক্ষেপ করে। কোথায় কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে অবস্থান করিয়া, দৃষ্টি প্রভাবে ভূমিষ্ঠ শিশুর ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম সময়, জীবন-প্রবাহের গতি রুদ্ধ করিয়া দিবে এই উৎকট জ্বলন্ত ভবিষ্যদ্বাণী মানুষ ব্যতীত আর কেহই শোনাইতে পারে নাই। ভগবানের বিপুলরাজ্যে মানব বৃত্তি-ভোগিনী প্রজা হইলেও তাহার বিকাশ কোনরূপ সীমাবদ্ধ নহে।

কিন্তু ঐই বিকাশ সকল মানবের সমান দেখা যায় না। কেন দেখিতে

পাই না, ইহার উত্তরে মত ভেদ আছে। কেহ বলেন মাটীর দোষে, কেহ বলেন বীজের দোষে, এই রূপ ব্যতিক্রম ঘটে। যাঁহারা প্রথমমতের পক্ষাবলম্বী, তাঁহাদের মতে দারিদ্র্য, সমাজ, লোকসঙ্গ প্রভৃতি দোষে মানুষের অভিলষিত উন্নতি হয় না। অপর পক্ষের লোকেরা বলেন, বীজপরিপুষ্ট হইলে দারিদ্র্যাদি অন্তরায় বিঘ্নরূপেই পরিগণিত হয় না। আমরা বলি উভয় পক্ষের মতই অবস্থা বিশেষে উপযোগী এবং যুক্তিসহ। দারিদ্র্য ও সমাজের নিপীড়নে নিষ্পেষিত হইলেও "কৃষ্ণদাস পাল" যে কারণে প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী হইয়াছেন, এবং এই মহানগরীর শত শত লক্ষ্মীর বরপুত্রের পঞ্চভূতাত্মক পীবর দেহ যে কারণে ধরিত্রীর ঋণ পরিশোধ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইতেছে তাহার প্রধান কারণ, অনুতাপের সফলতা ও নিষ্ফলতা।

দরিদ্র কৃষ্ণদাস কেরাণীর কার্য্য করিতে করিতে অপদস্থ হন। অপমানের প্রধান কারণ, তাহার অল্প-বিদ্যতা। তিনি অনুতপ্ত হইলেন। সে অনুতাপ, কালবিহঙ্গের পক্ষ তাড়নে নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং বাড়িতেই লাগিল। হৃদয় তাপিত হইল বটে, কিন্তু ভস্ম হইয়া অকর্ম্মণ্য হইল না! তিনি দারিদ্র্যের অন্ধকারে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর নূপুর শিঞ্জন শুনিয়া দৌড়িতে লাগিলেন। ক্রমে এমন স্থানে আসিলেন, যেখানে আসিলে মানুষ অমর হয়। যে পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি মহানগরীর হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া সেই সুদূরগত অনুতাপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাঁহা কালে, কালের বজ্রকঠোর দণ্ডে নিষ্পেষিত হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণদাস সৌভাগ্যের প্রসাদে চিরকাল অমর শ্রেণীতে নিবিষ্ট থাকিবেন।

এরূপ অনুতাপ কয়জনের হয়? তোমার আমার অপমান বোধ বৈরনির্যাতনেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আমরা মনের মধ্যে রিপু পুষিয়া শত্রু ধরিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থানা তল্লাস করি। কিন্তু বুঝিনা যে একটীবারমাত্র অনুতাপের দিয়াশলাই ঘসিয়া মনকে দগ্ধ করিতে পারিলেই রিপু সকল পুড়িয়া ছাই হইবে। অনেকের অনুতাপ অপমানের সঙ্ঘর্ষণে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই আলস্যের শীতল নিশ্বাসে নিবিয়া যায়।

আত্ম সম্মান অপমান-বোধের মানদণ্ড। যাহার আত্ম-সম্মান বোধ যে পরিমাণে অধিক, তাহার অপমান বোধ সেই পরিমাণে তীব্র। এ সংসার

ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা প্রভৃতির সঙ্ঘর্ষ পদে পদে সঙ্ঘটিত হয়। যাহার মহত্ব আছে, যাহার হৃদয়ের উত্তাপ আছে, সে তাহা সহিতে পারে না। কিন্তু অসহিষ্ণু হইয়া আদর্শের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে তাহাকে হিংসা বলিব। এই হিংসা মানুষকে নরকের পথে লইয়া যায়। কিন্তু অনুতাপ স্বর্গ-পথের অগ্রণী। অনুতাপ ও উদ্যোগ যুগপৎ কার্য্য করিলে বিধাতার সিংহাসনও কাঁপিয়া উঠে এবং সর্ব্বংসহারও ধৈর্য্য অপনীত হয়।

এমন অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ থাকিতে পারেন, যাঁহারা জীবনের প্রশস্ত পন্থায় পাদবিক্ষেপ করিবামাত্র সিদ্ধি সুমুখীন হইয়া সৌভাগ্যের পুষ্পমাল্যে অভিনন্দন করে। আমরা এ প্রবন্ধে তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি না। অথবা যে সকল ধনকুবের মাতৃকুক্ষি পরিত্যাগ করিয়াই আলস্যের অরিষ্ট-শয্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহারাও এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহেন। তবে যাঁহারা হস্ত, পদ ও হৃদয় মাত্র সম্বল লইয়া উলঙ্গবেশে বিপুল পৃথ্বীর সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহারা সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অনবদ্য রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, আকাঙ্ক্ষার স্বয়ম্বর সভায় সমাহূত হইয়াছেন, তাঁহারাই অনুতাপের পাত্র। সুতরাং তাঁহারাই এ প্রবন্ধের সমালোচনীয়।

এতদূর যে অনুতাপের কথা লিখিত হইল, তাহা ব্যক্তিগত হইলেও পরমুখাপেক্ষী। যখন সঙ্ঘর্ষে হৃদয়ের তাড়িত স্ফুরিত হয় তখনই অনুতাপ হইয়া থাকে। এই অনুতাপ আমার ক্ষুদ্রতা ও অপরের মহত্বে প্রতীত হয়। কিন্তু আর এক প্রকার অনুতাপ আছে, তাহা ধর্ম্মগত। "আমি এতদিন সংসারে মগ্ন হইয়া তোমাকে ভুলিয়া ছিলাম, হে প্রভো! ক্ষমাকর শোক দুঃখে হৃদয় ভস্মীভূত হইল।" ভগবানের প্রতি যে এবম্প্রকার কাতরতা প্রকাশ, তাহাও এক প্রকার অনুতাপ। ইহারও মূলে পক্ষাপক্ষের ভাব নিহিত আছে। একপক্ষে সংসার, অপর পক্ষে আমি, সংসার আমাকে প্রলোচন-বাক্যে বিপথে লইয়া গিয়াছে, অতএব সে আমার বিপক্ষ। হৃদয়ের বিচ্ছেদ জাগরিত হইয়া আমাকে বলিয়া দিল "রে মূঢ়! তুই কোথা যাই-তেছিস্? ঐ যে আপাত-মধুর সংসার, লোভের আমিষ নিক্ষেপ করিয়া মোহের গহণ তামসে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাতে তোর শ্রেয়ঃ হইবে না। এই আলোক জ্বালিলাম, দেখ সমুখে কি ভীষণ, দুর্গন্ধ, পূতিময় নরক

কুণ্ড! সংসার ছুটিয়া পলাইল।” আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। হৃদয় হইতে মোহ সরিয়া যাইতে লাগিল। বিবেকে হৃদয়ের মলিনতা কাটিয়া গেল। অরুন্তুদ কাতর কণ্ঠ ভগবানের কর্ণে পৌছিল। আমি শান্তি পাইলাম। ইহাই সফল অনুতাপ এবং ইহাই সিদ্ধি লাভের মূলমন্ত্র।

কিন্তু হায়! এইরূপ অনুতাপ কয়জন করিতে শিখিয়াছে? তামসীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, বিবেকের কিন্নরকণ্ঠ সেই শান্তিধামের ঐশ্বর্য্য কিরূপ বর্ণন করে তাহা শুনিবার জন্য কোন বিষয়ী বনিতার বাহুবল্লীর উদ্বন্ধন দূরে নিক্ষেপ করিয়া অতন্দ্রিত-নেত্রে যোগনিশা অতিবাহিত করিতে পারিয়াছে। কামনা বিষয়ীর উপাস্যদেবতা। বিষয়ীর অনুতাপ মুখের কথা মাত্র। তাহাদের মুখের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ নাই, অথবা হৃদয়ের রক্ত কেবল জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতেই প্রবাহিত হয়।

যেরূপ অনুতাপই হউক না কেন, তাহা যে সুফল-প্রসূ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ঠেকিয়া শেখে, সেই অনুতাপের দাহ বুঝিতে পারে। যে অনুতাপের অণুকরণ প্রিয়, সে আজন্ম নেত্র মুদ্রিত করিয়া থাকিলেও অন্ধকার বিষয়রাশির পৈশাচিক ছবি ব্যতীত সেই অতীন্দ্রিয় বাক্য-মনের অগোচর সত্যরাজ্যের কিরণ রেখা বিন্দুমাত্রও দেখিতে পাইবে না। অতএব এস আমরা, অনুতাপ করিতে শিখি। অনুতাপের পবিত্র-বহ্নি শিখায় হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া সংসার মালিন্য বিবর্জ্জিত হউক।

শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্থ।

বিধবারা হিন্দু সমাজের ভূষণ।

“বিধবারা হিন্দু-সমাজের ভূষণ!” এপ্রবন্ধের মীমাংসা করিতে হইলে, অগ্রে বৈধব্য সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা প্রয়োজন। এস্থলে অগ্রে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

বৈধব্য এক অতি মহৎ ব্রত। স্বার্থত্যাগ এব্রতের মূলমন্ত্র। যে মুহূর্ত্তে যে বিধবানারী এব্রতে ব্রতী হইবেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে স্বার্থকে বলি দিতে হইবে, বলিদান ইহার উদ্‌যাপন নহে, বলিদানই ইহার উদ্বোধন। এ বড়ই

কঠোর-ব্রত; ইহার আচার-নিয়ম প্রতিপালন করা বড়ই কঠোর-কার্য্য। সকল দেশে সকল বিধবানারী এব্রতে দীক্ষিতা হইতে পারেন না। কেবল হিন্দুর দেশে হিন্দুবিধবা-রমনীতেই আমরা এব্রত ধারিণী, অবরোধ-বাসিনী, ব্রহ্মচারিণী-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এব্রতের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই পদে পদে কঠোরতার ছায়া,—কঠোরতার বিভীষিকাময়ী-ছবি দেখিতে পাই। হিন্দু-বিধবা ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতাবলে সেই সকল মূর্ত্তি-গুলিকে পদদলিত করিয়া, আপনার ব্রত উদযাপনে অগ্রসর হন। অশনে-বসনে-শয়নে উপবেশনে কেবলই কঠোরতা। শীতে গ্রীষ্মে, বসন্তে বর্ষায়, দিবায় নিশায়, সকলকালে এবং সকল সময়েই শুধু কঠোরতা। আমরণ তাঁহাকে এই কঠোরতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই অভীষ্ট-সাধনে বিনিযুক্ত থাকিতে হয়। ফলতঃ একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সিঁতির সিন্দুর মুছিয়া যাইবে, হাতের লোহা হস্তচ্যুত হইবে, এবং তাঁহাকে সমস্ত ঐহিক সুখ-ভোগ-বিলাস-বাসনায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে,—জন্মের মত বিদায় দিতে হইবে, তিনি যে হঠাৎ পতি-বিয়োগের পরমুহূর্ত্ত হইতেই এব্রত ধারিণী, ব্রহ্মচারিণী সাজিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিতেছেন, এ কি সামান্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয়? অকস্মাৎ এবিষম-পরিবর্ত্তন বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে কতই অসহনীয় ব্যাপার!!! আবার তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যে সকল কুৎসিত-বৃত্তি-নিচয় রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সুদূরে বিতাড়িত করা কি সহজ কথা? শুধু তাহাই নহে,—তিনি ধৈর্য্যের শাণিত-কৃপাণে তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া আপনার অবরোধ-বিপিনে নিষ্কণ্টকে ব্রহ্মচারিণী বেশে ব্রতোদ্‌যাপনে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহা কি অল্প ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয়? অথবা কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

> "They change their savage mind,
> Their wildness lose, and quitting nature's part,
> Obey the rules and discipline of art."

কিন্তু হিন্দু বিধবার পক্ষে এ ত্যাগ স্বীকার বা আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন তত আয়াস-সাধ্য নহে। কারণ এ সাধনা-সিদ্ধি তাঁহাদের অভ্যস্তবিদ্যা। শৈশব-

কাল হইতেই তাঁহারা ব্রতনিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। এবং তদ্ধেতু তাঁহাদিগকে উপবাস বা কদর্য্য আহারের কঠোরতা,—কর্কশ-শয়নে শয়ন জনিত ক্লেশ-পরম্পরা সহ্য করিয়াই আসিতে হইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের এব্রতোদ্যাপন কষ্টসাধ্য বা আতঙ্ক উদ্দীপক হইতে পারে না। পরন্তু হিন্দুর সতীত্বধর্ম্মের পরিষ্কার আদর্শবলে, হিন্দুর সমাজ সংগঠনের আধ্যাত্মিক প্রণালী প্রযুক্ত, হিন্দুর ব্রত-বেদী গৃহের নিয়মানুসারে হিন্দু-বিধবা আমরণ ব্রহ্মচারিণী। পতি-ভক্তি, পতি-প্রীতি, পরকালের স্থিরতর বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবস্থার আন্তরিক শ্রদ্ধা, পারিবারিক নিষ্কামধর্ম্ম, এই সকল পবিত্রভাব সংমিশ্রিত হইয়া হিন্দু-বিধবাকে আমরণ ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণতঃ হিন্দুসমাজ মধ্যে যিনি হিন্দুবিধবার উপর বল-ব্যবস্থিত ব্রহ্মচর্য্যের (enforced widow-hood) অত্যাচারের কথা বলেন, তাঁহার সহৃদয়তার প্রশংসা করিলে চলে, কিন্তু তিনি হিন্দু-রমণীর চিত্ত-ক্ষেত্রের নির্ম্মল পবিত্র নিষ্ঠাশক্তি যে সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

আধ্যাত্মিক আর্য্যধর্ম্মের মহিমাবলে সর্ব্বজন পূজ্য মন্বাদি মহর্ষিগণের ধর্ম্মসঙ্গত সুব্যবস্থার গুণে, বাল্মিকী প্রভৃতি কবিগুরুগণের প্রতিভাময়ী সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আকর্ষণে, মহা মহা ঋষি প্রণীত পৌরাণিক উপাখ্যান সকলের অপূর্ব্ব উপদেশে, বহুকালের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষার সমাজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার পক্ষে সহজ ধর্ম্ম, স্বভাব ধর্ম্ম, প্রকৃতি ধর্ম্ম হইয়াছে। কাজেই কোন কষ্ট হয় না। বাল্যাভ্যস্ত বিদ্যাবলে তিনি এপথ অতি সরল অতি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। বোধ হয় বাল্যকাল হইতে এরূপ অভ্যাস করিয়া না আসিলে তিনি কদাচ এরূপ ব্রহ্মচর্য্যে আত্মমন সমর্পণ করিতে পারিতেন না।

মহাত্মা এডিসন (Addision) একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন—

"It is of the last importance to season the passions of a child with divotion, which seldom dies in a mind that has received an early tinture of it." অন্যত্র Devotion opens the mind to great conceptions and fills it with more sublime ideas." তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। উল্লিখিত বাল্যব্রতোদ্যাপনের কর্ম্মিরতাই তাঁহা-

দিগকে উর্দ্ধে এবং উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর ও উর্দ্ধতম প্রদেশে লইয়া যায়। ইহাতে চিত্তের প্রশস্ততা জন্মে, জ্ঞানের উন্মেষণীশক্তি বৃদ্ধি করে, আত্ম-পর-বিভেদ-বোধ রেখাগুলি হৃদয় ক্ষেত্র হইতে মুছিয়া ফেলে, দেহ মন পবিত্রিত হয়, এবং অবশেষে তাঁহাকে পারত্রিক-সুখ-সম্ভোগের অধিকারিণী করিয়া থাকে। অতএব হিন্দু-বিধবা হিন্দু-সমাজের ভূষণ নয় ত কি? সমাজের শিরোভাগে এমহামূল্য আভরণ না থাকিলে এতদিনে হিন্দু-সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। বন্ধন শিথিল হইয়া যাইত এবং যদৃচ্ছ-গমনে আপনার দেহ প্রাণ কলুষিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

এজগতে আমাদের আশা-ভরসা, স্থিতি সংস্থাপন, বিলাস বাণিজ্য দুদিনের জন্য। দুদিনের পরই সব ফুরাইয়া যায়। ধনৈশ্বর্য্য বল, শক্তি সামর্থ্য বল, মানগৌরব বল, প্রীতি ভালবাসা বল, সৌন্দর্য্য লাবণ্য বল, সব যায়। এবং দুদিন পর কাল-স্রোতে জলবুদ্‌বুদবৎ এজীবন-বিম্ব অনন্তকালে মিলাইয়া যায়, চিহ্নমাত্র থাকে না। সুতরাং দুদিনের জন্য আমাদের এত ভোগ অভিলাষ, এত আত্মনিষ্ঠা, এত স্বার্থ-সাধনা কেন? এত বিবাদ বিসম্বাদ, এত রক্তপাতেরই বা প্রয়োজন কি? আমরা দুদিনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই ব্যস্ত, লালায়িত। অনন্তকালের জন্য ভাবি কি? অনন্তকাল যেখানে কাটাইতে হইবে, সেখানকার জন্য আমরা কি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছি? দুদিনের তরে যদি সব খোয়াইলাম, তবে অনন্তের উপায় কি? কল্পনায় আঁকি কি? ফলতঃ যিনি তাহা ভাবেন; যিনি তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তিনিই অনন্তকালের জন্য পারত্রিক সুখ সম্ভোগের অধিকারিণী হইয়া থাকেন। সে মূলধন, সে সঞ্চিত-নিধি,—আর কিছুই নহে, ত্যাগস্বীকার আর আত্মবলিদান। এজগতে সর্ব্ববিধ স্বার্থবলিদান দিলে, সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিলে পরে, পর-জগতে আবার সুখ মিলিবে। দুদিনের জন্য নহে, অনন্তকালের জন্য মিলিবে। ইতালীয় কবি (Cruch) ও বলিয়াছেন,—

"They that do much themselves deny,
Receive more blessings from the Sky"

হিন্দুর দেশে হিন্দুবিধবা রমণীই এ ত্যাগ স্বীকারের জলন্ত নিদর্শন। তিনি অম্লানবদনে তাঁহার ঐহিক-সুখ-বিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া পরজগতের জন্য

প্রচুর মূলধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন। বাস্তবিক হিন্দু-বিধবাই এজগতে প্রকৃত আত্মত্যাগপরায়ণা, দেবী-রূপিণী—মানবী! হিন্দুসমাজের একমাত্র মহামূল্য ভূষণ-স্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই।

শ্রীতারিণীচরণ সেন।

চিনির-বলদ।

১

চিরদিন বহি ছালা চিনির বলদ
শ্রমে তার কণ্ঠাগত প্রাণ;
কিন্তু সে জানেনা বস্তু কি আছে ছালায়
রূপ, গুণ, আস্বাদ বিজ্ঞান।

২

অবোধ মানব তথা আমরণ কাল
ব্যস্ত দেহ-সুখের কারণ
দেহে-আত্ম-অভিমান-দেহ নিত্য-ধন
নাহি জ্ঞান-আত্মা যে একমন।

৩

চ'লে ব'সে খেয়ে শুয়ে সুখে যায় দিন
কর্ত্তা কেবা—নাহি জ্ঞান তা'র!
"আমি" যারে বল তুমি দিনে শতবার
মরিলে সে হবে ভস্মাকার।

৪

'আমি' যা'রে বল তুমি, তত্ত্ব কিবা তার?
'যিনি' সব কার্য্যের কারণ,
আজি, মোহ আবরণ মুক্ত কর যার
তবে হ'বে-আত্ম-দরশন!

৫

হ'লে মোহ-তমো নাশ আত্মার বিকাশ
প্রেম-সুধা হইবে ক্ষরণ;
সেই সুধা-পানে মত্ত হইবে যখন
পূর্ণানন্দ পাইবে তখন।

৬

যতনে মথিলে দুগ্ধ নবনীত হয়
জলে তাহা মিশে না কথন;
তেমতি মনেরে মথি, হইলে মাথন
লিপ্ত থাকি নির্লিপ্ত সেজন।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মল্লিক। (জমিদার)

হিন্দু-ললনা।

তুমি কে?—প্রভাতে নমি' পতির চরণ-তলে
কে তুমিগো, উজলিছ পূত নিরমাল্য-জলে?
তুমি কে?—প্রভাতী কর্ম্মে নিযুক্ত আপনি ধীরে,
কে তুমি যশের যাত্রী সংসার কর্ম্মের তীরে?
তুমি কে?—শ্বশ্রূরে সেবি কি দিবস কি রজনী
কে তুমি আনন্দে ভোর হিন্দুর উজ্জ্বল মণি?
কে তুমি রন্ধন শালে নিপুণা অন্নদে মাতঃ!—
শত বুভুক্ষুর ক্ষুধা নিবারিছ অবিরত?
কে তুমি আহার দাত্রী আপনার অন্ন দিয়ে
অতিথিরে কর সেবা প্রাণের আনন্দ নিয়ে?
কে তুমি মা'! গৃহলক্ষ্মী রুগ্ন-শয্যা পার্শ্বে বসি
অনশনে অনিদ্রায় অকাতরে যাপ নিশি?
তুমি কে?—স্বামীর পদ যতনে সাদরে সেবি
কে তুমি কর্ম্মের ক্লান্তি পলকে নিবার দেবি?

তুমি কে?—ভকতি দিয়ে তোষ গুরুজন গণ?
কে তুমি গো, যতনে সেবিতেছ পরিজন?
তুমি কে?—পতির পরে, শয়নে শয়ন-কালে
বন্দ পা' দু'খানি তাঁর আনন্দ-ভকতি-মালে?
কে তুমি ধরম মরি! সন্তানগণেরে তব
ধরম সুধার-ধারা পিয়াইছ অভিনব?

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

চরকীয় নীতি।

না পৃষ্ট্বা রত্নাজ্য পূজ্য মঙ্গল সুমনসোভিনিষ্ক্রামেৎ—রত্ন, ঘৃত, বিল্বপত্রাদি পূজ্য সামগ্রী, মঙ্গলদ্রব্য, অন্ততঃ একটী সুন্দর পুষ্প স্পর্শ না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে না। ইহার উদ্দেশ্য, মনকে প্রসন্ন করিয়া কোনও কার্য্যার্থ বহির্গত হইবে। মনের অবস্থার উপরে ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

নিত্য মনুপহতবাসাঃ সুগন্ধিঃ সুমনাঃ স্যাৎ—প্রতিদিন সভ্য বস্ত্র পরিধান ও সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার পূর্ব্বক প্রফুল্ল চিত্ত থাকিবে। এই উক্তি দ্বারা বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। উদ্দেশ্য, এতদ্দ্বারা যে মনের প্রসন্ন-ভাব প্রস্ফুরিত হয়, তাহা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বড়ই অনুকূল।

ছত্রী-দণ্ডী-মৌলী সোপানৎকো যুগমাত্রদৃগ্ বিচরেৎ—মস্তকে ছত্র ও হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া এবং পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক সম্মুখে চারি হস্ত পরিমাণ ভূমি দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিবে। যে হেতু এরূপ বিধি দ্বারা মস্তকে রৌদ্র জল বা বিহঙ্গাদির মল পতন, আকস্মিক হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ, চরণে কণ্টকাদি বেধ ও অদৃষ্ট কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির প্রতিঘাতে পদস্খলন ঘটিবার সম্ভাবনা পরিহৃত হইতে পারে।

প্রসাধিত-কেশো মূর্দ্ধ শ্রোত্রঘ্রাণ পাদ তৈল নিত্যশ্চ—চুল আঁচড়াইয়া সু-সন্নিবিষ্ট করিবে এবং নিত্য মস্তক কর্ণ নাসিকা ও পদে তৈল রক্ষণ করিবে।

দ্রব্যগুণ বিচার।

কাঁকুড়।

বাঙ্গালা নাম—কাকুড় বা ফুটী ; হিন্দী—ভুকুর ; সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—চির্ভিটং ধেনু দুগ্ধঞ্চ তথা গোরক্ষ কর্কটী। সংস্কৃত নাম—চির্ভিট, ধেনুদুগ্ধ, গোরক্ষ কর্কটী।

কাঁকুড় ফল অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, ইহার গাছ লতানো, ভূমির উপর বিস্তৃত হইয়া যায়, পাতা গুলি প্রায় হাতের পাঞ্জার মত চওড়া ও চক্রবক্র চিহ্নযুক্ত।

চির্ভিটং মধুরং রুক্ষং গুরু পিত্ত কফাপহং।
অনুষ্ণং গ্রাহি বিষ্টম্ভি পক্বং তূষ্ণঞ্চ পিত্তলম্॥

অর্থাৎ কাঁচা কাঁকুড়, মধুর, রুক্ষ, গুরু, কফপিত্তাপহ; অনুষ্ণ, ধারক, ও বিষ্টম্ভকারক, কিন্তু পাকিলে ইহা উষ্ণবীর্য্য ও কফপিত্তাত্মক হয়।

কাঁকড়া শৃঙ্গী।

বাঙ্গালা নাম—ঐ ; হিন্দী—ককর সিং ; ইংরাজী নাম—Rhus succedanea. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ স্যাৎ কুলীরবিষাণিকা। অজশৃঙ্গী তু চক্রা চ কর্কটাখ্যা চ কীর্ত্তিতা॥ সংস্কৃত নাম—শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীর বিষাণিকা, অজশৃঙ্গী, চক্রা, কর্কটাখ্যা (কাঁকড়া-পর্য্যায়ের সমস্ত শব্দ) হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার শাখার অগ্রভাগে কীট-দষ্ট হইলে ঐ দষ্ট স্থান হইতে শৃঙ্গবৎ লম্বা, মধ্যে ফাঁপা, অল্প কৃষ্ণবর্ণ, উভয় পার্শ্বে সরু, অঙ্গুলির মত স্থূল, বন্ধুরাকৃতি একপ্রকার উদ্গম আবির্ভূত হয়, তাহাই কাঁকড়াশৃঙ্গী

শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্।
শ্বাসোর্দ্ধবাত তৃট্‌কাস হিক্কা রুচি বমীন্ হরেৎ।

রস—কষায়-তিক্ত ; বিপাক—কটু ; বীর্য্য—উষ্ণ ; গুণ—কফ-বাতনাশক, ক্ষয়জ্বরঘ্ন, তৃষ্ণা, কাস ও অরুচি নাশক। প্রভাব—শ্বাস, উর্দ্ধ বা উর্দ্ধবাত অর্থাৎ বায়ুকর্ত্তৃক উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ, হিক্কা ও বমী নিবারক।

প্রয়োগ—শ্বাস কাস, অপভুক্ত জ্বর ও বাতাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ইহার উপকারিতা। শ্বাসরোগে ইহার কফনিঃসারক শক্তি ও আক্ষেপ নিবারণ ক্ষমতা বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। ইহা ঈষৎ ধারক গুণযুক্ত সুতরাং আবশ্যক হইলে ইহার সহিত সারক উপকরণ যোগ করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। ধারকতা হেতু বাতাজীর্ণের তরলভেদে উপকারী। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কীটের সম্পর্ক থাকায় ইহা উষ্ণবীর্য্য সুতরাং সাধারণ শুঁঠ-পিপূলের মত ক্রমে ইহার যথেচ্ছা মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োগ করা উচিত নয়, ইহার চূর্ণের নির্দ্দিষ্ট মাত্রা—৫ হইতে ১২ রতি পর্য্যন্ত। ক্বাথ করিতে হইলে ১ ভরির অধিক গ্রহণীয় নহে। কণ্ঠ রোধক কফযুক্ত বাতশ্লেষ্ম জ্বর ও কাসযুক্ত জ্বরের প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গাবলেহিকার মধ্যে কাঁকড়াশৃঙ্গী একটী প্রধান উপকরণ;—তাহা এই—

কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ॥

অর্থাৎ কট্ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণ জীরা; প্রত্যেক সমভাগ, মধুসহ লেহ্য।

চক্রদত্ত ধৃত শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ—কাঁকড়া শৃঙ্গী, বামনহাটী মূল, কিস্‌মিস্, শুঁঠ, পিপুল, ও শঠীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ১৫ রতি মাত্রায় মধুসহ অবলেহ করিলে শুষ্ক কাসি নিবারিত হয়।

শার্ঙ্গধর-ধৃত শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ—কাঁকড়াশৃঙ্গী, আতিস্ ও পিপূলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২।৩ রতি মাত্রায় মধুসহ লেহন করিলে শিশুর কাস জ্বর ছর্দ্দি প্রশমিত হয়।

এই তিন দ্রব্যে মুথা সংযুক্ত হইলে প্রসিদ্ধ "শিশু চতুর্ভদ্রিকা" নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা শিশুর জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমি রোগে বিশেষ উপকারী।

ভৈষজ্যরত্ন ধৃত প্রসিদ্ধ শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ—

শৃঙ্গী কটুত্রয় ফলত্রয় কণ্টকারী ভার্গী সপুষ্কর জটালবণানি পঞ্চ।
চূর্ণং পিবেদ শিশিরেণ জলেন হিক্কাশ্বাসোর্দ্ধবাতকসনারুচি পীনসেষু॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, কুড়, জটামাংসী ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মাড়িয়া ২ মাষা পরিমাণে উষ্ণ-

জলসহ সেবন করিলে হিক্কা, উর্দ্ধশ্বাস এবং কাস নষ্ট হয়। শাস্ত্রোক্ত শ্বাসের শৃঙ্গী গুড় ঘৃতে, অজীর্ণের লবঙ্গাদি চূর্ণ প্রভৃতি, ও বাতব্যাধির মহারাজ প্রসারণী প্রভৃতি তৈলে কাঁকড়া শৃঙ্গী আছে।

কাঞ্চন।

বাঙ্গালা নাম—কাঞ্চন; হিন্দী—কচনার; ইংরাজী—Bauhinia Variegeta. সংস্কৃত পর্য্যায়:—কাঞ্চনারঃ, কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ কোবিদারশ্চ মরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ। কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চ অন্তকঃ স্বল্পকেশরী॥ সংস্কৃত নাম—(শ্বেতের) কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি, শোণপুষ্পক। (লোহিতের) কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অন্তক, স্বল্প কেশরী। মানুষের ৫।৬ গুণ উচ্চ গাছ; পাতা হাতের পাঞ্জা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট ও লম্বায় একটু কম। ফুল অল্পদল যুক্ত ও প্রায় চারি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া; ফুল লাল ও শাদা হয়। এই পার্থক্য হেতু এই গাছ দুই জাতীয়।

কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ।
কৃমি কুষ্ঠ গুদভ্রংশ গণ্ডমালা ব্রণাপহঃ॥

(শ্বেতের) রস—কষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—হিম; গুণ—কফপিত্তনাশক, কুষ্ঠহর (নানাবিধ চর্ম্মরোগে ছালের কাথ উপকারী) গুদভ্রংশ নিবারক (ইহার কাথ পানে ও তদ্দারা মলদ্বার প্রক্ষালনে হারিস বাহির হওয়ার উপদ্রব দূরীভূত হয়) এবং ব্রণঘ্ন। প্রভাব—কৃমিনাশক ও গণ্ডমালা প্রতীকারক।

কোবিদারোপি তদ্বৎ স্যাৎ তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্।
রুক্ষং স্বংগ্রাহি পিত্তাস্র প্রদর ক্ষয় কাসনুৎ॥

লোহিত কাঞ্চনের গুণাদিও শ্বেতের তুল্য, কেবল ইহা অপেক্ষাকৃত রুক্ষ। উভয়ের পুষ্পই লঘু। কিন্তু বিশেষতঃ লোহিতের পুষ্প ধারক, রক্তপিত্ত-নাশক, প্রদরও ক্ষয়কাসঘ্ন।

প্রয়োগ—ইহার বল্কল সঙ্কোচক গুণযুক্ত, তজ্জন্য উর্দ্ধগ ও অধোগ রক্তপিত্তে উপকারী। অধোগ রক্ত নিবারণ বিষয়ে ইহার গুণ অনেকাংশে

অশোকের তুল্য। শ্বেত অপেক্ষা লোহিত কাঞ্চনের এই শক্তি অধিকতর। ইহার ছালের কাথ নানাবিধ ক্ষত ধৌত করিবার পক্ষে ব্যবহার্য্য। ছালের বাহিক প্রলেপ গণ্ডমালা প্রভৃতি কণ্ঠগত ব্রণ বা ক্ষতাদির পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার কাথ আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও রক্ত পরিষ্কারক হইয়া থাকে। ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন রক্ত কাঞ্চনের ত্বকের কাথ শুঁঠ ও মধু সহ সেবন করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয়। গোবিন্দদাসও বলেন—

পিষ্ট্বা জ্যেষ্ঠাম্বুনা পীতাঃ কাঞ্চনার ত্বচঃ শুভাঃ।
বিশ্বভেষজ সংযুক্তা গলগণ্ডাপহাঃ পরাঃ॥

অর্থাৎ কাঞ্চনবৃক্ষের ছাল আতপতণ্ডুলের জলে বাঁটিয়া তাহার সহিত শুঁঠ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গলগণ্ডরোগের উপশম হয়।

কাঞ্চন গাছের মূলের ছাল ২ তোলা সিদ্ধ করিয়া পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়, এতদ্বিষয়ে ইহার শক্তি দাড়িম্ব মূলের ছালের তুল্য।

শাস্ত্রোক্ত গণ্ডব্রণের কাঞ্চন গুড়িকা, কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু ও রক্তপিত্তের উশীরাসব প্রভৃতি ঔষধে কাঞ্চন ছাল আবশ্যক হয়।

কাঁজি।

বাঙ্গালা নাম—কাঁজি; হিন্দী—কাঞ্জী; ইংরাজী Fermented acid. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কাঞ্জিকং কঞ্জিকং কাঞ্জী কুণ্ডলং কুণ্ডগোলকং। ধান্যমূলং ধান্যযোনিঃ কুল্মাষং কুল্মাভিযুতম্॥ সংস্কৃত নাম—কাঞ্জিক, কঞ্জিক, কাঞ্জী, কুণ্ডল, কুণ্ডগোলক, ধান্যমূল, ধান্যযোনি, কুল্মাষ, কুল্মাভিযুত।

কাঁজির লক্ষণ যথা—"সন্ধিতং ধান্যমণ্ডাদি কাঞ্জিকং কথ্যতে জনৈঃ।"

অর্থাৎ যথারীতি প্রস্তুত ধান্যের মণ্ড প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কুম্ভ মধ্যে স্থাপিত ও তাহার মুখরোধ পূর্ব্বক রক্ষিত হইলে তাহাকে কাঁজি বলে।

কাঁজি ধান্যব্যতিরিক্ত অন্য কয়েক বস্তু দ্বারাও প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহাদিগের নাম যথা—তুষোদক, সৌবীর, আরনাল, ধান্যাম্ল, শিণ্ডাকী ও শুক্ত। যথাক্রমে বিবৃত হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার কাঞ্জিকের সাধারণ গুণ।

কাঞ্জিকং স্যাদ্ধি তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং পাচনং লঘু।
দাহজ্বরহরং স্পর্শাৎ পানাদ্ বাতকফাপহম্।
শূলাজীর্ণ বিবন্ধঘ্নং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্॥

অর্থাৎ কাঞ্জিক তীক্ষ্ণোষ্ণ, রোচক, পাচক, লঘু, প্রলেপে দাহ জ্বরহর, পানে বাতশ্লেষ্মনাশক; শূলাজীর্ণ ও উদর স্তম্ভনাশক, এবং বিলক্ষণ কোষ্ঠ শুদ্ধিকর।

তুষোদকের লক্ষণ ও গুণ।

তুষোদকং যবৈরামৈঃ সতুষৈঃ শকলীকৃতৈঃ।
তুষাম্বু দীপনং হৃদ্যং পাণ্ডু কৃমি গদাপহম্॥
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং পিত্তরক্ত কৃদ্বস্তি শূলনুৎ॥

তুষ সহিত অপক্ক যব কুটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া যথাবিধি আবদ্ধমুখ-কুম্ভে রাখিয়া দিলে তুষোদক বা তুষাম্বু প্রস্তুত হয়। তুষাম্বু দীপন, হৃদ্য, পাণ্ডু কৃমি নাশক; তীক্ষ্ণোষ্ণ, পাচন, রক্তপিত্তের উত্তেজক এবং বস্তিশূলহর।

সৌবীরের লক্ষণ ও গুণ।

সৌবীরন্তু যবৈ রামৈঃ পক্কৈ র্বা নিস্তুষৈঃ কৃতম্।
গোধূমৈরপি সৌবীরম্ আচার্য্যাঃ কেচিদূচিরে॥
সৌবীরন্তু গ্রহণ্যর্শঃ কফঘ্নং ভেদি দীপনম্।
উদাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দাস্থি শূলানাহেষু শস্যতে॥

পক্ক বা অপক্ক যবের তুষ ফেলিয়া তদ্দ্বারা যে কাঁজি প্রস্তুত হয় তাহাকে সৌবীর বলে। গোধূমদ্বারা উক্তরূপে যে কাঁজি প্রস্তুত হয় তাহাকেও পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ সৌবীর বলিয়াছেন। সৌবীর গ্রহণী অর্শ ও কফ নাশক, ভেদক, দীপন এবং উদাবর্ত্ত অঙ্গমর্দ্দ অস্থিশূল আনাহে প্রশস্ত।

আরনালের লক্ষণ ও গুণ।

আরনালন্তু গোধূমৈ রামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ
পক্কৈ র্বা সন্ধিতৈ স্তত্তু সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ॥

পক্ক বা অপক্ক তুষবিহীন গোধূম দ্বারা যথাবিধি কুম্ভে স্থাপনপূর্ব্বক যে বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাকে আরনাল বলে। ইহা গুণে সৌবীরের তুল্য।

ধান্যাম্লের লক্ষণ ও গুণ।

ধান্যাম্লং শালিচূর্ণঞ্চ কোদ্রবাদি-কৃতং ভবেৎ।
ধান্যাম্লং ধান্য-যোনিত্বাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্॥
অরুচৌবাতরোগেষু সর্ব্বেষাস্থাপনে হিতম্॥

শালিচূর্ণ ও কোদ্রব প্রভৃতি যথাবিধি স্থাপন পূর্ব্বক যে অম্লরসযুক্ত তরল পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধান্যাম্ল বলে। ইহা ধান্য হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া প্রীতিজনক, লঘু, অগ্নি দীপ্তিকর এবং অরুচি রোগে, সকলপ্রকার বাতে ও আস্থাপনে (ভেদ বা বমি করাইবার পর উদর-প্রশান্তির জন্য) হিতকর হইয়া থাকে।

শিণ্ডাকীর লক্ষণ ও গুণ।

শিণ্ডাকী রাজিকাযুক্তৈঃ স্যান্ মূলকদলদ্রবৈঃ।
সর্ষপস্বরসৈ বাপি শালিপিষ্টক সংযুতৈঃ॥
শিণ্ডাকী রোচনী গুর্ব্বী পিত্তশ্লেষ্মকরী স্মৃতা॥

রাইসর্ষপ সংযুক্ত মূলক (মূলা) পত্রের রস অথবা শালিতণ্ডুলচূর্ণ সংযুক্ত সর্ষপের স্বরস (গাছ-পাতা-বীজের রস) দ্বারা (যথাবিধি কুম্ভে স্থাপন পূর্ব্বক) যে পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাকে শিণ্ডাকী বলে। শিণ্ডাকী রুচিকারক, গুরু, এবং কফপিত্ত বর্দ্ধক।

শুক্তের লক্ষণ ও গুণ।

কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহ লবণানি চ।
যত্র দ্রবেত্তিস্মৃরস্তে তচ্ছুক্ত মভিধীয়তে॥
শুক্তং কফঘ্নং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং পাচনং লঘু।
পাণ্ডুক্রিমিহরং রুক্ষং ভেদনং রক্তপিত্তকৃৎ॥

তরল দ্রব্যে তৈল, লবণ, ফল ও মূলাদি ডুবাইয়া রাখিয়া যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে শুক্ত বলে। শুক্ত কফঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুচিকারক, পাচক, লঘু, পাণ্ডু ও ক্রিমিনাশক, রুক্ষ, ভেদক ও রক্তপিত্তের উত্তেজক।

প্রয়োগ—প্রধানতঃ এইরূপ কাঁজি কবিরাজগণ কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথা—আউশ ধান্য আধ-কোটা /২ সের, জল /৮ সের, একত্রে ১৫ দিন বা ১ মাস বদ্ধ-মুখ পাত্রে ভিজাইয়া রাখিলে, বা ঐ পরিমাণ আতপ তণ্ডুল ।০দশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৭।৮ সের থাকিতে গরম গরম কলসীর মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে অন্তরুৎসেক (fermentation) হইয়া তীক্ষ্ণ অম্লাস্বাদযুক্ত হয়। এই তরল বস্তু ভিনিগারের সমগুণ এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার যোগ্য কাঁজি আয়ুর্ব্বেদীয় নানারূপ পাচক ঔষধের অনুপানরূপে ও বাতব্যাধির তৈলাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাবমিশ্র বলেন—কাঁজিতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া অবগুণ্ঠন করিলে দাহজ্বর নষ্ট হয়। উদর স্তম্ভিত ও বেদনা যুক্ত হইলে দেবদারু, বচ, কুড়, শুল্ফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ কাঁজিতে পিষিয়া পেটে প্রলেপ দিবে।

অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্বা পলাশতরুজৈর্দিহেৎ।
বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য বা॥

পলাশবৃক্ষের কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত বাঁটিয়া অথবা কুলের বা নিম্বের কচি পত্র তৎসহ মন্থন করিয়া, তদুৎপন্ন ফেন লইয়া রোগীর গাত্রে মাখিলে শীঘ্র দাহ নিবারিত হয়।

ত্বক্ পত্র রাস্নাগুরু শিগ্রুকুষ্ঠৈ রম্লপ্রপিষ্টৈঃ সবচা শতাহ্বৈঃ।
উদ্বর্ত্তনং খাল্লিবিসূচিকাঘ্নং তৈলং বিপক্কং চ তদর্থ কারি॥

গুড় ত্বক্, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড় বচ ও শুল্ফা কাঁজিতে পিষিয়া অথবা কাঁজির সহিত তিলতৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে বিসূচিকা ও খাল্-ধরা উপশমিত হয়।

শাস্ত্রোক্ত বাতাজীর্ণের শার্দ্দূলকাঞ্জিকে, দাহজ্বরের কাঞ্জিক তৈলে ও উদর রোগের কাঞ্জিক ঘৃতাদিতে কাঁজি আবশ্যক হয়।

কাকজঙ্ঘা ও কাকনাসা।

বাঙ্গালা নাম—কেউয়া ঠেঙ্গা, কেয়ো ঝোকা ; হিন্দী—কাকজঙ্ঘা, মসী, ইংরাজী—Leea hirta. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কাকজঙ্ঘা নদীকান্তা কাকতিক্তা

সুলোমশা। পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকীর্ত্তিতা। সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবত পদী, দাসী কাকা।

কাকজঙ্ঘা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্তনুৎ।
নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্র ব্রণকণ্ডূবিষ ক্রিমীন্॥ ভাঃ প্রঃ

কাকজঙ্ঘা হিম, তিক্ত, কষায়, কফপিত্তঘ্ন, এবং জ্বর, রক্তপিত্ত ব্রণ কণ্ডূ বিষদোষ ও ক্রিমিনাশক।

কাকজঙ্ঘা তুষ্ণ তিক্তো ক্রমি ব্রণ কফপহা।
বাধির্য্যাজীর্ণ-জিৎ কট্বী বিষম জ্বর হারিণী॥ বাঃ নিঃ

কাকজঙ্ঘা তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ক্রমি ব্রণ ও কফঘ্ন। বাধির্য্য ও অজীর্ণ এবং বিষমজ্বর নাশক।

কাকনাসা কষায়োষ্ণো কটুকা রস পাকয়োঃ।
কফঘ্নী বামনী তিক্তা শোফার্শঃ শ্বিত্রকুষ্ঠ নুৎ॥ ভাঃ প্রঃ।

কাকনাসার বাঙ্গালা নাম—কেয়োঠুঁটী, হিন্দী—কৌয়া ঠোডী, ইংরাজী—Gymurdma Sylvestre. ইহা রসে কষায়-কটু-তিক্ত, পাকে কটু, কফঘ্ন, বমিকারক, শোথ, অর্শ, ধবল ও কুষ্ঠ-নাশক।

এই দুইটী গাছ পরস্পর বিভিন্ন, অনেকে মনে করেন দুইই এক গাছ। দেখিতে পাই অনুবাদকরগণও এসম্বন্ধে গোলমাল করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত চ্যবন প্রাশে 'কাক নাসিকা' আছে কিন্তু কয়েক পুস্তকে উহার অনুবাদ 'কাকজঙ্ঘা' দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় উক্ত অনুবাদক দুই গাছকে এক মনে করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, যেহেতু ভাবমিশ্র ও রাজ নির্ঘণ্টকার উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন শ্লোকে সুস্পষ্ট রূপে উভয়ের ভেদকরিয়াছেন। উদ্ভিজ্জতত্ব বিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন। কাকনাসার ফলের বীজ ঠিক্ কাকের চঞ্চুর মত। কাকজঙ্ঘার ডালগুলি ফাঁপা ও কাকের পায়ের মত।

আয়ুর্ব্বেদে শুধু কাকজঙ্ঘা বা শুধু কাকনাসার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, নানা ঔষধের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

২য় বর্ষ. ১০ম সংখ্যা। ১৯০০, মার্চ। ১৩০৬, চৈত্র।

মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲।

ঋষি

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

---

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যামন্দির

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—ভোজন-যজ্ঞ, অনুতাপে উদ্ধার, শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ স্তোত্রম্, চরকীয় নীতি, দ্রব্যগুণ বিচার।

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। } { ১৩০৬, চৈত্র।

ভোজন-যজ্ঞ।

ভোজন একটা বড় কম ব্যাপার নয়। প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহা মহাযজ্ঞস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। যা-পাই তাই তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলিলেই হইলনা। কি খাইতেছি? কখন খাইতেছি? কিরূপে খাইতেছি? কি উদ্দেশ্যে খাইতেছি—এই বিতর্কগুলি আহারারম্ভে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষাপূর্ব্বক একবার মনে প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। পুরোহিত ব্রাহ্মণ যেমন অসময়ে অনবস্থিত চিত্তে অযথাভাবে সত্বর "নমো নমঃ" করিয়া উঠিয়া পড়িলে কখনই উপাস্য দেবতার আবাহন সংকল্প সাধিত হয় না, তেমনি ভোজন-যজ্ঞের আয়োজন-নিষ্পাদনে ত্রুটি হইলে ঐ মহাযজ্ঞের অভিপ্রায় কদাপি সম্পূরিত হয় না। এই যজ্ঞের যজ্ঞপতি অধিষ্ঠাতৃদেব জঠরাগ্নিরূপী ব্রহ্মা, ইহার উপচার সামগ্রী চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয়াদি ষড়্জাতীয় আহার্য্য, ইহার দক্ষিণা চিত্তপ্রসাদ, কাম্যবস্তু আয়ু ও অনাময়, ক্ষুধা এই যজ্ঞের ভক্তিস্থানীয়, এ যজ্ঞের যাজক স্বয়ং ভোক্তা, নিষ্ক্রয় লভ্য পুরোহিতে এ কার্য্য চলেনা।

চরক লিখিয়াছেন—

> আহিতাগ্নিঃ সদা পথ্যান্যন্তরাগ্নৌ জুহোতি যঃ।
> দিবসে দিবসে ব্রহ্ম জপত্যথ দদাতি চ॥
> নরং নিঃশ্রেয়সে যুক্তং সাত্মজ্ঞং পানভোজনে।
> ভজন্তে নাময়াঃ কেচিৎ ভাবিনোঽপ্যন্তরাদৃতে॥
> ষড়্ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি রাত্রীণাং হিতভোজনঃ।
> জীবত্যনাতুরো জন্তু র্জিতাত্মা সম্মতঃ সতাম্॥ *

আহিতাগ্নি নৈষ্টিক ব্রাহ্মণগণ যেমন প্রাতঃ সন্ধ্যায় প্রণবাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোমাগ্নির মধ্যে যথাবৎ আহুতি দান করিয়া তৎফলস্বরূপ ইহ-পরত্র স্বাস্থ্য ও স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন, তদ্রূপ যিনি উদরাগ্নিকে সযত্নে সংরক্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মনাম জপ করিতে করিতে উহাতে দিন দিন সুপথ্যরূপ অঞ্জলি উৎসর্গ করেন, সেই পান ভোজন হিতাহিতজ্ঞ মঙ্গল-নিরত ব্যক্তি অপথ্য ও অধর্ম্ম এতদুভয়েরই অভাব নিবন্ধন ইহকালে ও পরকালে দৈহিক বা মানসিক কোনও কষ্টের দ্বারাই আক্রান্ত হয় না,—সেই জিতাত্মা হিত-ভোজী পুরুষ নীরোগদেহে শতবর্ষ জীবন ধারণ পূর্ব্বক সজ্জনগণের সন্নিধানে সম্মানার্হ হইয়া থাকেন।

ধনবান্ ব্যক্তি স্বকীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে মণিরত্নাদি বহুমূল্য পূজা-সম্ভার সংগ্রহপূর্ব্বক দেবার্চ্চনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, হউন্। ইহাতে আপত্তি কি? কিন্তু দেখা উচিত এই আড়ম্বর পূজার মূলে সেই আসল্ জিনিস্ ভক্তিটী আছে কি না। যদি তাহা না থাকে সমস্ত আয়োজনই অন্ধের নেত্র বিস্ফারণবৎ পণ্ড। সেইরূপ যদি ক্ষুধার অভাব হয়, তবে বিলাসবুদ্ধি প্রণোদিত সহস্র রাজ-ভোজেই বা কি ফল? প্রাণে ভক্তি থাকিলে, তুলসীমাত্র নিক্ষেপেও স্বর্গের সিংহাসন নড়িয়া উঠে, তেমনি ক্ষুধা থাকিলে শাকভাতেই আত্মার পরিতৃপ্তি ও দেহের দিব্যকান্তি হইয়া থাকে।

দেবপূজা যেমন একাগ্রচিত্তে করিতে হয়, আহার সম্বন্ধেও চরকের সেইরূপ উপদেশ—"তন্মনা ভুঞ্জীত" অর্থাৎ তন্ময়চিত্তে ভোজন করিবে। কাম-ক্রোধাদি বিলোড়িত হৃদয়ে সেই একাগ্রতা অতীব দুর্লভ, এবং তদভাবে পূজাই বা কোন্ কার্য্যের?

পুনরায় ঋষি বলিতেছেন—

মাত্রয়াপ্যভ্যবহৃতং পথ্যং চান্নং ন জীর্য্যতি।
চিন্তাশোক ভয় ক্রোধ দুঃখ শয্যা প্রজাগরৈঃ॥

দুশ্চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, কষ্ট-শয়ন বা রাত্রি জাগরণ দ্বারা দেহমন প্রপীড়িত হইলে যথামাত্রায় ভুক্ত হিতকর খাদ্যও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

পূজার আয়োজন সযত্ন-সম্পন্ন পবিত্র ও শ্রদ্ধাকর হওয়া চাই আহার্য্যগুলি ও শুচি যত্নঃপূত রুচিকর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়

আজকাল আহার্য্যের শুচিত্ব বিষয়ে মহান্ বিঘ্ন লোকসমাজে সমুপস্থিত হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীদিগের বিলাসপ্রিয়তা ও পুরুষগণের শূন্যগর্ভ অভিমান বুদ্ধির কুফলে সামান্য উপার্জ্জনক্ষম গৃহস্থ ও স্বার্থানুসারী পাচকের হস্তে এই যজ্ঞের আয়োজনভার বিন্যস্ত রাখেন। এরূপ বহুবার দেখা গিয়াছে—পাচকের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে প্রস্রুত স্বেদবিন্দু বা মুখ-নিক্ষিপ্ত থুৎকার প্রস্তুত খাদ্য মধ্যে পতিত হইলে, কোনও কীট পতঙ্গের ছিন্ন পালক দ্বারা বিড়াল কুকুরাদির জিহ্বা-লালা দ্বারা কোনও খাদ্য সংমিশ্রিত হইলে কয়জন পাচকের ধর্ম্মভীরুতা জাগরিত হইয়া উঠে,—কয়জন তখন গৃহস্বামীকে জানাইয়া নূতন আহারায়োজন করিয়া দেয়? ইতঃপূর্ব্ব সময়ে গৃহস্থালীমধ্যে প্রাচীনা গৃহিণী সুযোগ্যা পুত্রবধূ বা কন্যা প্রভৃতি স্বজনগণই পর্য্যায়ক্রমে দিন দিন রন্ধনের ভার লইতেন, এপ্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে চলিল! জায়াজননীপ্রভৃতি প্রিয়জনের স্বহস্ত সম্ভাবিত যথালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ অন্নের মধ্যেও বুঝি তাঁহাদের প্রাণের অপূর্ব্ব স্নেহরস অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায় তাই তাহা এত মধুর! এত স্পৃহণীয়!

বিষয়লিপ্সু উদ্যমশীল কর্ম্মযোগীরা অনেক সময় অর্থাদি উপার্জ্জনে একাগ্রচিত্ত ও অনন্যচেষ্ট হইয়া সম্মুখ-স্থিত সুখসেব্য ভোজ্যনিচয়ের লেশমাত্র শশব্যস্তভাবে আস্বাদন পূর্ব্বক সত্বর লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হইয়া থাকেন। এরূপ করা তাঁহাদের পক্ষে একটা মহা অপরাধের কার্য্য। তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত—আহারের প্রভাবেই মানুষের বলবুদ্ধি উদ্যম। লোকশকথায়—কয়লার জোরেই গাড়ী চলিয়া থাকে। কয়লার অসদ্ভাবে বা অসম্যক্‌সংগ্রহে উহা কতকাল চলিবে? দেহ পাত হইলে কোথায় অর্থ? কোথায় কাম? কোথায় কিছু? শরীরই নিখিল কাম্যবস্তুর ভিত্তিস্বরূপ, যে কোনও উপায়ে শরীর রক্ষা আবশ্যক! তাই বুঝিয়াই বোধ হয় চার্ব্বাক বলিয়াছিলেন—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

নাস্তিক চার্ব্বাক শরীর রক্ষারূপ পুণ্যকার্য্যের জন্য ঋণরূপ পাতকে অঙ্গীকার করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্ম্মভীরুযুবক! অবশ্য অতটা অকার্য্য করিও না, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও—ভোজন চর্ব্বণগিলনাত্মক একটা সামান্য কায়িক ব্যাপার নহে, ইহা এক সুমহৎ নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্ম স্বরূপ।

সেই এঞ্জিনিয়ার প্রবর জগৎপিতা এই ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য জীব-জঠরে ক্ষুধা দিয়াছেন। এই ক্ষুধার তুল্য চাবুক আর নাই। মানুষ এ চাবুকের অগ্রাহ্য করিতে কখনই পারিবেনা। কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানের উপকরণসামগ্রী ও বিধি বৈলক্ষণ্য সমস্তই মানুষের হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। অতএব এবিষয়ে মানুষের সদ্বুদ্ধি থাকিলেই মঙ্গল। নতুবা কায়মানসিক অধঃপতন অনিবার্য্য।

অনুতাপে উদ্ধার।

যেমন খাদ ব্যতীত গড়ন হয়না, তেমনই পাপ ব্যতীত মানুষ হয় না। মানুষের সহিত পাপের সংস্রব আছে বলিয়াই মানুষ-মানুষ; নচেৎ মানুষ দেবত্ব লাভ করিত। তবে পাপের মাত্রা অতিরিক্ত হইলেই তাহা প্রকৃত "পাপ" নামে পরিগণিত হইয়া ধর্ম্মরাজের দণ্ডযোগ্য হয়। যে কোন বিষয়ের অতিরিক্ততা মাত্রই যখন দূষণীয়, তখন পাপের মাত্রা যে অধিক হইলে মানুষের যন্ত্রণার সীমা থাকে না তাহা বলাই বাহুল্য। সামঞ্জস্যেই সুখ রৌদ্র ও মেঘের সামঞ্জস্যেই ধরণী উর্ব্বরা স্বামীস্ত্রীর পবিত্র হৃদয়ের সামঞ্জস্যেই সংসার সুখময়। মানুষ যখন এই সামঞ্জস্যের শান্তিময় শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয় তখনই তাহার পাপের বোঝা ভারি হয় এবং সেই পাপের বোঝা যখন পূর্ণ হয় পাপ যখন আধারে আর ধরেনা উছলিয়া উছলিয়া পড়ে তখনই মানুষ আপন পাপ কার্য্য স্মরণ করিয়া মরমে মরমে দগ্ধ হয় যন্ত্রণায় হৃদয় ঝলসিয়া যায় বুক ফাটিয়া হৃদয় গলিয়া নয়ন ধারা রূপে প্রকাশ পায়। এই হৃদয় গলা নয়ন জলই পাপীর জীবনের শান্তিজল এই নয়ন জলেই হৃদয়ের পঙ্কিলতা বিধৌত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়। এবং যখন এই নয়ন জল মানবের ভাগ্যে প্রকাশ হয় তখনই মানব ভগবচ্চরণ স্মরণ পূর্ব্বক বলিতে পারে "প্রভু কত পাপ করিয়াছি আমার গতি কি হইবে আমাকে ক্ষমা কর যেন আর এমন দুর্ম্মতি না হয়।" এই অনুশোচনার নামই যথার্থ অনুতাপ। পাপ যখন আধারে ধরে না তখনই অনুতাপের প্রকাশ হয়। পাপী যতই পাপ করুকনা এক দিন না এক দিন স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত ফলে অবশ্যই অনুতপ্ত

হইবে। কুরুরাজ দুর্য্যোধন নিরপরাধী পাণ্ডব গণের সহিত প্রতিনিয়ত শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন তাঁহাদিগকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া বনবাস দিয়াও চিত্ত শান্ত হইল না শেষে দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া কুরু পাণ্ডবের মহাসমরের সৃষ্টি করিলেন ভারতের সেই মহাসমরে বহু ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল হইল তথাচ তাঁহার আশা মিটিলনা পাপের অনুশোচনা প্রকাশ পাইলনা ক্রমে উভয় পক্ষের সমগ্র বাহিনী নির্ম্মূল হইলে নৃপতি দুর্য্যোধনের পক্ষে গুরুপুত্র অশ্বত্থামা ও গুরু-সখা কৃপাচার্য্য জীবিত ছিলেন এই সময় পাণ্ডববীর ভীমের গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হইয়াছিল সুতরাং তিনি তখন চলৎ শক্তি রহিত তথাচ তিনি মনের অদম্য গতিকে নিবৃত্ত করিতে নাপারিয়া গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া পাণ্ডব বিনাশের আদেশ করিলেন। বীর অশ্বত্থামা ধরণীকে অপাণ্ডবা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া রজনী যোগে পাণ্ডব বিনাশার্থ গমন করিলেন। তিনি আপন প্রতিভা ও স্তববলে পাণ্ডব রক্ষক দ্বারী পশুপতিকে (শিবকে) প্রবোধ করিয়া তস্করের ন্যায় পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সেসময় পঞ্চ পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণ ও পত্নী এবং কৃষ্ণসখা সাত্যকী সহ স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। শিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নিদ্রিত ছিলেন অন্ধকার রজনীতে অশ্বত্থামা সেই পঞ্চ ভ্রাতাকে হস্ত দ্বারা ক্রমান্বয়ে স্পর্শকরিয়া তাঁহাদিগকে পঞ্চ পাণ্ডব বিবেচনা করিয়া স্বীয় কোষবদ্ধ খড়্গ নিষ্কাসিত পূর্ব্বক সেই পঞ্চ ভ্রাতার শিরশ্ছেদন করিয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক নৃপতির নিকট চলিলেন। আজ পঞ্চ পাণ্ডবের কর্ত্তিত মুণ্ড দর্শনে না জানি নৃপতি কতই আনন্দিত হইবেন। তৎকালে এইরূপ কত কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি যথা সময়ে সেই পঞ্চমুণ্ড লইয়া নৃপতিকে উপহার দিলেন তিনিও বৈরী নির্য্যাতনে প্রথমে কতই আনন্দানুভব করিলেন পরে পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন এপঞ্চমুণ্ড পঞ্চপাণ্ডবের নহে পাণ্ডব পুত্র গণের। তখন তাঁহার বিষাদের সীমা রহিল না এই কার্য্যে কুরুবংশ নির্ম্মূল হইল ভাবিয়া মরমে মরিতে লাগিলেন তখনই তিনি আপনার কর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক কাতর স্বরে বিলাপ করিয়া গুরুপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে নারাখিলে"

অনুতাপে তাঁহার হৃদয় শতধা হইল ইহাই যথার্থ অনুতাপ। এই যথার্থ

অনুতাপের দ্বারাই মঙ্গল ময় শ্রীভগবান্ পাপীকে প্রসন্ন হন। এই জন্যই খৃষ্টানের বাইবেল, মহম্মদের কোরাণ, হিন্দুর শাস্ত্র পাপীকে পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

অনুতাপ দ্বারা যে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হয়েন আমরা তাহা ব্রজ গোপীগণের চরিত্রালোচনা করিয়া দেখিলেও বেশ বুঝিতে পারি। যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে—কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসীর দিবস রাসলীলার বাসনা করিয়া যে সকল প্রেমময়ী গোপীকা দিগকে বংশীদ্বারা আবাহন করিয়াছিলেন সেই সকল সমাগতা গোপীকাগণ আপনা দিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী জ্ঞানে সর্ব্ব-গোপীগণ অপেক্ষা আপনাপন শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন ইহাতে সেই দর্প হারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দর্প হরণ মানসে একটি খেলা খেলিলেন অর্থাৎ তিনি সেই সমগ্র গোপীকা মণ্ডলী হইতে তাঁহার হ্লাদিনী অংশ শ্রীরাধাকে লইয়া লীলাস্থল হইতে অন্তর্হিত হইলেন তখন তাঁহার অভাবে গোপীকা গণ ভগ্ন মনোরথ হইয়া কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা সহ অন্তর্ধানে সকলেই শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের পরমা প্রেয়সীজ্ঞানে আপনাদিগের নিকৃষ্টতানুভব করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এই অনুতাপের কৃপাতেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। আবার শ্রীরাধিকা যখন দেখিলেন সমগ্র গোপী মণ্ডলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকেই গ্রহণ করিলেন তখন তিনিও আপনার অসীম গৌরবে স্ফীতা হইয়া উঠিলেন শ্রীকৃষ্ণের তাহা বুঝিতে বাকী রহিলনা তৎক্ষণাৎ তিনি অন্তর্ধান হইলেন। তখন শ্রীরাধিকার ক্ষোভের সীমারহিলনা পরে যথার্থ অনুতাপ দ্বারাই তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমরা জীব প্রতি মুহূর্ত্তেই পাপের তরঙ্গে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি যখন প্রাণ সেই তরঙ্গের তীব্র আঘাতে ওষ্ঠাগত হইয়াপড়ে তখন আর কিছুতেই স্পৃহা থাকেনা জগতের কিছুতেই যেন প্রাণের তৃপ্তি সাধন হয় না তখন সেই শান্তিময়ের শীতল চরণ দুটি ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছাহয় সে রোদনকত মধুর কত অমৃত ময় কেমন করিয়া বলিব! কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের যেন কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে আর্ত্তনাদ সে যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে যেন কেমন একটা দেবত্বের ছায়া পড়ে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। এমন

ভাবান্তরের কারণ কি? সেই যে তুমি আপনার অবসাদ ময় জীবন খানি লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলে "আর পারি না প্রভো"—তাহা আর কিছু নহে যথার্থ অনুতাপের বেদনা মাখান সুর সে নয়ন ধারা হৃদয় জুড়ান অনুতপ্ত অশ্রুজল অনুতাপী পাপীর বেদনা মাখান সুর ভগবচ্চরণে পৌঁছায়, সে নয়ন জল তাঁহার চরণ দুটি ধৌত করিয়াদেয়। তাই তিনি প্রসন্ন হইয়া মানব হৃদয়ে তাঁহার স্নেহাশীষ প্রদান করেন তাই অনুতপ্ত জীবন খানি জুড়াইয়া যায় হৃদয়ের ভার লাঘব হয় জীবন অমৃত উচ্ছাসে পূর্ণ হয়। হায়! আমরা কতদিনে সেই যথার্থ অনুতাপের কৃপাকণা লাভ করিয়া ভগবৎ প্রসন্নতা লাভ করিব!!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)

শিবাপরাধ-ক্ষমাপন-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্)

(১)

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ক্বথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্‌যদ্‌ বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি সততং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

পূর্ব্বজন্মে করিয়াছি অন্যায় করম,
তাই মোর মাতৃগর্ভে হইল জনম।
বিষ্ঠা-মূত্র-মধ্যে বাস করি অবিরত
জঠর-অনল-জ্বালা সহিয়াছি কত!
যত কষ্ট পাইয়াছি তথা অনুক্ষণ
বর্ণন করিবে তাহা, হেন কোন্‌ জন?
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর!

(২)

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্যঃ চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগোত্থদুঃখাদ্রুদনপরিবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো

বাল্যে দুঃখ-যুত, মলে মর্দ্দিত-শরীর,
স্তন্যপান হেতু কত হয়েছি অধীর।
ইন্দ্রিয় থাকিতে ছিনু জড়ের মতন,
পিপীলিকা মশকাদি করিত দংশন।
বিষম ব্যাধির জ্বালা, ক্ষুধায় কাতর,
তাই নাহি স্মরিয়াছি তোমায় শঙ্কর!
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর!

(৩)

প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্ম্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতিস্বাদলৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

আসিলে যৌবন, পঞ্চ বিষয়-ভুজঙ্গ
মর্ম্মে মর্ম্মে দংশে ছিল এই মোর অঙ্গ।
লইয়া যুবতী নারী, ল'য়ে পুত্র ধন
যা ছিল বিবেক-বুদ্ধি, দিনু বিসর্জ্জন।
মানে গর্ব্বে তব চিন্তা না করিল মন,
শেষে আমি প্রৌঢ় হ'য়ে পড়িনু তখন।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর!

(৪)

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়ানাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ
পাপৈ রোগৈ র্বিয়োগৈ স্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনঞ্চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈ র্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটে র্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

প্রৌঢ়কাল চ'লে গেল, বার্দ্ধক্য এখন,
তথাপি ইন্দ্রিয়-সুখে ব্যস্ত অনুক্ষণ!
ত্রিতাপ বিয়োগ রোগ পাপ সমুদয়
সহিয়াও এ দেহের নাহি হ'লো ক্ষয়!
মিথ্যা মোহ-অভিলাষে করিয়া ভ্রমণ
না করিল তব চিন্তা কভু মোর মন!
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৫)

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যং
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে সুসারে।
নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

স্মৃতিমত কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়,
চেষ্টাও করিতে মোর শক্তি নাই তায়।
দ্বিজোচিত ব্রহ্মমার্গ একমাত্র সার,
বেদোচিত কর্ম্ম পুনঃ অসাধ্য আমার।
শুনিতে চিন্তিতে ধর্ম্ম-কথা নাহি চাই,
কিবা ফল তবে ধ্যান করিয়া সদাই?
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৬)

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিৎ পৃথুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।

নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৌ ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

প্রত্যুষে করিয়া স্নান স্নপন কারণ
না আনিনু গঙ্গাজল ভুলেও কখন।
অতি সুদুর্গম বন সন্ধান করিয়া
না আনিনু বিল্বপত্র পূজার লাগিয়া।
গন্ধধূপ কিম্বা পদ্মমালা সরোবরে
না আনিতে চাহিলাম কভু তব তরে।
শিব শিব শিব শম্ভু মহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৭)

দুগ্ধৈ র্মধ্বাজ্যযুক্তৈ র্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকরচিতং পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈ র্বিবিধরসযুতৈ র্নাপি ভক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

দুগ্ধ মধু ঘৃত দধি শর্করা লইয়া
নাহি দিনু লিঙ্গ তব স্নান করাইয়া।
কনক-রচিত লিঙ্গে লেপিয়া চন্দন,
কিম্বা পুষ্প দিয়া নাহি করিনু পূজন।
না দিনু সুরস ভক্ষ্যদ্রব্য উপহার,
না দিনু কর্পূর-দীপ কিম্বা ধূপ আর।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৮)

গঙ্গাতীরেঽপ্যুষিত্বা দলকুসুমফলৈঃ ক্ষালিতৈ র্গাঙ্গতোয়ৈঃ
গাঙ্গং নির্ম্মায় লিঙ্গং শতশতশতকং নার্চ্চিতং ভূতলে মে।
নো লিঙ্গং গেহমধ্যে ধরণিতলগতৈ র্মৃত্তিকাগোময়ৈ র্বা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

গঙ্গাতীরে করি বাস, গঙ্গামাটী দিয়া
শত শত শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া,
দিয়া পত্র-ফল-পুষ্প ধুয়ে গঙ্গাজলে
না করিনু পূজা তব আসিয়া ভূতলে।
মৃত্তিকা গোময়ে কিম্বা করিয়া রচন
তব লিঙ্গ না পূজিনু ভুলেও কখন।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৯)

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং তে লক্ষসংখ্যং হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো তপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপৈ স্তদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

বারেক তোমার নাম করিয়া স্মরণ
না করিনু ধনদান ব্রাহ্মণে কখন।
জপিতে জপিতে বীজমন্ত্র অনিবার
অনলে আহুতি নাহি দিনু লক্ষবার।
যথাবিধি রুদ্র-জপ করিয়া স্মরণ
গঙ্গাতীরে তপ নাহি করিনু কখন।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(১০)

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে দ্যোতরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গং তদ্ব্রহ্মবাচ্যং সকলমতিমতং নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

নিরোধি প্রণব-বায়ু বসি পদ্মাসনে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে স্বরূপ-চিন্তনে

দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ে হৃদি করিয়া ধারণ
পরমাত্মে আত্মহারা না হনু কখন্।
কভু না হেরিনু মোর মানস ভিতরে
তব পূর্ণ ব্রহ্মরূপ মন প্রাণ ভ'রে।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর॥

(১১)

নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধ স্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি র্বিগতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মত্তাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

উলঙ্গ নিঃসঙ্গ শুদ্ধ ত্রিগুণ-রহিত,
মোহ-পরিশূন্য ভব-গুণ-বিবর্জ্জিত,
ধ্যানকালে ন্যস্তদৃষ্টি নাসারন্ধ্র-দেশে,
এরূপে না রহিলাম মনের হরষে।
হে শঙ্কর কলি-কাল-পাপ-বিনাশন!
মত্ত হ'য়ে না করিনু তোমার স্মরণ।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(১২)

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
সর্পৈ র্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ॥

স্মরহর গঙ্গাধর শশাঙ্ক-শেখর,
ভুজঙ্গ-ভূষিত-কণ্ঠ-শ্রবণবিবর
নেত্র-বৈশ্বানর দেব ক্ষেমঙ্কর হর,
ত্রিভুবন-সার হস্তি-চর্ম্মাম্বর-ধর।

মোক্ষহেতু কর তব সুনির্ম্মল মন,
অন্য কোন কর্ম্মে আর কিবা প্রয়োজন !

(১৩)

কিং বানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভি র্দেহেন গেহেন কিম্ ।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্ ॥

হস্তি-অশ্ব-ধনে কিবা রয় প্রয়োজন ?
বিশাল সাম্রাজ্য ল'য়ে কি ফল কখন্ ?
পুত্র মিত্র কলত্র পশুতে কিবা হয় ?
দেহে গেহে প্রয়োজন কিবা আর রয় ?
এই সব ক্ষণস্থায়ী জানিয়া রে মন !
শীঘ্র দূর কর তাহা, রেখো না কখন।
আত্মোন্নতি-হেতু যদি গুরুবাক্যে মতি,
ভজ ভজ ভজ সেই পার্ব্বতীর পতি !

(১৪)

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুন র্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥

দেখিতে দেখিতে আয়ু যাইছে চলিয়া,
যৌবন যাইছে চলি, দেখিনু ভাবিয়া,
চলিয়া যাইছে দিন, না ফিরিছে আর,
গ্রাস করিতেছে কাল জগৎ-সংসার,
তরঙ্গের মত লক্ষ্মী অস্থির নিয়ত,
এ জীবন ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের মত।
বড়ই বিপদ্ মোর বিপদ্-শরণ !
কর কর রক্ষা মোরে, ওহে ত্রিলোচন !

(১৫)

বপুঃপ্রাদুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মনি পুরা
পুরারে ন প্রায়ঃ কচিদপি ভবন্তং প্রণতবান্।
নমন্ মুক্তঃ সম্প্রত্যহমতনুরগ্রেহপ্যনতিভাক্
মহেশ ক্ষন্তব্যং তদিদমপরাধদ্বয়মপি॥

পূর্ব্বজন্মে এ দেহ যে ছিল বিদ্যমান,
এ জন্মে এ দেহ দেখি হয় অনুমান।
পূর্ব্বজন্মে হে শঙ্কর! আসিয়া ধরায়
প্রণাম না করিয়াছি প্রায় হে তোমায়।
এ জন্মে প্রণমি হ'লো দেহের মোচন,
দেহ নাই, কিসে করি প্রণাম এখন।
দুই জন্মে দুই দোষ করেছি শঙ্কর,
এখন ক্ষমিতে তাহা হও হে সত্বর।

(১৬)

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা, শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিদিতমবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব, জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

কায় মন বাক্য কর অথবা চরণে,
কার্য্যসূত্রে কিম্বা আর শ্রবণে নয়নে,
জানিয়াই হোগ্ কিম্বা হোগ্ না জানিয়া
করেছি যে সব পাপ ভ্রমেতে পড়িয়া,
সেই সব পাপ মোর ক্ষমহ সত্বর,
জয় জয় শিব শম্ভু করুণাসাগর!

(১৭)

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গাং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্।
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি॥

যিনি শান্তি-নিকেতন, শশাঙ্ক-ভূষণ,
পদ্মাসন পঞ্চানন যিনি ত্রিলোচন,
ত্রিশূল পরশু খড়্গ পুনশ্চ কুলিশ
দক্ষিণাঙ্গে শোভা পায় যাঁর অহর্নিশ,
অঙ্কুশ ডমরু নাগ পাশ ঘণ্টা আর
মনোহর শোভা করে বামাঙ্গে যাঁহার,
স্ফটিক সমান যিনি, ভূষণ-শোভন,
ভজি আমি নিত্য সেই পার্ব্বতীরমণ!

(১৮)

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥

বন্দি উমাপতি, বন্দি সুর-শ্রেষ্ঠ-ধন,
বন্দি সর্ব্বক্ষণ সেই জগৎ-কারণ।
বন্দি মৃগধর, বন্দি পন্নগ-ভূষণ,
বন্দি সেই পশুপতি আমি সর্ব্বক্ষণ।
বন্দি সেই চন্দ্র-সূর্য্য-অনল-নয়ন,
বন্দি আমি নিত্য সেই হরি-প্রিয়-ধন।
বন্দি সেই ভক্তজন-পরম-শরণ,
বন্দি সেই শিব শম্ভু মঙ্গল-বচন।

(১৯)

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতে শ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধণি
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ॥

শুভ্র-ভস্ম-দেহ, শুভ্র সহাস্য-বদন,
নরের কপাল শুভ্র হস্তে-অনুক্ষণ,

সুন্দর খট্টাঙ্গ শুভ্র শোভে অবিরল,
শুভ্র বৃষ, শুভ্র পুনঃ কর্ণের কুণ্ডল,
শুভ্র গঙ্গাজল-ফেন, শুভ্র জটাভার,
ভালে শুভ্র চন্দ্রদেব শোভে অনিবার,
শুভ্র বস্তু ল'য়ে যাঁর প্রীতি সর্ব্বক্ষণ,
সেই শিব দিন মোরে পাপনাশী ধন!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ

চরকীয় নীতি।

ন নিয়মং ভিন্দ্যাৎ—নিয়ম-ভঙ্গ করিও না, যদি পিতৃ-পিতামহাদি-কৃত কোনও শুভোদ্দেশ্যমূলক প্রথা গৃহমধ্যে প্রচলিত থাকে, তাহা সহসা লঙ্ঘন করিও না, অথবা যদি তুমি নিজে বহুবিচার পূর্ব্বক কোনও নিত্য-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া থাক, তবে তৎসম্বন্ধেও বিস্মৃত বা অনভিনিবিষ্ট হইও না।

ন বৃদ্ধান্ ন গুরূন্ ন গণান্ ন নৃপান্ বাধিক্ষিপেৎ ন চাতিক্রয়াৎ—বৃদ্ধদিগের বিষয়ে, গুরুদিগের সম্বন্ধে, কোনও সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে এবং রাজার সম্বন্ধে কোনও নিন্দাবাণী মুখে আনিও না, অথবা তাঁহাদের অভ্যাস বা ক্রিয়াকলাপের অতিরঞ্জিত বর্ণনাও করিও না।

নাভৃতভৃত্যো না বিশ্রব্ধস্বজনো নৈকঃসুখী স্যাৎ—রক্ষিত ভৃত্যের পালনে অমনোযোগ, স্বজন সমূহের প্রতি অবিশ্বাস, এবং পর-সুখ-দুঃখে অন্ধ হইয়া কেবল আত্মসুখ-চেষ্টা কদাপি করিও না।

ন গবাং দণ্ড মুদ্যচ্ছেৎ—গাভীর প্রতি কখনও দণ্ড উত্তোলিত করিও না।

দ্রব্যগুণ বিচার।

কার্পাসী।

বাঙ্গালা নাম—কাপাস; হিন্দী—কপাস, রুইকে পেড়; ইংরাজী—Cotton Plant; সংস্কৃত পর্য্যায়—কার্পাসী তুণ্ডিকেরী চ সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে। সংস্কৃত নাম—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা। অন্যনাম—বদরা, পটদ, সূত্রপুষ্পা, চব্যা, তুলা, গুড়, মরুদ্ভবা, পিচু, ছাদন।

কাপাসের গাছ মানুষের জোড় বা দুই গুণ উচ্চ হয়। পাতা প্রায় স্থলপদ্ম পাতার মত, ঝোঁপা ঝোঁপা ফল গুলি ফাটিয়া তুলা বাহির হয়, তাহার মধ্যে বড় এলাচের দানা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় কাল কাল বীজ থাকে। ফুল শাদা হয়। কিন্তু আর এক প্রকারের কাপাস আছে তাহার ফুল লাল, তাহাকে "রক্ত কাপাস" বলে। ভারতবর্ষে কাপাস বৃক্ষ বহুল পরিমাণে জন্মে।

শ্বেত কাপাসের গুণ।

কার্পাসকী লঘুঃ কোষ্ণা মধুরা বাতনাশিনী।
তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু॥
তৎকর্ণ পীড়কা নাদ পূয়স্রাব বিনাশনম্॥

শ্বেত কার্পাস লঘু, ঈষদুষ্ণ, মধুর রস, বায়ুনাশক। ইহার বীজ স্তন্যপ্রদ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, কফকর ও গুরু। ইহা কর্ণ-পীড়কা, কর্ণনাদ, ও কর্ণের পূয়স্রাব বিনাশক।

রক্তকাপাসের গুণ।

রক্তকার্পাসিকা স্বাদী স্তন্যবৃদ্ধিকরী তথা।
কিঞ্চিদুষ্ণা বলকরী কষায়া চ লঘুঃ স্মৃতা॥
কফপিত্ত তৃষাদাহ ভ্রম শ্রম বমী হরা।
মূর্চ্ছাবিনাশিনী শীতা প্রোক্তা গুণ বিশারদৈঃ॥
তৎপলাশ সমীরঘ্নং রক্তকৃৎ মূত্রবর্দ্ধনম্॥

রক্তকার্পাস স্বাদু, কষায় রস, স্তন্য বৃদ্ধিকর, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, বলকর, লঘু, কফপিত্ত তৃষ্ণাদাহ ভ্রম শ্রম ও বমী নাশক। ইহা মূর্চ্ছা প্রশমক, শীতল, এবং ইহার পাতা বায়ুনাশক, (জরায়ুর) রক্ত স্রাব কারক এবং মূত্রবৃদ্ধি কর।

প্রয়োগ—কাপাসের প্রধান প্রয়োগ বস্ত্রাদি নির্ম্মাণের উপকরণ

সম্বন্ধীয়। বস্ত্র বয়ন জন্য এপর্য্যন্ত যতপ্রকার সূত্রপ্রদ বৃক্ষ বা প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কার্পাসকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ইহার বস্ত্র নাতি শীতোষ্ণ, সুখস্পর্শ, এবং ভারতবাসীর পক্ষে শীত-গ্রীষ্মে দেহের সমান উপকারী।

কাপাসের বীজ বাতরোগের স্বেদ জন্য ব্যবহৃত হয়। শঙ্কর স্বেদ নামে শাস্ত্রে যে উৎকৃষ্ট স্বেদ আছে তাহা এই—

কার্পাসাস্থি কুলত্থিকা তিলযবৈরেরণ্ড মূলাতসী।
বর্ষাভূ শণবীজ কাঞ্জিক যুতৈ রেকীকৃতৈ বা পৃথক্।

কাপাসবীজ, কুলথ, তিল, যব, এরণ্ডমূল, মসিনা, পুনর্ণবা, ও শনবীজ একত্র কাঁজিসহ বাটিয়া পোট্টলী করতঃ অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া স্বেদ দিলে নানাস্থানের বাতব্যথা দূর হয়।

কোনও স্থান ফুলিলে ও ব্যথা হইলে কাপাসবীজ চূনের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। কর্ণমধ্যে ব্রণ হইয়া পুঁজ নিঃসৃত হইলে কাপাস-বীজ-সিদ্ধ সর্ষপ তৈল কাণে দিতে হয়।

স্ত্রীলোকের স্তনে দুধ কম হইলে কাপাস পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবার নিয়ম আছে।

সংস্কৃতে যে "রক্ত কার্পাস" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই সম্ভবতঃ আজকালকার "ওলট কম্বল"! ওলট কম্বলের গুণ জানিতে বোধ হয় আর কাহারও বাকী নাই। ইহার মূল বা পত্রের রস বাধক রোগের বিশেষ উপকারী। অনেকে বলেন রক্তঃকৃচ্ছ্র ও বাধক ব্যথার পক্ষে এমন ঔষধ আর নাই। রক্ত কার্পাসের গুণবর্ণক শ্লোকটির শেষ পংক্তিতে যে "রক্তকৃৎ" বিশেষণটী রহিয়াছে তাহাদ্বারাই এই প্রসিদ্ধ গুণের আভাস পাওয়া যায়। সচরাচর বাধক রোগে শুধু ওলট কম্বলের শিকড় (আন্দাজ ৵০ আনা বা ১০ আনা পরিমাণ) ২॥০-টা গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাইবার প্রথা আছে।

শ্রীমদ্ গোবিন্দ দাস স্বকৃত সংগ্রহে এই উৎকৃষ্ট যোগটী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কন্দং রক্তোৎপলস্যাথ রক্ত কার্পাস মূলকম্।
করবীরস্য মূলানি তথা রক্তোড্র মূলকম্
বকুলস্য তথা মূলং গন্ধ মাতৃক জীরকৌ

রক্ত চন্দনকং চৈব সমভাগঞ্চ কারয়েৎ
তণ্ডুলোদক সংপিষ্টং যোনিরোগ হরং পরম্।

অর্থাৎ রক্তোৎপলের মূল, লালকাপাসের মূল, করবীর মূল, লাল জবা বৃক্ষের মূল, বকুলমূল, গন্ধবোল, জীরা ও রক্তচন্দন এই সমুদায়ের চূর্ণ তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে যোনিশূল, কুক্ষিশূল প্রভৃতি নানারূপ বাধক অপসৃত হয়।

কাপাসের তুলা পোড়াইয়া তাহা আহত স্থানে লাগাইলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়, ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

ঘৃতসংযুক্ত কাপাসের তুলা দগ্ধ ক্ষতাদিতে লাগাইয়া রাখিলে বাহ্যবায়ুর সংস্পর্শ স্থগিত ও তৎস্থানের স্বাভাবিক তাপ সংরক্ষিত হওয়ায় বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়।

কাল-কাসুন্দে।

বাঙ্গালা—ঐ, ইংরাজী—Casia Sofora. সংস্কৃত—কাসমর্দ্দ, কালস্কন্ধ। ইহা একপ্রকার গুল্ম, ২।৩ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, পাতা প্রায় মনুষ্যচক্ষুর ন্যায়। লম্বা লম্বা বরকটি শিমের ন্যায় ফল হয়, তন্মধ্যে মুগের ন্যায় বীজ থাকে।

ইহার পত্র, বীজ ও মূল নানাবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। হুকার জলে লবণসহ ইহার বীজ বা মূল বাটিয়া লাগাইলে দদ্রু দূর হয়; পত্রের রস গন্ধক সহ লাগাইলে চুলকানী ও পাচড়া সারে। ইহার বীজের চূর্ণ ৩।৪ রতি মধুসহ চাটিয়া খাইলে শ্বাস-কাসে উপকার দর্শে। কোনও প্রাচীন বৈদ্য তাঁহার নিজের শ্বাস কাস রোগের জন্য এই মুষ্টিযোগ আবিষ্কার ও ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছিলেন—যথা কালকাসুন্দে বীজ চূর্ণ, ময়ূর পুচ্ছভস্ম ও হিংভস্ম একত্রে পুরাতন ঘৃতে মাড়িয়া সিদ্ধছোলাপ্রমাণ বড়ী করিতে হইবে। অনুপান ঈষদুষ্ণ জল। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য।

চক্রদত্ত লিখিয়াছেন—কালকাসুন্দে বীজ, মূলার বীজ ও গন্ধক সমভাগে জলসহ বাটিয়া লেপদিলে ছুলি ও ধবল আরোগ্য হয়।

কালমেঘ।

ছোট ছোট গুল্মবিশেষ, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, পাতা কতকটা লঙ্কার পাতার মত কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু; এই গাছের ডাল পাতা মূল সমস্তই অত্যন্ত তীব্র তিক্তাস্বাদযুক্ত।

হিন্দুস্থানীরা ইহাকে কল্পনাথ বলে। সংস্কৃতে ইহার নাম মহাতিক্ত ও যবতিক্ত। চরকাদি পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। ভৈষজ্য-রত্নাবলিতে ইহার প্রয়োগ আছে।

কালমেঘ পিত্তনাশক, পাণ্ডু, প্লীহা ও যকৃদের উপকারী; জীর্ণজ্বরনাশক অগ্নিকর ও বলকর। রক্তামাশয় রোগেও উপকার করে। আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা উক্ত রোগগুলিতে কালমেঘের উপকারিতা দেখিয়া ইহার আরক বাহির করিয়া ব্যবহার করিতেছেন।

শিশুদের যকৃদ্‌রোগে কালমেঘের শক্তি অন্যান্য তিক্ত উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গীয় প্রাচীন গৃহিণীরা কালমেঘের গুণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই তাঁহারা সদ্যোজাত বা অল্পবয়স্ক শিশুদিগকে কালমেঘ ঘটিত একপ্রকার বটী খাওয়াইয়া থাকেন। এই বটীকে আলুই বা আলোই বলে। ইহাতে কালমেঘের পাতা ছাড়া যোয়ান্ লবঙ্গ জীরা বড় এলাচ ও দারুচিনি থাকে। বড়ী মটর প্রমাণ করিতে হয়। এই বড়ী শিশুদিগকে ভাল অবস্থায় মধ্যে মধ্যে খাওয়াইলে তাহাদিগের জ্বর আমাশয় কাস সর্দ্দি বমী ও জ্বর হইতে পারে না। অথবা ঐ সব রোগে সেবন করাইলেও তাহা দূরীভূত হয়। আজকাল যে এত যকৃৎ-দোষ শিশুদের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাহার অন্যতম কারণ নবীন গৃহ-বধূদিগের এই আলুই সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

ভৈষজ্যরত্নধৃত গুড়ূচ্যাদি চূর্ণের উপকরণে কালমেঘ আছে—

গুড়ূচ্যতিবিষা শুণ্ঠী ভূনিম্বো যবতিক্তকম্।
মুস্তং কণা যবক্ষারঃ কাসীসং ভ্রমরাতিথিঃ
যকৃৎ প্লীহ পাণ্ডুরোগ মগ্নিমান্দ্য মরোচকং।
জ্বর মষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা॥

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ, চিরতা, কালমেঘ, মুথা, পিপ্পলী, যবক্ষার, হীরাকস, ও চাঁপার ছাল, সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রয়িতব্য। মাত্রা ১—২ মাষা। ইহাতে যকৃৎ প্লীহা পাণ্ডুরোগ, অগ্নিমান্দ্য অরুচি, ও অষ্টবিধ জ্বর দূরীভূত হয়।

কাবাবচিনি।

এই জিনিস্টী চরকাদি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। জাবা ও মলকাদ্বীপে জন্মে। ইহা প্রথমে ইউনানী চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন। এক্ষণে ইহা এত বহুলরূপে কবিরাজসম্প্রদায় মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে যে ইহা এস্থলে, বিলক্ষণ উল্লেখ-যোগ্য। আধুনিক দ্রব্যগুণ গ্রন্থে ইহার—"সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং" এই দুটী সংস্কৃত নাম কল্পিত হইয়াছে, ইতঃ পর এই নামই ভবিষ্যতে নব-রচিত চিকিৎসাগ্রন্থে প্রচলিত হইবে।

বাঙ্গালা নাম—কাবাবচিনি, হিন্দী-শীতলচিনি বা শীতল মিরিচ; ইংরাজী—Cubeba.

সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং তদ্বায়ুশমনং মতম্।
শ্লেষ্মোৎসারণ মাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা।
ঔপসর্গিক মেহঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্।
শ্বেত প্রদর মর্শাংসিকৃচ্ছ্রঞ্চাপি বিনাশয়েৎ॥ সংগ্রহ।

ইহা বায়ুপ্রশমক, কফনিঃসারক, আগ্নেয়, মূত্রবৃদ্ধিকর। বিষাক্তমেহ শুক্রমেহ শ্বেতপ্রদর অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশক। মাত্রা ৴০ আনা হইতে ।৴০ আনা।

প্রয়োগ—ইহা ইংরাজীমতে একটী "মৃদু-উত্তেজক বস্তু", ঐই উত্তেজন ক্রিয়া প্রধানতঃ মূত্রযন্ত্রে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য ইহা সেবনে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয়। ইহার এই প্রভাব থাকায় নূতন বিষাক্ত মেহে ইহার প্রভূত ক্ষমতা।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা এতদ্রোগ প্রশমন সম্বন্ধে ইহার প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন করেন। তাঁহারা ইহার চূর্ণ অপেক্ষা ইহা হইতে নিঃসারিত তৈলই অধিক প্রয়োগ করেন। কখন কখন তাঁহারা অধিকতর ফলাশায় ইহার সহিত চন্দন তৈল মিশাইয়া থাকেন। কবিরাজগণ কাবাবচিনির সহিত

বেণামূল, গোক্ষুরবীজ, বাবলাছাল্ প্রভৃতি সংযোগ করিয়া পাচনরূপে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

কাবাবচিনির গুঁড়া মেহাধিকারোক্ত বঙ্গেশ্বরের একটী প্রধান অনুপান। কাবাবচিনির গুঁড়ার সহিত কাঁচা হলুদের রস সংযুক্ত হইলে উক্তমেহে অধিকাংশস্থলে অতীব আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয় মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হইলেও ইহার প্রয়োগে উপকার দর্শে।

কাবাবচিনি স্বপ্নদোষের একটী মহৌষধ। ৵৹ আনা মাত্রায় রাত্রে শয়নকালে কর্পূরের জলসহ সেবন করিলে স্বপ্নদোষ দূরীভূত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; উহাতে কিঞ্চিৎ চূণের জল সংযুক্ত হইলে আরো ভাল হয়। কাবাবচিনি শুষ্ককাসরোগে উপকারী। মিশ্রীসংযোগে মুখে রাখিলে উৎকাসি নিবারিত হয়, কখন কখন ইহাদ্বারা হাঁপানিও উপশমিত হয়।

কাবাবচিনি পানের মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়াথাকে, কিন্তু অধিক দিলে বিস্বাদ হইয়া যায়।

কামিনী।

ইহা এক প্রকার ফুলের গাছ; অবশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন। ফুল গুলি অতীব সুগন্ধ, ছোট ও শাদা, হাত দিলে ঝরিয়া পড়ে। পাতাগুলি ছোট ছোট, ঈষৎ লম্বা। গাছ মানুষের দেড় দুইগুণ উচ্চ হয়, চারিদিকে ইহার ডাল গুলি বিস্তৃত হইয়া ঝোপ্ হইয়া উঠে। উদ্যানের, বিশেষতঃ, প্রবেশ পথের শোভার জন্য ইহার বড় আদর। ইহার উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয় না। তথাপি বহুকাল প্রচলিত লৌকিক ব্যবহার দ্বারা ইহার যে গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এস্থলে উল্লেখ্য।

এই গাছ জাতী-যূথী ফুলের গাছের সমগুণ। ইহার পত্র কটুতিক্তরস, ও ক্ষতঘ্ন। জাতী পত্রের ন্যায় ইহারও পত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথের সহিত মুখ ধুইলে মুখের ঘা ভাল হয়। অনেক সময়ে জাতী পত্রের অপেক্ষাও কামিনী পাতার এবিষয়ে অধিক গুণ দৃষ্ট হয়। স্ত্রীবা পুরুষের গণোরিয়া রোগে মূত্র নালীর মধ্যে প্রদাহ হইলে কাথের পিচকারী উপকারী।

পাতার কাথে অল্প ফট্‌কারী মিশাইয়া পিচকারী করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কামিনীফুল ঘৃত সৈন্ধব সংযোগে ভাজিয়া খাইলে কাসরোগীর উপকার হয়।

কামিনীর ডাল কুঁদিয়া উত্তম মালা প্রস্তুত হয়। তাহা ঔষধ সম্প্রদায় মধ্যে ব্যবহৃত হয়, ইহার ডালের অতি উৎকৃষ্ট লাঠী প্রস্তুত হয় তাহা হাতে করিয়া বেড়াইলে নাকি সাপের ভয় থাকে না।

কালাদানা।

ইহা এক প্রকার ছোট বৃক্ষের বীজ, ইংরাজীতে "ফার্বাইটিস্ নীল" বলে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে জন্মে। বীজগুলি কোণযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্র। গুঁড়া করিলে ধূসরবর্ণ হয়। মুখে দিলে কটু ও ঈষৎ মিষ্ট আস্বাদ। অনেকক্ষণ মুখে রাখিলে মুখমধ্যে চিন্ চিন্ করে। ইহার চূর্ণ জলে গুলিলে একটু আঠা আঠা হয়; সুতরাং উত্তমরূপে জলে গুলিয়া না দিলে বমি হইয়া যাইতে পারে। কালাদানাচূর্ণ প্রবল-রেচক, যোগ্যমাত্রায় সেবন করিলে দাস্ত হইতেই হইবে। এবং বিরেচন ক্রিয়া ১।২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশ হয়। ইহা সোণামুখী অপেক্ষা একটু উষ্ণবীর্য্য। সুতরাং মিশ্রী মউরী প্রভৃতি বায়ুনাশক উপকরণের সহিত দেওয়া উচিত। কালাদানার মাত্রা ৵০ আনা হইতে।০ আনা পর্য্যন্ত। ইহা বণিকের দোকানে সুলভমূল্যে বিক্রীত হয়। হাকিমেরা এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। যদিও আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ নাই, তথাপি ইহার গুণ দেখিয়া কবিরাজের ইহা ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা সকল্পিত বিরেচক চূর্ণ বা বটীতে এবং সালসার উপকরণ মধ্যে ইহা দিয়া থাকেন।

কাশ, কুশ।

বাঙ্গালায় প্রথমটীকে কেশে বলে, ইহা এক প্রকার ঘাস জাতীয় লম্বা গাছ, ইহাতে পাড়া গাঁয়ে ঘর ছাওয়া হইয়া থাকে। কুশ অনেকেই দেখিয়াছেন, শ্রাদ্ধাদিতে কুশ পূজোপকরণ মধ্যে আবশ্যক হয়। শুষ্কাবস্থায় অবশ্য

সকলেই ইহা দেখিয়াছেন—যেহেতু ইহা দ্বারাই কুশাসন প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। কুশ ও কাশ প্রায় এক জাতীয়, কিন্তু কুশের পাতা অপেক্ষাকৃত একটু সরু। উভয়েরই পাতায় অত্যন্ত ধার আছে।

কাসের সংস্কৃত নাম—কাশঃ কাশেক্ষুঃরুদ্দিষ্ট সন্তাদ্ ইক্ষুরস স্তথা ইক্ষ্বালিকেক্ষুগন্ধাচ তথা পোটগলঃ স্মৃতঃ।—

কাশঃ স্যান্ মধুর স্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্র ক্ষয়পিত্তজ রোগজিৎ॥

কাশ মধুর তিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, সারক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তস্রাব ক্ষয় ও পিত্তজরোগ নাশক।

কুশের সংস্কৃত নাম—কুশো দর্ভস্তথা বর্হি সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।

কুশস্তু স্যাৎ ত্রিদোষঘ্নঃ মধুরঃ তুবরো হিমঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী তৃষ্ণা বস্তিরুক্ প্রদারাস্র জিৎ।

কুশ মধুর কষায়, হিম, ত্রিদোষঘ্ন, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরুক্ (তলপেটব্যথা) প্রদর ও রক্তপিত্ত নাশক।

প্রয়োগ—উভয়েরই প্রধান শক্তি মূত্রনিঃসারণ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ। প্রস্রাবের সহিত রক্ত বাহির হইতে থাকিলে কুশ ও কাশ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের যদি এই দুর্ঘটনা হয়, তবে তাহাও ইহা দ্বারা নিবারণ হইয়া থাকে। কুশ ও কাশের মধ্যে পিত্তনাশক শক্তি ও মূত্রকারক শক্তি একত্র থাকায় ইহাঁদের দ্বারা প্রস্রাবকালীন জ্বালা দূরীভূত হয়।

ইহাদের শক্তি মূত্রযন্ত্রের উপরে সমধিক, এই যন্ত্রের বিকৃতি জন্য রক্তপ্রস্রাব হইলে তাহা সত্বর নিবারিত হয়, উর্দ্ধগ রক্ত পিত্তাদিতে ইহার কোনও শক্তি দৃষ্ট হয় না। কুশ ও কাশ তৃণ পঞ্চমূলের দুইটী প্রধান উপকরণ। তৃণ পঞ্চমূল যথা—কাশ, কুশ, শর, উলু, কৃষ্ণ-ইক্ষুমূল। এই তৃণপঞ্চমূল নূতন বিষাক্ত মেহে বা অন্যবিধ মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। যন্ত্রণার সহিত অল্প অল্প প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ইহার প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। শাস্ত্রোক্ত কুশাবলেহ, কুশাদ্য ঘৃতে, তৃণপঞ্চমূলাদ্যঘৃত ও কুশাদ্য তৈলে কুশ-কাশ আবশ্যক হয়।

২য় বর্ষ, ১ম ও ১২শ সংখ্যা। ১৯০০, এপ্রেল, মে। ১৩০৭, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ

মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲

ঋষি

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

---

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যামন্দির

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়,—[illegible]পের সৃষ্টি ও রোগ, দময়ন্তী, চরকীয় নীতি, স্থূল ও [illegible], দ্রব্যগুণ বি[illegible] [illegible]র্গা-স্তোত্রম, দুর্জন-নিন্দা।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। } { ১৩০৭, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

পাপের সৃষ্টি ও রোগ।

"আদিকালে হ্যদিতিসুতসমোজসোঽতিবিমলবিপুলপ্রভাবাঃ প্রত্যক্ষ দেব-দেবর্ষি ধর্ম্মযজ্ঞবিধিবিধানাঃ শৈলেন্দ্রসারসংহতস্থিরশরীরাঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়াঃ পবন সমবলজব পরাক্রমা শ্চারুস্ফি চো হ ভিরূপপ্রমাণাকৃতি প্রসাদো-পচয়বন্তঃ সত্যার্জ্জবানৃশংস্যদানদম নিয়ম তপ উপবাস ব্রহ্মচর্য্যব্রত পর ব্যপ-গত ভয়রাগ দ্বেষমোহ লোভক্রোধ-শোকমান রোগ নিদ্রাতন্দ্রা শ্রম ক্লমালস্য পরিগ্রহাশ্চ পুরুষা বভূবু রমিতায়ুষঃ।"

যখন এই পৃথিবী স্রষ্টার হস্ত হইতে অচির-নিঃসৃত ও অল্পসংখ্যকমাত্র জীবসমূহের বাসভূমি ছিল—যখন ইহার বয়ঃক্রম সম্পূর্ণই নবীন ও পরিমেয় ছিল, তৎসময়ের মনুষ্যগণের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগকে আর মানব-নাম-যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। যেমন হস্তীর নিকটে ছুছুন্দর, ময়ূরের সান্নিধ্যে মশক, অশ্বত্থের সমীপে দূর্ব্বা-গুচ্ছ এবং জ্যোতিষ্মতী দেবতার সন্নিধানে পিশাচ-পুত্তলী, সেই আদিকালীন মনুষ্যবর্গের তুলনায় আমরাও যে অতীব হেয় ও জঘন্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুরাকালে অসুরের ন্যায় তেজঃশালী বিমল-বিপুল-প্রভাব-সম্পন্ন, প্রত্যক্ষ-দেব দেবর্ষিতুল্য, ধর্ম্মকর্ম্ম ও যজ্ঞবিধির অনুষ্ঠায়ক, পর্ব্বতের ন্যায় সংহত সারবান্ ও সুদৃঢ়-কায়-বিশিষ্ট, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও চক্ষুঃ কর্ণাদির মাধুর্য্য এবং প্রসন্নতাময়, প্রভঞ্জনতুল্য-বল বেগ-পরাক্রমী, মনোজ্ঞ নিতম্ব, যথোপযুক্ত-প্রমাণা-কৃতি সৌষ্ঠব, ও ঔন্নত্য-সমন্বিত, সত্য সরলতা অনৈষ্ঠুর্য্য, দান দম নিয়ম তপস্যা উপবাস ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরায়ণ, ভয় রাগ দ্বেষ মোহ লোভ ক্রোধ

শোক আত্মাভিমান, রোগ, নিদ্রালুতা, তন্দ্রা, শ্রম-ক্লান্তি, আলস্য ও পরদ্রব্য-স্পৃহা বিবর্জ্জিত পুরুষগণ ছিলেন, এবং তাঁহাদের আয়ুঃও অপরিমিত ছিল।

"তেষা মুদার সত্ত্ব গুণ-কর্ম্মণা মচিন্ত্যরসবীর্য্যবিপাক প্রভাব গুণ সমুদিতানি প্রাদুর্বভূবুঃ শস্যানি, সর্ব্বগুণ সমুদিতত্বাৎ পৃথিব্যাদীনাং কৃতযুগস্যাদৌ। ভ্রশ্যতি চ কৃতযুগে কেষাঞ্চি দত্যাদানাৎ সাম্পন্নিকানাং শরীর গৌরব-মাসীৎ। সত্ত্বানাং গৌরবাৎ শ্রমঃ শ্রমাদালস্যম্ আলস্যাৎ সঞ্চয়ঃ। সঞ্চয়াৎ পরিগ্রহঃ পরিগ্রহাল্লোভঃ প্রাদুর্ভূতঃ।"

সত্যযুগের আদিতে পৃথিবী সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিল বলিয়া, সেই উদারচেতা সদ্গুণাধার অনিন্দ্যকর্ম্মা পুরুষগণের সমক্ষে চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যবীর্য্যময় অচিন্ত্য-বিপাক-প্রভাব-গুণশালী অজস্র শস্য সমুদায় উৎপন্ন হইত।

তৎপরে সত্যযুগের ক্রমিক অপগমে যখন ঐ সমস্ত পৃথিবীগুণ ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন কোনও কোনও ব্যক্তি অতিরিক্ত গ্রহণ করায় ও তজ্জন্য সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অবস্থায় উপনীত হওয়ায়, ক্রমে তাহাদের দেহের গুরুত্ব আসিয়া পড়িল, তখন শরীরের গুরুতা-হেতু শ্রান্তি বোধ, শ্রান্তি হইতে আলস্য (শ্রমবৈমুখ্য) আলস্য হইতে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়েচ্ছা ও সঞ্চয় হইতে পরিগ্রহ (যথাপ্রাপ্ত যথাদৃষ্ট বস্তুর গ্রহণোদ্যম) এবং পরিগ্রহ হইতে তাহাদিগের মনে লোভের আবির্ভাব হইতে লাগিল। তদনন্তর সত্যযুগ অপসৃত হইলে, ত্রেতার সমাগমে লোভ হইতে প্রতিবেশীর দ্রব্যজাত বলাৎকারে দ্বারা গ্রহণের প্রবৃত্তি উন্মেষিত ও পরস্ব-সম্বন্ধে "এ দ্রব্য আমার" ইত্যাদিরূপ মিথ্যা ভাষণ আরব্ধ হইল। মিথ্যাকথন অভ্যস্ত হওয়ায় কাম জাগিয়া উঠিল, কামের ব্যাঘাতে ক্রোধ ও আত্মাভিমান, তৎপরে দ্বেষ, দ্বেষের উদ্রেকে হৃদয়ের কোমলতা দূরে গিয়া তৎস্থানে নৈষ্ঠুর্য্য ও পারুষ্যের অধিষ্ঠান সুতরাং বিরোধিপক্ষের প্রহারাদি নির্যাতনের ইচ্ছা উপনীত হইল। প্রহারাদির বিভীষিকার সহিত ভয়, পরিতাপ, শোক, চিত্তোদ্বেগ প্রভৃতি আসিয়া জুটিল।

"ততস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদোহন্তর্ধান মগমৎ। তস্যান্তর্ধানাৎ পৃথিব্যাদীনাং গুণপাদ-প্রণাশো হভূৎ। তৎপ্রণাশকৃতশ্চ শস্যানাং স্নেহবৈমল্য রসবীর্য্য বিপাক প্রভাব গুণপাদ ভ্রংশঃ।"

এইরূপে, সত্যযুগ-সুলভ সেই পূর্ণাঙ্গ চতুষ্পাদধর্ম্মের এক পাদ অর্থাৎ

চতুর্থাংশ ত্রেতাযুগে অন্তর্হিত হইল। ধর্ম্মের একপাদ বিলুপ্ত হইলে পর পৃথিবী-জল-বায়ু প্রভৃতির স্ব স্বগুণের একপাদ বিনষ্ট হইল। পৃথিব্যাদির স্বাভাবিকী শক্তির একপাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় শস্যসমূহের স্নেহ (পোষক শক্তি) নির্ম্মলতা, মধুরতা, বীর্য্যবত্তা, বিপাক, প্রভাব ও রোগনাশকত্বাদি গুণের একপাদ তিরোভূত হইল।

"তত স্তানি প্রজাশরীরানি হীন গুণপাদৈ হীয়মান গুণৈ শ্চাহার বিহারৈঃ যথাপূর্ব্বম্ উপষ্টভ্যমানানি অগ্নিমারুত পরীতানি প্রাগ্ ব্যাধিভি র্জ্বরাদিভি রাক্রান্তানি, অতঃ প্রাণিনো হ্রাস মবাপুরায়ুষঃ ক্রমশ ইতি।"

তদনন্তর সেই গুণপাদহীন ও ক্ষীয়মান শক্তি আহারবিহারের দ্বারা যথা-ক্রমে পোষিত হওয়ায় মানব গণের শরীর অগ্নিবায়ু-বহুল হইয়া প্রারম্ভে জ্বরাদি রোগ গ্রস্ত হইল। অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের যে দেহ কাম ক্রোধাদির দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উত্তেজিত ও তাপান্বিত ছিল, সেই দেহে স্নেহ-বীর্য্য-মাধুর্য্যহীন শস্যাদি ঘটিত অপকৃষ্ট অন্ন প্রবেশ পূর্ব্বক দৈহিক অগ্নি-বায়ু-ধর্ম্মকে (বাত-পিত্তকে) বর্দ্ধিত করিল—

অতএব মানবদেহ সর্ব্বপ্রথম উত্তাপাত্মক জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত হইল। সেই কারণে-দেহে জ্বর হইতে শাখা-প্রশাখাক্রমে অন্যান্য রোগের আবির্ভাব, তদ্ধেতু পুরুষগণের আয়ু ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এইরূপে সত্যযুগের ধর্ম্মরাজত্ব, নীরোগতা ও দীর্ঘজীবিত্ব ক্রমে প্রত্যেক পরবর্ত্তীযুগে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় বর্ত্তমান কলিযুগে আমরা মানবগণের এই লোমহর্ষণ পাপ-প্রবৃত্তি, রোগ বাহুল্য ও অল্পায়ুত্ব দেখিতে পাইতেছি।

দময়ন্তী।

ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া সতীদিগের মধ্যে দময়ন্তীর স্থান অতি উচ্চে। আজ তাঁহার পবিত্র চরিত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পুরাতন বিষয় বলিয়া, ভরসা করি পাঠিকাগণ বিরক্ত হইবেন না।

প্রসিদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রকার ভগবান মনু সাধ্বী নারীর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,—

"পতিং যা নাভিচরতি মনোবাক্ দেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতিচোচ্যতে॥

যে রমণী কায় মন বাক্যেও ব্যভিচারিণী না হয়েন্ তিনি পতি-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং সাধুগণ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

পতিব্রতার লক্ষণ।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা নারী সাচ জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"

যে নারী স্বামী দুঃখিত হইলে দুঃখিতা, সুখে হৃষ্টা, পতি দেশান্তর গমন করিলে মলিনা ও কৃশা হন এবং পতির মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুগমন করেন তাঁহাকে পতিব্রতা কহে।

সাধ্বী নারী দেশের গৌরব, সমাজের ভূষণ, প্রত্যেক নর নারীর উপাস্য দেবতা। দেবতার পূজা যেমন কখনও পুরাতন হয়না তদ্রূপ সতীর চরিত্রালোচনাও কখনও পুরাতন হয়না। সেই বিশ্বাস ও ভরসায় সেই অতি প্রাচীন পবিত্র দময়ন্তীর আখ্যান পাঠিকা ভগিনীদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম।

দময়ন্তী অতি প্রবল পরাক্রান্ত সমৃদ্ধ বিদর্ভপতি মহারাজ ভীমের এক মাত্র দুহিতা। সাধারণতঃ রাজকন্যা মাত্রেই যেরূপ আদরের সোহাগের হয়, দময়ন্তী তদপেক্ষা অধিক স্নেহ যত্নের ধন ছিলেন। রাজা ভীম বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও নিঃসন্তান ছিলেন, পরে দমন নামে এক পরম তেজস্বী ব্রহ্মর্ষীর আরাধনা করিয়া দময়ন্তী নাম্নি কন্যারত্ন ও দম, দান্ত, দমন নামে তিনটি পুত্র লাভ করেন। দময়ন্তী যেরূপ সাধের ও আদরের মেয়ে ছিলেন, রূপে গুণেও সেইরূপ অতুলনীয়া ছিলেন। "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা দময়ন্তীর প্রতিই সুপ্রযুক্ত হইবার যোগ্য। ফলতঃ তাঁহার রূপ গুণ ও সৌভাগ্যের খ্যাতি তৎকালে সমগ্র ধরণী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় নিষধ দেশে বীরসেন রাজতনয় মহারাজ নল রাজ্য করিতেছিলেন। তিনি রূপে গুণে ও শূরত্বে তৎকালিক নৃপতিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। অধিক কি দেবতাদিগের মধ্যে শচীনাথ ইন্দ্র যেরূপ, মর্ত্তে রাজাদিগের মধ্যে নল সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রাজা নল ও রাজকন্যা দময়ন্তী উভয়ে উভয়ের যোগ্য ছিলেন।

কালে তাঁহাদের উভয়ের রূপ গুণাদির বিবরণ উভয়ে অবগত হইয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

একদা মহারাজ নল তাঁহার অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় এক সুবর্ণপক্ষ হংস অন্তরীক্ষ হইতে তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইল। হংসের সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত অসাধারণ রূপ দেখিয়া নল তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। হংস প্রাণভয়ে নৃপতিকে বলিল, "মহারাজ আমাকে মারিবেন না, আমি দময়ন্তীর নিকট আপনার বিষয় এরূপ ভাবে বলিব যে, তিনি আপনাকে ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবেননা।" এরূপ কথায় কাহার না মন গলিয়া যায়? মহারাজ হংসকে ছাড়িয়া দিলেন। হংস কৃতঘ্ন নহে, সে সদল বলে দময়ন্তীর নিকটে গিয়া যে উপবনে তিনি সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন সেই খানে গিয়া পড়িল। কন্যাগণ হিরণ্ময় পক্ষযুক্ত চিত্তোন্মাদক হংস সকল দেখিয়া ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, এক একজন এক একটি হংসের পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন। দময়ন্তী যে হংসের পশ্চাদ্ধাবিতা হইয়াছিলেন; সে তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল "নিষধ দেশে নল নামে এক অতি অপরূপ রূপগুণ সম্পন্ন রাজপুত্র আছেন, অধিক কি তাঁহাকে মূর্ত্তিমান কন্দর্প বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তুমি নিজে যেমন রূপ গুণবতী রমণীরত্ন রাজা নলও সেইরূপ রাজকুলরত্ন। তোমাদের উভয়ের সংযোগই আমাদের প্রার্থনীয়।" দময়ন্তী হংসের এইকথা শুনিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং মহারাজ নলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দ্বিগুণতর উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল।

এদিকে কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া রাজা ভীম দময়ন্তীর সয়ম্বর সভা আহ্বান করিলেন। নানা বিদেশীয় নরপতি বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া বিদর্ভে আগমন করিলেন। নিষধাধিপতি নলও আগমন করিলেন।

দময়ন্তীর রূপে গুণে মোহিত হইয়া, ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ চারি দিক-পালও তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া বিদর্ভে আগমন করিলেন। স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যন্ত যাঁহার রূপে মুগ্ধ, গুণে আকৃষ্ট তিনি কিরূপ অলোক সামান্যা রূপ গুণবতী ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

আবার অলৌকিকত্ব। এইবার নলের পরীক্ষা। মানুষ বাহুবলশালী

হইলেও তাঁহাকে বীর বলেনা,সে পশুবল মাত্র। ইন্দ্রিয় ও কামনা জয়ই বলের বাস্তবিক নিদর্শন, তাহাই প্রকৃত বীরত্ব। নলের সেই পরীক্ষা হইল। ইন্দ্রাদি দিকপালগণ দময়ন্তীর চিত্ত পরীক্ষার্থ তৎসমীপে দূত প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু যায় কে? অদ্বিতীয় রূপবান নলকেই তাঁহারা দৌত্যপদে বরণ করিলেন। নল ভাবিলেন "ইহা মন্দ কথা নহে, নিজে বিবাহ করিতে আসিয়া অন্যের জন্য ঘটকালি করিতে হইল, তিনি বলিলেন,—

যে কার্য্যে, অমরগণ! কৈলে আগমন।
সেই কার্য্যে চলি আমি লোক পালগণ!
দূতরূপে প্রেরণ করিতে এইজনে।
উচিত না হয় দেব ভাবি দেখ মনে।
ত্রিভুবনে এ হেন পুরুষ কোন্‌জন।
কামিনীর প্রতি কার, সঙ্কল্পিত মন॥
অন্য তরে হেন বাক্য বলিবারে পারে?
প্রভুগণ! ইথে ক্ষমা করহ আমারে।

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৺ রাজকৃষ্ণরায়ের অনুবাদ)

কিন্তু দেবতারা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলিলেন "তোমা ব্যতীত একার্য্য সমাধা করিতে পারে এমন কেহই নাই তোমাকেই যাইতে হইবে।" নল অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। দেবতাদের কৃপায় মানুষের অমানুষিক শক্তি লাভ হয় নলও দৈবানুগ্রহে লোক চক্ষুর অগোচরে রাজান্তঃপুরে দময়ন্তীর সকাশে উপস্থিত হইলেন। দময়ন্তী পূর্ব্বে নলের রূপ গুণের কাহিনী অবগত ছিলেন মাত্র কখনও দেখেন নাই। এখন সম্মুখে সেই শ্রুত পূর্ব্ব অমানুষ রূপ গুণ বীর্য্য সম্পন্ন নল, দময়ন্তী সেই দেবোপম মূর্ত্তি দর্শনে কেমন এক প্রকার হইয়া পড়িলেন। নল আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক যখন তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন দময়ন্তী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সেকি! আমি যে পূর্ব্বেই আপনাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। এখন আমাকে একি কথা বলেন? আমি আপনাকেই জানি দেবতাগণ আমার মাথায় থাকুন।" তখন নৈষধরাজ বলিলেন,—

লোক পাল গণ চাহে তোমারে শোভনে !
মানুষে বাসনা তব কেন চন্দ্রাননে !
যেই লোক পাল গণ ঈশ্বর মহান্ !
আমরা যাঁদের পদ রেণুর সমান।
প্রবৃত্ত হউক সেই দেবগণে মন।
দেবের অপ্রিয় করি নরের মরণ।
ত্রাণ কর তন্বঙ্গি ! বরহ সুর গণে।
কেনবা দেবের ক্রোধে পড়িবে শোভনে ?
দেবে লভি বিমল বসন মনোহর।
দিব্য চিত্র মালা, দিব্য ভূষণ নিকর।
উপভোগ কর যথা সুখে সর্ব্বক্ষণ।
মানুষী হইয়া স্বর্গে কর বিচরণ।
যেই এই অখিল অবনী সৃষ্টি করে।
গ্রাস করি পুনশ্চ যে সকল সংহরে।
দেবের ঈশ্বর সেই দেবহুতাশনে !
কোন্ নারী পতিরূপে না বরে ভুবনে ?
যাঁর দণ্ড ভয়ে শুভে, সর্ব্ব প্রাণীগণ।
ধর্ম্ম অভিমুখে সতি ! করয়ে গমন।
এ হেন কামিনী কেবা আছয়ে ভুবনে।
সেই ধর্ম্মরাজে পতি না বরে শমনে ?
সর্ব্ব দেবেশ্বর যেই মহেন্দ্র মহান্।
ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা যেই ত্রৈলোক্য প্রধান।
দিতিজ দানব বিমর্দ্দন সে বাসবে।
কে হেন রমণী পতি না বরে এ ভবে ?
যে জীবন বিনা জীব না বাঁচে কখন।
সেই জল পতি স্থিতি লয়ের কারণ।
শুনিয়া সুহৃদ বাক্য যদি কর মনে।
নিঃশঙ্ক মানসে তবে বরহ বরুণে।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ)

নল চূড়ান্ত ঘটকালি করিলেন। কিন্তু দময়ন্তীর হৃদয় টলিল না। এই স্থান হইতেই আমরা দময়ন্তীর পবিত্র চরিত্রের বিকাশ দেখিতে পাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

চরকীয় নীতি।

আত্মহিতং চিকীর্ষতা সর্ব্বেণ সর্ব্বং সর্ব্বদা স্মৃতিমাস্থায় সদ্বৃত্ত মনুতিষ্ঠেৎ—যিনি আত্মহিত প্রার্থনা করেন, এরূপ ব্যক্তিমাত্রই যেন নিজ স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত না হইয়া সর্ব্বদা সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করেন। বস্তুতঃ, আমি কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব? কে কার? কাহার জন্য কি করিতেছি? কতদিন আমি এ পৃথিবীতে থাকিব? আমার সদসৎ কার্য্যের পরিণাম কি? ইত্যাদি-রূপ বিতর্ক যাঁহার স্মৃতিতে প্রত্যেক কার্য্যকালে যথার্থরূপে উদিত হয় তিনি অহর্নিশ কুক্রিয়ার পরিহার ও সদাচারের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতে পারেন।

তদ্ধ্যনুষ্ঠানং যুগপৎ সম্পাদয়ত্যর্থ-দ্বয়ম্ আরোগ্যম্ ইন্দ্রিয়-বিজয়ঞ্চ। পূর্ব্বোক্তপ্রকার কার্য্য-নিয়ম কোনও মহানুভাবের থাকিলে, যুগপৎ তাঁহার দুটী অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়—আরোগ্য ও ইন্দ্রিয়-বিজয়।

অতিথীনাং পূজকঃ বিনয়বুদ্ধি বিদ্যাভিজন বয়োবৃদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যাণা মুপাসিতা স্যাৎ। অভ্যাগত জনের সৎকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে, এবং যিনি বিনয়, বুদ্ধি, বিদ্যা বা বংশগৌরবে তোমা অপেক্ষা উচ্চতর এরূপ ব্যক্তিগণ এবং সিদ্ধ আচার্য্যদিগের নিকট গতায়াত করিবে ও তাঁহাদের প্রসন্নতালাভে যত্নবান্ থাকিবে।

কালে হিতমিত মধুরার্থ বাদী—যখন কোনও স্থানে পাঁচজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছে তখন অকস্মাৎ অযোগ্য বাচালতা না করিয়া ঠিক্ উপযুক্ত অবসরে হিতোদ্দেশ্যমূলক, মধুরভাষান্বিত, অল্প গুটীকৃত সার্থক কথা বলিবে।

স্থূল ও কৃশ।

সম্বন্ধী। কবিরাজ মহাশয় আপনি বড় মোটা! মোটা মানুষ গুলো বড় বিশ্রী! উদরটী যেন রজকের বস্ত্র-পোটুলী। আর প্রতিবাসী মাংস-পিণ্ডের শ্রীবৃদ্ধিতে চক্ষু দুটী যেন লজ্জায় লুক্কায়িত। গ্রীবাঞ্চল নাই বল্লেই হয়,—যেন সেটা কি সূত্রে কেমন করে কীচকহন্তা ভীমের হস্তস্পর্শ পেয়েছিল!

কবিরাজ। মর্কটপ্রবর! বল্‌ছিস্ কি? বিধাতা তোর সৃষ্টির সময়ে তোর হাড়ের কাঠামটী শেষ ক'রে মাংসের থরটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন!—না?

তোমার কোটরে-ঢোকা চক্ষু, সারিন্দে বিনিন্দিত পেট, আর তালপাতার সেপাইএর বাড়া হাত পা গুলি তোমাকে একেবারে কন্দর্প ক'রে তুলেছে। যা হ'ক! তুমি বাপু, মেডিকেল কলেজের দিকে যেন কথনই বেড়াতে যেও না, নইলে পাছে সাহেবরা তোমাকে পলায়মান স্কেলিটন (কঙ্কাল) মনে করে টানাটানি করবে।

স। কবিরাজ মহাশয়! আমি ঠিক প্রাণের কথা বল্‌চি আমার কিন্তু মনে মনে বড় সাধ হয় যে আমি আপনার মত মোটা হই,—অন্ততঃ এ অপেক্ষা একটু মোটাও হই। আমি যে সর্ব্বদাই শাট্-কোট গায়ে দিয়া থাকি, সে শুধু ভদ্রতা বা বাবুগিরির জন্য নয়। আমার আল্‌গা শরীরটা লোকের সম্মুখে বাহির করিতে লজ্জা বোধ হয়। আপনার অর্দ্ধেক শরীর আমার হলেও আমি কত সুখী হতেম!

ক। আরে! পাগলা! আবার অত বাড়াবাড়ির কথা কেন? এইনা উল্‌টো উল্‌টো বলছিলে? যাহা হউক এই কথাটী ঠিক জেনো—এ জগতে যার যেটী নাই সেইটীই তার পক্ষে স্পৃহনীয় হয়। বোধ হয় রেলের বাবুরা মনে করেন, পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারীদের বড় আরামের কাজ। ডাকের চাকুরে মনে ভাবেন রেল-অফিসার বড় সুখী। ছেলে মনে করে বুড়োদের কত সুখ-স্বাধীনতা! বুড়ো ভাবেন ছেলে হ'তে পাল্লে তবে কিছু সুখ হইত। আজ কালকার লোকে পরিবার মধ্যে একটী মেয়ে হলে কত ভয় পায় কিন্তু

এ বড় রহস্য—যে বাড়ীতে শুধুই ছেলে হয় সে বাটীতে কন্যার জন্য বড়ই লালসা দেখা যায়—মা ছোট ছেলেটীর বড় চুল রাখেন, দিব্য নোলক-টিপ চুড়ী পরাইয়া কন্যার সাধ কথঞ্চিৎ তৃপ্ত করেন। যা'ক্ বাহিরের কথা। আমিও তোমার মত মনে মনে বড় দুঃখিত, কিরূপে দেহভার কমিবে সর্ব্বদাই ভাবি।

স। আপনিও কৃশ হইতে চান্?

ক। চাই বইকি? কিন্তু তোমার মত কৃশ হইতে চাই না। সব বিষয়েরই ভাল মন্দ আছে, মোটারও দোষগুণ আছে, কৃশ হওয়ারও দোষগুণ রহিয়াছে। দেখ, মোটা লোকে শীতকালে অনায়াসে আল্‌গা গায়ে পায়খানায় যায়, বেশ হিন্দুয়াণী রক্ষা হয়, আর কৃশব্যক্তি গায়ে সাতপর্দ্দা কাপড় না জড়াইলে ঘর থেকে এক পা বাহির হইতে পারে না। তা সত্য, কিন্তু গ্রীষ্মকালে যে তার শোধ! কাহিলেরা বেশ থাকে; স্থূলকায় ব্যক্তিরা গরমের সময় হাঁসফাঁস্ করিয়া মরে।

ক। কি বিপদ্! তাই ত বল্‌ছিলাম, দুএরই দোষগুণ আছে, আমায় বল্‌তে দাও!

স। আচ্ছা চুপ করে শুন্‌ছি।

ক। মোটা লোকের আকার সম্বন্ধে তুমি যে কুৎসা গাইলে, বাস্তবিক ভেবে দেখ, তা নয়, স্থূলকায় ব্যক্তির আকৃতিতে কেমন সুন্দর এক গুরুগাম্ভীর্য্য থাকে, দেখলেই একটা বড় লোক বোধ হয়, তার কাছে সহসা কেহ চপলতা, অমান্যভাব দেখাইতে পারে না। অকস্মাৎ দর্শকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাই শাস্ত্রে বলে,—

বস্ত্রেণ বপুষা বাচা বিদ্যয়া বিভবেন চ।
এভিঃ পঞ্চবকারৈশ্চ নরঃ প্রাপ্নোতি মান্যতাম্॥

অর্থাৎ ভাল বেশভূষা, সুগঠিত স্থূলবপুঃ, বাক্‌পটুতা, বিদ্যাবত্তা, আর বৈভব এই পঞ্চবকার দ্বারা মনুষ্য মাননীয় হয়।

স। ঠিক্ ঠিক্! সেইজন্যেই আমাদের পাড়ায় কৃষ্ণহরি বাবু (কৃশকায় নেটিব ডাক্তার) বলেন যে "আমার শরীরটা একটু মোটা হলে আমার মাসে হাজার টাকা আয় হইত।

ক। সত্যই দেহাকৃতির একটা মূল্য আছে। কথক, উকীল, মোক্তার

স্কুলমাষ্টার, ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের একটু দর্শনধারী চেহারা থাকিলে বাস্তবিকই হয় ভাল।

এই সমস্ত ব্যবসায়ীদিগের অন্ততঃ অপরিচিত বা নূতন পরিচিত মক্কেলের নিকটে বেশ খাতির-যত্ন হয়।—অনেক গ্রাহক সহসা তাহার নিকট উপনীত হইতে থাকে।

স। একদিন কৃষ্ণহরি বাবু বসিয়াছিলেন, তার পাশে তার সেই মোটা কম্পাউণ্ডারটী দাঁড়িয়ে ছিল, আমি দেখিলাম একটা রোগী এসে ডাক্তার ভেবে আগে কম্পাউণ্ডার মহাশয়কেই প্রণাম করিল।

ক। দেখ্লে?

স। তা'ত দেখলুম্, কিন্তু "মধুরেণ সমাপয়েৎ" রীতিটাই ত সব চেয়ে ভাল, একটী আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে বহিঃস্থৌল্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া যদি শেষে অভ্যন্তরে কৃশ দেখ্তে পায়, তাহ'লে তার সেই চাণক্যের "দূরতঃ শোভতে" নীতিটা কি মনে উঠে না? তার চেয়ে প্রথমে হীনচেহারা দেখিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া পরে পরিচয়ে যদি ভিতরে পুষ্ট দেখিতে পায় তাহ'লে কেমন মজাটী হয়।

আমাদের পাড়ায় বিশ্বনাথ নামে একজন এল্ এম্ এস্ আছেন—তাঁর বড়ই কৃশ শরীর। তাঁর পঠদ্দশায় পাড়ার লোকে সর্ব্বদাই বলিত—বিশুবাবু তোমার যে চেহারা তোমার মোটেই পশার হবে না। তা শুনে বল্তেন—কেন? আমাকে কি রোগীর সঙ্গে "যুদ্ধং দেহি" বল্তে হবে যে রোগা-শরীরে পোষাবে না?

ক। যাক্ যাক্! চেহারার কথা ছেড়ে দাও। মোট কথা "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।" অতিমাত্র কৃশস্থূলের অন্য দোষগুণও আছে; চরক বলিতেছেন—"সততং ব্যাধিতাবেতৌ অতিস্থূলকৃশৌ নরৌ" (সূত্রস্থান) অর্থাৎ অতি স্থূল ও অতিরিক্ত কৃশ ব্যক্তিদিগকে প্রায়ই কোন না কোন রোগে ভুগিতে হয়।

চরকমতে প্রধানতঃ স্থূলদেহীর দোষ এই গুলি—স্থূলব্যক্তি দেহের গুরুত্বহেতু শ্রমসাধ্য কার্য্যে অপটু হয়; তাহার অন্যান্য ধাতু বৃদ্ধি-প্রাপ্ত না হইয়া কেবল মেদোধাতুরই বৃদ্ধি হয় বলিয়া জীবনীশক্তির হ্রাস হয়। দেহের শিথিলতা ও সুকুমারত্ব হেতু কার্য্যাদিতে সমধিক উদ্যোগ

হয় না, শুক্রধাতুর বৃদ্ধি অথচ শুক্রবহা নাড়ী মেদকর্ত্তৃক আবৃত হওয়ায় তাহার পক্ষে স্ত্রীসঙ্গম অনায়াস-সাধ্য হয় না। ধাতুসমূহের সমতা না থাকায় দেহ দুর্ব্বল ও মেদাধিক্যবশতঃ অতীব ঘর্ম্মাকুল হয় এবং শ্লেষ্মদুষ্টি হেতু দৌর্গন্ধ্যযুক্ত হইয়া থাকে। অপিচ, শ্লেষ্মসংসর্গে তাহার কফ, কাস, স্বরভঙ্গ ফোড়া, মূত্ররোগ, এবং শ্লেষ্ম দ্বারা বায়ুবহা নাড়ী সহসা অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহার সন্ন্যাস রোগ (আকস্মিক মূর্চ্ছাবিশেষ) হইবার সম্ভাবনা থাকে।—বিশেষতঃ যে স্থূলব্যক্তিদিগের গ্রীবা অত্যন্ত খর্ব্ব, তাহাদেরই এই সন্ন্যাস রোগের অধিক আশঙ্কা। কোন কোন স্থূলদেহীর "তীক্ষ্ণাগ্নি" নামক রোগ জন্মে—ইহারা আহার করিবামাত্র ভুক্তবস্তু ভস্মসাৎ হওয়ায় পুনরায় অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় নিপীড়িত হয় এবং অসহ্য পিপাসা বেগে দগ্ধ হইতে থাকে।

স্থূলদেহীর গুণ এই—ইহারা গম্ভীর প্রকৃতি ও স্থিরবুদ্ধি হয়, ইহারা কালব্যাপিনী চিন্তা ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করে না, সুতরাং অনুতাপও ইহাদের ভাগ্যে কম ঘটে। স্বজনবিয়োগাদিতে ইহারা শোকক্ষোভে অতি-মাত্র উদ্বেলিত হয় না। প্রায়ই অল্প ভাষী ও দীর্ঘসূত্রী হয়। "মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ" এই চানক্যনীতির সর্ব্বদা অনুসরণ করিতে সক্ষম হয়। ইহাদের ক্রোধাগ্নি আধুনিক দে-সলাইয়ের কাটীতে নিহিত নয়, সেই সেকেলে ঠুনকি পাথরেই অধিষ্ঠিত। দু-চারিদিন উপবাস করিলেও শরীরের অনুভব-যোগ্য কৃশতা বা শীতগ্রীষ্মের পরিবর্ত্তনে ইহাদের হঠাৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না। সংক্ষেপে ইহাদের সর্ব্বতোমুখী সহিষ্ণুতা ও ধীরতা প্রভৃতি গুণ প্রকৃতিগত।

চরকমতে অতি কৃশব্যক্তির দোষ এই গুলি—

ব্যায়াম মতি সৌহিত্যং ক্ষুৎপিপাসা মথৌষধং।
কৃশো ন সহতে তদ্বদ্ অতি শীতোষ্ণমৈথুনং॥
প্লীহ কাসঃ ক্ষয়ঃ শ্বাসো গুল্মার্শাংস্যুদরাণি চ।
কৃশং প্রায়ো ভিধাবন্তি রোগাশ্চ গ্রহণীমতাঃ॥

অতিশয় কৃশ ব্যক্তি ব্যায়াম বা অতিরিক্ত অঙ্গচালনা-সাপেক্ষ কর্ম্ম, অত্যন্ত উদর পুরিয়া ভক্ষণ, ক্ষুৎপিপাসার বেগ, অধিক ঔষধ সেবন, অধিক শীত বা অধিক তাপ এবং নিয়মিতাপেক্ষা অধিক স্ত্রীসংসর্গ সহ্য করিতে পারে না। এবং কৃশব্যক্তিদিগের প্রায়শঃ প্লীহা, কাস, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, গুল্ম,

অর্শ, উদররোগ এবং গ্রহণীজাতীয় রোগ (অর্থাৎ পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন ভেদ বা কৌষ্ঠকাঠিন্ত সংযুক্ত রোগ) সমুদায় হইবার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কৃশব্যক্তির আরো এই সমস্ত দোষ—কৃশব্যক্তিরা প্রায়শঃ চঞ্চল প্রকৃতি, অধীর, মনের কথা গোপন রাখিতে অক্ষম, প্রায়শঃ অবিমৃষ্যকারী, স্বল্পনিদ্রা দুশ্চিন্তা-প্রবণ, অভিপ্রেত বিষয়ে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, আকস্মিক উদ্যম ও সত্বর অনুৎসাহ, কাম-ক্রোধাদির আশু-পরবশ ও সহসা ভীত বা সাহসান্বিত এবং সর্ব্বদাই নূতনত্ব প্রিয় হয়।

কৃশব্যক্তির গুণ—কৃশব্যক্তিরা প্রায়শঃ ক্ষিপ্রকর্ম্মা, অনলস, শ্রমপটু, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, কবিগুণান্বিত, বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যসমুদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক, পরদুঃখকাতর, কৃতাপরাধে অধিক অনুতপ্ত উন্নতিপথান্বেষী ও বাক্‌পটু হয় এবং হঠাৎ কুপিত হইলেও তদ্দণ্ডে ভুলিয়া যায়।

চরক পুনরায় বলিতেছেন—

স্থৌল্যকার্শ্যে বরং কার্শ্যং সমোপকরণৌ হিতৌ।
যদ্যভৌ ব্যাধিরাগচ্ছেৎ স্থূলমেবাতি পীড়য়েৎ॥

স্থূল ভাল, কি কৃশ ভাল এই দুইএর বিচারে বরং কৃশকেই ভাল বলিতে হইবে। যেহেতু উক্ত উভয় প্রকার ব্যক্তিই যদিও—তুল্য উপকরণযুক্ত ও তুল্য অবস্থাধীন হয় এবং একই রোগ যদি দুই জনকেই এক সঙ্গে আক্রমণ করে তাহা হইলে সে স্থলে স্থূলব্যক্তিই অতিরিক্ত উদ্বেজিত হইয়া থাকে।

স। বেশ্‌! আপনি ত বুঝাইয়া দিলেন—অতিরিক্ত দুইই মন্দ; তবে ভাল কে?

ক। তোমার প্রশ্নের উত্তর চরকের এই শ্লোকটীতে পাইবে—

সম মাংস প্রমাণস্তু সমসংহননো নরঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদ ব্যাধীনাং ন বলেনাভূয়তে॥

যাহাদের শরীরে মাংসের পরিমাণ কমও নয় বেশীও নয়, শরীরের অঙ্গে অঙ্গে মাংস পেশী সমুদায় আবশ্যকমত পুষ্ট ও কঠিন, যাহাদের ইন্দ্রিয় সমুদায় দৃঢ় ও কর্ম্মঠ—তাহারাই ভাল যেহেতু রোগগ্রস্থ হইলেও সেই রোগকর্ত্তৃক অধিক অভিভূত হয় না।

স। পৃথিবীতে শত করা দু-চারিজনকে স্থূলকায় দেখতে পাওয়া যায়,

তাহা ছাড়া আর সকলেই কৃশশরীর, তবে ইহারা সকলেই কি দূষণীয়, না কৃশত্বের একটা প্রমাণ আছে?

ক। আছে বৈকি?

শুষ্কস্ফিগুদরঃ গ্রীবো ধমনী জাল সন্ততঃ।
ত্বগস্থিশেষোঽতিকৃশঃ স্থূল পর্ব্বো নরোঃ মতঃ॥ (চরক)

যাঁহাদের নিতম্ব উদর ও গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক বা মাংসহীন, চর্ম্ম পাতলা, অস্থি সরু, হস্তপদাদি শিরাসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত তাহাদিগকে অতিকৃশ বলিয়া জানিবে।

স। মনুষ্য কি কারণে কৃশ হয়?

ক। সেবা রুক্ষান্নপানানাং লঙ্ঘনং প্রমিতাশনং।
ক্রিয়াতিযোগঃ শোকশ্চ বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ॥
রুক্ষস্যোদ্বর্ত্তনং স্নানানভ্যাসঃ প্রকৃতি র্জরা।
বিকারানুশয়ঃ ক্রোধঃ কুর্ব্বন্ত্যতি কৃশং নরম্॥

রুক্ষ অন্নভোজন, রুক্ষপানীয় (মদ্যাদি) পান, ঘন ঘন উপবাস, অত্যল্প ভোজন, অতিরিক্ত পরিমাণে মলমূত্র শুক্রাদির নিঃসারণ, শোক বা দুশ্চিন্তা, হাঁচি মল মূত্র কাম প্রভৃতি স্বাভাবিক বেগকে নির্যাতন করা, বিনাতৈলে গাত্রমর্দ্দন, স্নানের অনভ্যাস, প্রকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক বায়ু বা বায়ুপিত্ত প্রধান ধাতু বশতঃ আজন্ম ক্ষীণতা, জরাজনিত রসরক্তাদি সর্ব্বধাতুর ক্ষয়, রোগ হইয়াছে মনে করিয়া সর্ব্বদা পরিতাপ এবং সর্ব্বদা ক্রোধ-জ্বলিত হওয়া এই সমস্ত কারণে মনুষ্য সাতিশয় কৃশ হয়।

স। কিসে শরীরের অতি স্থূলত্ব জন্মে?

ক। তদতিস্থৌল্যমতি সংপূরণাদ্ গুরু মধুর শীত স্নিগ্ধোপযোগাদ্ অব্যায়ামাদ্ অব্যাবায়াদ্ দিবাস্বপ্নাদ্ হর্ষনিত্যত্বাদ্ অচিন্তনাদ্ বীজ স্বভাবা চ্চোপজায়ন্তে।

স্বভাবতঃ বা অভ্যাস দ্বারা অধিক ভোজন, মাংস পোলাও প্রভৃতি গুরুদ্রব্য, অতিরিক্ত মিষ্টান্ন, দধি মাষকলায় প্রভৃতি শীতল বস্তু, মাখন, ঘৃত, চর্ব্বীযুক্ত মৎস্য মাংসাদি, অঙ্গচালনার অভাব, শক্তিসত্বে স্ত্রীসম্পর্ক পরিত্যাগ, দিবানিদ্রা, সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কালযাপন, চিন্তারাহিত্য অথবা যে বীজে দেহসৃষ্টি তাহারই স্বপ্রকৃতি হেতু অতিশয় স্থূলতা জন্মিয়া থাকে।

স। স্থূলতা নাশের উপায় কিছু আছে কি?

ক। যথেষ্ট।

স। তবে সে সব উপায় দ্বারা আপনার স্থূলতার হ্রাস কেন করেন না?

ক। কৃশ ব্যক্তিকে স্থূল করা অপেক্ষা স্থূল ব্যক্তিকে কৃশ করা কঠিন? যেহেতু কৃশ ব্যক্তির পোষণজন্য ভাল ভাল আহার বিহারের বন্দোবস্ত শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থূল ব্যক্তির পক্ষে কিরূপ?—না, তিনি যতই পোষ্টাই আহারের মাত্রা কমাইবেন ততই তিনি সফলকাম হইবেন, তজ্জন্য দেখ, নিয়মপালনটা স্থূল অপেক্ষা কৃশেরই কিছু সুবিধা জনক। আমি পূর্ব্বে আরও মোটা ছিলাম, সামান্য, উপরিকত নিয়মের অনুসরণ দ্বারা তবুও পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ওজনে কমিয়াছি, নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সুন্দররূপে পালন করিলে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়!—

জলত্যাগ বা অল্পজল পান, রাত্রে অন্নত্যাগ পূর্ব্বক শুষ্করুটী, চিড়া ভাজা বা মুড়ী, আহারান্তে শীতল জলের পরিবর্ত্তে উষ্ণজল পান, ব্যঞ্জনে অন্যান্য ঝালের পরিবর্ত্তে অধিক গোলমরিচ ও শুঁঠচূর্ণ ব্যবহার, মসূর বনমুগ অড়হর বা কুলথ কলায়ের ডাল, নালতে চাল কুমড়ার ছেঁচ্‌কি, ভোজনের পর কোনও শাস্ত্রোক্ত তীক্ষ্ণ অরিষ্ট পান, অল্পনিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গম, অতিরিক্ত চিন্তা বা গণনার কার্য্য, পুরাতন মধুর সহিত জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়া, দুগ্ধ মাংস ঘৃত ত্যাগ করিয়া কেবল খাঁটী সর্ষপ তৈল সংস্কৃত ব্যঞ্জনাদি আহার, সম্পূর্ণ মাখন রহিত তক্র, যবের ছাতু, লৌহভস্ম, বেলছাল শোণাছাল গাম্ভারী ছাল পারুলছাল, এবং গণিয়ারী ছাল এই পাঁচটী একত্রে ।০ ছটাক লইয়া ।১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ।৷০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান, কঠিন শয্যায় শয়ন, ও নিয়মমত প্রতিদিন ২ ঘণ্টা কাল ক্লান্তিজনক ব্যায়াম করা ইত্যাদি।

স। আর, কিসে কৃশতা নিবারণ হইয়া একটু মানুষের মত চেহারা হয়? আমার যেটী আবশ্যক তাঁহা এখনও শুনিতে পাই নাই। শীঘ্র বলুন! শীঘ্র বলুন।!

ক।, স্বপ্নো হর্ষঃ সুখা শয্যা মনসো নির্বৃতঃ শমঃ।
চিন্তা ব্যবায় ব্যায়াম বিরামঃ প্রিয়দর্শনং।

নবান্নানি নবং মদ্যং গ্রাম্যানূপৌদকা রসা।
সংস্কৃতানি চ মাংসানি দধি সর্পিঃ পয়াংসিচ ॥
ইক্ষবঃ শালয়ো মাষা গোধূমা গুড় বৈকৃতম্।
বস্তয়ঃ স্নিগ্ধমধুরা তৈলাভ্যঙ্গশ্চ সর্ব্বদা ॥
স্নিগ্ধ মুদ্বর্ত্তনং স্নানং গন্ধ মাল্যনিষেবনং।
শুক্লোবাসঃ যথাকালং দোষানামবসেচনং ॥
রসায়নানাং বৃষ্যাণাং যোগানাং মুপসেবনং।
হত্বাতিকার্শ্য মাধর্ত্তে নৃণা মুপচয়ং পরং ॥

অর্থাৎ সুনিদ্রা, সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ, সুখপ্রদ শয্যা, "ঈশ্বর যা করেন তাই ভাল" এইরূপ আন্তরিক বিশ্বাস, শমগুণ অর্থাৎ হিংসা ক্রোধাদি ত্যাগ-পূর্ব্বক চিত্তের প্রশান্তিভাব, চিন্তারাহিত্য, শুক্রের অপচয় না করা, পরিশ্রম-রাহিত্য, প্রিয়বস্তুর দর্শন, নবান্ন ভোজন, নূতন মদ্য, কচ্ছপ শূকর মহিষাদির মাংস ভক্ষণ বা বিশিষ্ট প্রক্রিয়া সাধিত অন্য মাংস, দধি, ঘৃত দুগ্ধাহার, ইক্ষু-প্রভৃতি, শালিধান্য মাষকলায় গোধূম গুড়োৎপন্ন মিষ্টান্ন, স্নিগ্ধ মধুর বস্তিগ্রহণ, উত্তম তৈল মাখা, ও স্নিগ্ধ বস্তুর সহিত গা-হাত-পা টিপিয়া লওয়া, নিত্যস্নান, গন্ধমাল্যাদি পরিধান, শুভ্রবেশ পরিধান, যথাকালে সঞ্চিত দোষের পরিহার, রসায়ন ও বৃষ্য ঔষধ সেবন (যথা ছাগলাদ্যঘৃত) এই সমস্ত অভ্যাসদ্বারা মানু-ষের অতিকার্শ্য দূরীভূত হইয়া দেহ স্থৌল্য উপনীত হয়।

স। আর সবত বুঝিলাম কিন্তু আপনি যে ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার দ্বারা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হওয়া যায় বলিলেন কিন্তু অনেকের যে ঐরূপ গুরু আহার সহ্য হয় না, তার কি?

ক। সহ্য না হইলে মন্দাগ্নি রোগ আছে জানিতে হইবে। "প্রকৃত্যা দুর্ব্বলাঃ কেচিৎ কেচিদ্ আময় দুর্ব্বলাঃ" কেহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ থাকে, কেহ রোগজন্য ক্ষীণ।

স্বভাব ক্ষীণেরা "পোষ্টাই" সেবন করিলে অনায়াসে স্থূলকায় হইতে পারে কিন্তু ব্যাধিশীর্ণ ব্যক্তিদিগের মন্দাগ্নি দূরীকরণের পূর্ব্বে কদাপি পুষ্টাঙ্গ হইবার আশা নাই। তুমি দেখিয়া থাকিবে রোগ-কৃশ ব্যক্তিরা পশ্চিমদেশে গিয়া কিছুদিন থাকিবার পর রোগ না সারিলেও একটু মোটা হইয়া আসে!

তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, রোগী এখানে যা খায়, তাহা পরিপাক পায় না, গায়েও লাগে না—আর স্থানগুণে সেখানে ভুক্তবস্তু সমস্ত জীর্ণ হইয়া শরীরের পোষণক্রিয়া সাধন করে। অগ্নিই শরীরের ক্ষয়বৃদ্ধির মূল কারণ।

স। আপনি যে বলিয়াছেন, লোকে ভিন্ন ভিন্ন কারণে স্থূলকায় হইতে পারে; সে সব কারণগুলি ধরিয়া এক এক করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন, নতুবা আমার মনে হয়—মোটা হয় কেবল বড় লোকে, গরীবেরাই কৃশ। ধন ও দারিদ্র্যই দুইদিকে দুইটী স্পষ্ট কারণ।

ক। তুমি যা বলছ, তা নিতান্ত মিথ্যা নয়; তবে উহার মধ্যে আরও কথা আছে, ক্রমে বুঝাইতেছি। দেখ, প্রথম কারণ বলা হইয়াছে "সুনিদ্রা"; এটী কফপ্রকৃতিক সুস্থদেহীরই হইয়া থাকে; অনেক গরীব লোকের স্থূল দেহ আছে, দেখিয়া থাকিবে—সিংহাসনস্থ রাজারও না থাকিতে পারে, সুতরাং এরূপস্থলে রাজাকেও কৃশকায় হইতে হয়। দ্বিতীয় "হর্ষ"। ইহা ধরে বেঁধে হয় না, স্বাভাবিক হওয়া চাই; এটী ঈশ্বরপরায়ণ বা অবস্থাবানেরই আছে। "সুখপ্রদ শয্যা" এটী ধনীর পক্ষে। মনের নিবৃত্তি বা ঈশ্বরবিশ্বাস—এটী শুধু ধনীর নয়, যে কোনও সাধুচিত্ত ব্যক্তির হইতে পারে। নানারূপ পুষ্টিকর ভোজনে দেহ পুষ্ট হয়, তাহা ত বলাই বাহুল্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ততা না থাকিলে হইবে না, তজ্জন্যই ভোজনশীল নিমন্ত্রণ-কীট ব্রাহ্মণেরা দিব্যাহার সত্ত্বেও কৃশকায়। চিন্তারাহিত্য একটী প্রধান কারণ। দেখা যায়, কোনও ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি হইলে ক্রমে মোটা হইয়া পড়ে। তাহার কারণ—পূর্ব্বে হীনাবস্থাকালে সে চিন্তায় দগ্ধ হইতেছিল, সম্প্রতি মনের হর্ষ ও নিশ্চিন্ততা আসিয়াছে। আর গায়ে তেল বসাইয়া লইলে যে মোটা হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত পাড়াগেঁয়ে মুসলমান দরবেশেরা। ইহারা শিষ্য বা সেবাদাসী দ্বারা নিত্য নিত্য বহুক্ষণ ব্যাপিয়া দেহে তৈল মর্দ্দন করাইয়া লন, দেহও খুব লম্বা-চওড়া মোটাসোটা। শেষ কথা—শাস্ত্রোক্ত অমৃতপ্রাশ ছাগাদি ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর রসায়ন যোগ সমুদায়ের দ্বারা যে কৃশদেহ স্থূল হয় তাহা বহুবার দেখা গিয়াছে।

দ্রব্যগুণ বিচার।

কিস্‌মিস্‌ ও মনক্কা।

বাঙ্গালা নাম—কিস্‌মিস্‌; হিন্দী—দ্রাখ; ইংরাজী—Vitis Vini fera. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসা পিচ। মৃদ্বিকা হারহূরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা। সংস্কৃত নাম—দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বিকা, হারহূরা, গোস্তনী। অন্য নাম—কৃষ্ণা, চারুফলা, যক্ষ্মঘ্নী, তাপসপ্রিয়া, প্রিয়ালা, গুচ্ছফলা, অমৃতফলা, ফলোত্তমা।

কিস্‌মিস্‌ ও মনক্কা কাশ্মীর কাবুল প্রভৃতি দেশীয় এক প্রকার বিস্তীর্ণ লতার শুষ্কীকৃত ফল। এই ফল যখন থোলো থোলে গাছে ঝুলিতে থাকে তখন ইহা দেখিতে মনোরম-হরিদ্রাভ এবং অতীব শোভাময়। সংস্কৃত-সাহিত্যে সুন্দরীর ওষ্ঠ ইহার সহিত উপমিত হইয়াছে। গাছ-পাকা অবস্থায় অত্যন্ত সুস্বাদু। ডাঁসা থাকিতে থাকিতে শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়।

ইহা প্রধানতঃ দুইপ্রকারের আছে—বড়গুলিকে মনক্কা এবং বীজহীন ছোটগুলির নাম কিস্‌মিস্‌ বলে। বড়গুলির চেহারা কতকটা গরুর বাঁটের ন্যায়, তজ্জন্যই ইহার সংস্কৃত নাম "গোস্তনী"।

দ্রাক্ষা পক্কা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ।
স্বাদু পাক রসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্ট মূত্র বিট্‌।
কোষ্ঠমারুতকৃদ্‌ বৃষ্যা কফপুষ্টিরুচিপ্রদা,
হন্তি তৃষ্ণা জ্বরশ্বাস বাত বাতাস্র কামলাঃ,
কৃচ্ছ্রাস্রপিত্ত সংমোহ দাহ শোষ মদাত্যয়ান্‌॥
বৃষ্যা স্যাৎ গোস্তনী দ্রাক্ষা গুর্ব্বীচ বাত পিত্তনুৎ।
অবীজান্যা স্বল্পতরা গোস্তনী সদৃশী গুণৈঃ॥

পাকা মনক্কার রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীতল; গুণ—চক্ষুর হিতকর, দেহস্থৌল্যকারক, গুরু পাক, স্বরশোধক, অধিক ভোজনে কোষ্ঠ-বায়ু-জনক, বৃষ্য, কফকর, পুষ্টিকর, রুচিপ্রদ, তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বায়ু, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, সংমোহ (মূর্চ্ছা ও দৌর্ব্বল্যজনিত অবসাদ) দাহ, মদাত্যয় (অতিরিক্ত মদ্যপানজ মূর্চ্ছা) নাশক। প্রভাব—সারক, মলমূত্র নিঃসারক, ক্ষয়হর ও রক্তপিত্তান্তক। সংক্ষেপে, এই গোস্তনী দ্রাক্ষা

গুরু বৃষ্য ও বাতপিত্ত হর। অবীজ ক্ষুদ্রজাতীয় গুলি (অর্থাৎ সাধারণ কিস্‌মিস্) গোস্তনীর তুল্য গুণ।

প্রয়োগ—এদেশে নানা মিষ্টান্ন ও পোলাও প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। জলখাবার রূপে শুধু অথবা অন্যান্ত মেওয়া জিনিসের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রধান প্রয়োগ মৃদু রেচন পিত্তহরণ ও উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বায়ুর অনুলোমন। শিশু, ঘৃণাশীল ব্যক্তি ও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিদের মুনকার কাথ খাওয়াইলে নিরুদ্বেগে মলশুদ্ধি হয়। এই কাথে কার্য্য না হইলে সোঁদালের আঠা উহাতে।৹ বা ॥৹ আনা গুলিয়া দিতে হয়। মউরী ও কিস্‌মিস্ কাপড়পুটলীতে রাখিয়া জলে ডুবাইয়া চুষিলে বাতপিত্ত জ্বরের পিপাসা দূর হয়। জ্বরকালে দু-চারিটী কিস্‌মিস্ সুপথ্যের মধ্যে গণ্য। হিন্দুস্থানীরা গোলমরিচচূর্ণ ও অল্প সৈন্ধবসহ ৮।১০টী মুনকা একটু ভাজিয়া জ্বর রোগীকে খাইতে দেয়। ইহাতে দাস্ত পরিস্কার ও শরীরের লঘুতা হয়। উর্দ্ধগরক্তপিত্তে খই ও কিস্‌মিস্ খাওয়া ভাল, এবং মুনকাঘটিত পাচন অত্যন্ত উপকারী—যথা—মুনকা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, পিপুল যথাবিধি কাথ কর্ত্তব্য। মৃদুরেচক ঔষধে প্রায়শঃ কিস্‌মিস্ সংযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে রেচকত্ব ও মধুরতা এই উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শাস্ত্রোক্ত দ্রাক্ষারিষ্ট, দ্রাক্ষাদি ঘৃত প্রভৃতির মধ্যে ইহা আবশ্যক হয়।

কুঁচ।

বাঙ্গালা নাম—কুঁচ; হিন্দী—শোণাকাঁইচ, চিরমিটীং; ইংরাজী Abrus Precatorius. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—রক্তিকা গুঞ্জিকা গুঞ্জা কাকজঙ্ঘা শিখণ্ডিনী, কৃষ্ণলা কাকিনী কক্ষা কনীচিঃ কাকণন্তিকা। সংস্কৃত নাম—রক্তিকা, গুঞ্জিকা গুঞ্জা, কাকজঙ্ঘা, শিখণ্ডিনী, কৃষ্ণলা, কাকিনী, কক্ষা, কনীচিঃ কাকণন্তিকা।

ইহা এক প্রকার লতা-গাছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু পাতা হয়, ইহাতে সরু শিমের মত ফল হয়, তাহার মধ্যে কুঁচ-বীজ থাকে। কুঁচ সকলেই দেখিয়াছেন। বাজারে বণিকের দোকানে যে যষ্টিমধু বিক্রীত হয়, তাহা এই জাতীয় গাছের মূল। শ্বেত ও লোহিত ভেদে কুঁচ দুই প্রকারের আছে।

গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কেশ্যং স্যাৎ বাতপিত্তজ্বরাপহম্।
মুখশোষ ভ্রমশ্বাস তৃষ্ণা মদ বিনাশনম্॥

নেত্রাময় হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডূব্রণং হরেৎ।
ক্রিমীন্দ্রলুপ্ত কুষ্ঠানি রক্তাঞ্চ চ ধবলাপি চ॥
শিফা বান্তিকরী পত্রং শূলঘ্নং বিষহৃৎ তথা॥

দুই প্রকার গুঞ্জাই কেশকর, বাতপিত্তজ্বর নাশক, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা ও মত্ততা প্রশমক; নেত্ররোগ হর, বৃষ্য, বল্য, কণ্ডূব্রণহর। ক্রিমি ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠের প্রতিকারক (শ্বেত ও রক্ত উভয়ই)। ইহার মূল বমিজনক, (অতি মাত্রায় বমিজনক, অল্পমাত্রায় কফনিঃসারক) পত্র শূলনাশক ও বিষহর (প্রলেপে)। কেশকর অর্থাৎ বীজে চিতামূল প্রভৃতির ন্যায় উগ্রতা থাকায় কেশহীন চর্ম্মকে উত্তেজিত করিয়া কেশ উৎপাদন করে। বাতপিত্তজ্বর নাশক, মত্ততাপ্রশমক—ইহার মূলের ক্বাথ। নেত্ররোগহর—পত্রের রস চোখে ফোট দিতে হয়। বৃষ্য—কুঁচ বীজ উত্তেজক বলিয়া ইহার সহিত সিদ্ধ করা তৈল শিথিলাঙ্গে প্রয়োগে উপকারী। কণ্ডূব্রণ হর=বীজসিদ্ধ সর্ষপ তৈল। ক্রিমিনাশক=ইহার সহিত সিদ্ধতৈল বাহ্যক্রিমিঘ্ন।

ইন্দ্রলুপ্ত প্রতিকারক=মস্তকের কেশ উঠিয়া গিয়া চর্ম্ম মসৃণ হইলে ইহার প্রলেপ তৎস্থান উত্তেজিত করিয়া কেশ উৎপন্ন করে। কুষ্ঠহর=বীজের প্রলেপ বা সিদ্ধ তৈল।

প্রয়োগ—ইহার মূল, পত্রের রস ও ফল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। মূল শুষ্ক কাসে ও নানাবিধ পিত্তরোগে বিশেষ উপকারী। পত্রের রস সেবন কম্পজ্বরে উপকারী—মাত্রা আধছটক। ইহার বীজকে "রতি" বলে এবং ওজন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ফলের প্রধান প্রয়োগ ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠে। কুঁচ আকন্দ-মনসা-প্রভৃতি সপ্ত উপবিষের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। শুনা যায় কুঁচ কাটিয়া সূক্ষ্মাগ্র করিয়া তদ্দ্বারা শূকর বিড়াল প্রভৃতির গায়ে খোঁচা দিলে তাহাদের শরীর বিষাক্ত হয় ও ক্রমে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। বস্তুতঃ, ইহা একপ্রকার মৃদু বিষ, অধিকমাত্রায় উদরস্থ হইলে, বা অন্যকোনও রূপে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে মনুষ্যেরও প্রাণ নাশক হয়। ইহা একপ্রকার বিষ বলিয়াই কুষ্ঠরোগে ইহার প্রভূত শক্তি। কুষ্ঠে যে বিষের প্রয়োগ উপকারী তাহা শাস্ত্রোক্ত করবীরাদ্য তৈল, বিষ তৈল, বিষতিন্দুক তৈল, কৃষ্ণসর্পাদ্য তৈল, ভল্লাতক গুড় প্রভৃতি ঔষধই তাহার প্রমাণ।

কেশ উঠাইবার জন্য একটী ইউনানী মুষ্টিযোগ এই—লাল কুঁচ খোলা ছাড়াইয়া ও থেঁৎলাইয়া একপোয়া লইবে এবং চারিসের গব্যদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া দেড় সের থাকিতে নামাইবে। এই দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া ১৪ দিন টাকে লাগাইলে পুনরায় চুল উঠে। ভৈষজ্যরত্ন ধৃত মুষ্টিযোগ—ভেলার আঠা, বৃহতীফল ও কুঁচফল পিশিয়া মধু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে টাক দূর হয়। ইহাতে ভেলার আঠা ৪।৫ ফোঁটার অধিক দিতে নাই। হাকিমেরা বলেন সাদা কুঁচ চিনিসহ ঋতুর ৩ দিন সেবন করিলে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয়।

শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—কুঁচ-বীজ জলসহ পেষণ করিয়া লাগাইলে বাত-ব্যাধিজন্য স্থানিক কম্প ও নিঃসংজ্ঞতা দূর হয়।

ধবলরোগের একটী উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ—কুঁচবীজ, হীরাকস, ও সোমরাজী সমাংশে আকন্দদুগ্ধ সহ মাড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে চর্ম্মের পূর্ব্ববর্ণ আবার হয়। ভাবমিশ্র বলেন—কুঁচের ফল ও মূল সহ দ্বিগুণ জল দ্বারা বিপাচিত সর্ষপ তৈল গণ্ডমালা দূর করে, দেখা গিয়াছে এই তৈলে মেটে সিন্দুর দিলে অধিক উপকারী হয়। কুঁচ, মনঃশিলা ও মনসার আঠাসহ গব্যঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লাগাইলে কুষ্ঠ বা কুষ্ঠতুল্য উৎকট চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়। শাস্ত্রোক্ত কেশ রোগের গুঞ্জাতৈলে টাকের মুহাদ্যতৈলে, ধবলাদি ক্ষারঘৃতে কুঁচ আবশ্যক হয়।

কুঁচিলা।

বাঙ্গালা নাম—ঐ; হিন্দী—কুচলা; ইংরাজী—Nux vomica. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—তিন্দুকশ্চ রম্যফলো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ। কুপীলুঃ কুলকঃ কাল-তিন্দুকঃ কালপীলুকঃ॥ কাকেন্দু বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কট তিন্দুকঃ॥

অন্যনাম—গরদ্রুম, কারস্কর, কচির, কুপাক, বিষমুষ্টি।

গাবের গাছের মত বড় বড় গাছ হয়, সুপক্ক ফলগুলি দেখিতে কতকটা ছোট কমলানেবুর মত, ইহার মধ্যে যে বীজ থাকে তাহাই "কুঁচলে"। ভারতের মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতির জঙ্গলে এই গাছ জন্মে। কুঁচলে-বীজ দেখিতে প্রায় গোলাকার, চ্যাপ্টা, ও প্রায় একটা আধ্লা পয়সার মত। বীজগুলি অত্যন্ত শক্ত, রৌদ্রে শুকাইয়া হামামদিস্তায় গুঁড়া করা অতীব কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার।

দুগ্ধে বা জলে সিদ্ধ করিয়া নরম হইলে শিলায় পিষিয়া লওয়া যায়; এই রূপেই কবিরাজী ঔষধে ব্যবহারযোগ্য হয়। কুঁচলের আস্বাদ অত্যন্ত তিক্ত।

কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু।
পরং ব্যথাহৃদ্‌ গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্॥

রস—তিক্ত; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—শীতল অর্থাৎ পিত্তজনিত দাহ নাশক; বায়ুবর্দ্ধক অর্থাৎ ব্যানবায়ুর উত্তেজক (মর্ম্মার্থ এই যে শরীরের কোনও স্থান অসাড় ও রক্ত চলাচল রহিত হইলে ইহার বাহ্য বা অভ্যন্তরিক প্রয়োগে সেই দোষ দূরীভূত হয়) ইহা মদকারক, অর্থাৎ অধিক মাত্রায় মূর্চ্ছা আনয়ন করে; লঘুপাক, অত্যন্ত ব্যথানাশক (আভ্যন্তরিক প্রয়োগে শূলব্যথা ও প্রলেপে দেহের বাত-বেদনা নিবারণ করে)। ইহা গ্রাহি অর্থাৎ ধারক; এই "গ্রাহি-বিশেষণ মলমূত্র সম্বন্ধে নহে; যেহেতু প্রত্যক্ষে ইহার এরূপ শক্তি দৃষ্ট হয় না। তবে এই বিশেষণ কেন? যদি এই বিশেষণের সার্থকতা নিষ্পন্ন করিতে হয় তবে বলিতে হইবে ইহা শুক্রের ধারক। বস্তুতঃ, ইহা স্বপ্নদোষ ও শুক্রমেহ রোগে যেরূপ উপকার করিয়া থাকে, তাহাতে ইহাকে শুক্রধারক বলিতেই হইবে। পুনশ্চ, কফ পিত্তনাশক (কফ ও পিত্ত হইতে অঙ্গব্যথা, মস্তকব্যথা, যকৃদ্দোষ, পাণ্ডুরোগ, অম্লপিত্ত, মুখের বিস্বাদ প্রভৃতি যে যে উপসর্গ হয় তৎসমস্তের প্রশমক) ইহা অস্র-নাশক অর্থাৎ পিত্তজন্য রক্তদোষনাশক।

এতৎসম্বন্ধে মতান্তর।

কচিরঃ কটুকস্তিক্তো রূক্ষোষ্ণো দীপনো লঘুঃ।
ভেদনো রোচনোঽহন্তি পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্॥

কুঁচলে কটুতিক্ত, রূক্ষ, উষ্ণ, অগ্নিদীপন, লঘু, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, রুচিকারক, এবং পাণ্ডুরোগ ও কামলারোগ বিনষ্ট করে।

প্রয়োগ—জীর্ণজ্বর, পিত্তরোগ, অক্ষুধা, যকৃদ্দোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বাত-পক্ষাঘাত হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বাতব্যাধিতে ও নানাবিধ চর্ম্মরোগে প্রয়োজ্য। কুঁচলের গুণ সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ইহাই মনে রাখা উচিত যে চিরতা গুলঞ্চ প্রভৃতি সাধারণ তিক্ত বস্তুতে যে যে গুণ আছে—ইহাতেও তাহাই

আছে অধিকন্তু ইহা বিষাক্ত বলিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক তীব্র ও অধিক আগ্নেয় ও অল্পমাত্রায় অধিক কার্য্যকারী এবং উত্তেজক।

তিক্ত বস্তু সমূহের মধ্যে কুঁচলে অতি উৎকৃষ্ট জিনিস্। আয়ুর্ব্বেদে ও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে, তথাপি কবিরাজগণ ইহার বহুল প্রয়োগ করেন না, পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাই ইহা অধিক ব্যবহার করেন ও ইহার গুণে মুগ্ধ। ইহার কারণ কি? আপাততঃ ইহার উত্তরে মনে হয়, ইহা বড় উষ্ণ বীর্য্য সুতরাং এতৎ পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ প্রভৃতি মৃদুবার্য্য উদ্ভিজ্জগুলিই কবিরাজেরা ব্যবহার করা সঙ্গত বুঝেন, একথা ঠিক নহে; যেহেতু দেখা যায় কবিরাজেরা কথায় কথায় মিঠাবিষ ও পারদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেস্থলে নবজ্বরাদি রোগে ডাক্তার মহাশয় সোরা-নিশাদল প্রভৃতির শৈত্যকর তরলসার প্রয়োগ করিতেছেন, ঠিক সেই স্থলেই কবিরাজ মহাশয় উৎকট মিঠাবিষ ও হিঙ্গুলঘটিত মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি দিতেছেন। সুতরাং মৃদুবীর্য্য-প্রিয়তাই ইহাদের কুঁচ্লার প্রতি অনাদরের কারণ নহে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র কারণ এই যে কবিরাজেরা বাঁধাগদের গণ্ডীর মধ্যে থাকেন, উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা একটী দেখিয়া আর একটী করিতে পরাঙ্মুখ। শাস্ত্রে যে দুই এক ঔষধের মধ্যে কুঁচ্লের প্রয়োগ আছে, সেইগুলিই প্রস্তুত করেন, কেহবা সেগুলি পরিহারও করিয়া থাকেন। ফলকথা, পরীক্ষাপরায়ণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা কুঁচলেকে যতটা চিনিয়াছেন, কবিরাজেরা ইহা ততদূর চিনিতে পারেন নাই। পুরাতন জ্বরের (বা অজীর্ণরোগের) পাচন লিখিবার সময় কবিরাজ মহাশয় যখন চিরতা গুলঞ্চ নিমছাল কটুকী প্রভৃতি এক-ঘেয়ে তিক্ত দ্বারা লম্বা তালিকা করিতে বসেন, তখন তিনি কুঁচলের এক টুক্রাকে উহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলেন এরূপ কি, পাঠক মহাশয়! কখনও দেখিয়াছেন?—বোধ হয়, না। আর এক কারণ—বাঁধাবড়ীর মধ্যে যদি কুঁচলে থাকে তাহাত কবিরাজ মহাশয় অবশ্যই ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু শুধু কুঁচলের মাত্রা তিনি জানিবেন কিরূপে?—কেন না শাস্ত্রে একটী বস্তুর প্রয়োগ ত বড় বেশী নাই! লোহ বিষ প্রভৃতির মাত্রা নির্ণীত আছে বটে, কিন্তু কুঁচলের ত তাহা দেখিতে পাই না। দেখা যায়, ডাক্তারেরা ইহার তরলসার (tincture) সাধারণতঃ পাঁচ ফোটা করিয়া দেন, এখন কতটুকু কুঁচলে কত জলে কতক্ষণ

ভিজাইলে বা সিদ্ধ করিলে ঐ কাথ পাঁচ ফোঁটার তুল্য হইবে তাহাই বা কে নির্ণয় করিতে যায়! সম্ভবতঃ এইরূপ নির্ণয়াভাবেও কবিরাজেরা পাঁচনাদিতে ইহা প্রয়োগ করেন না। যাহা হউক, আমরা বহুকালব্যাপক ব্যবহার দ্বারা ইহার মাত্রা সম্বন্ধে এইটুকু স্থির করিয়াছি—একটী কুঁচলেকে কাটিয়া তাহার সিকিভাগ (আধছটাক জলে) রাত্রে ভিজাইয়া প্রাতে সেই জল পান করিলে ৩ ফোঁটা টিংচর নক্সভমিকা পানের কার্য্য হয়। অর্দ্ধঘণ্টা কাল জ্বাল দিয়া লইলেও ৩ ফোঁটার তুল্য সার নির্গত হয়। বলবান্ ব্যক্তির জন্য আধখানা কুঁচলে ঐরূপ ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই ক্বাথ মহালক্ষ্মীবিলাস, বাতচিন্তামণি প্রভৃতির অনুপান স্বরূপ, অর্দ্দিত, (মুখ বেঁকিয়া যাওয়া) স্থানিক স্পর্শশক্তিহীনতা ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতব্যাধিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; অথবা মাষকলাদি পাচনের সহিত একটী কুঁচলের একচতুর্থাংশ দিয়া কাথ করিলেও উক্ত রোগসমূহে বিশেষ উপকারী হয়। পাকস্থলীর দৌর্ব্বল্যজনিত অতিসারেও ইহা ফলপ্রদ। ইহার কাথের সহিত ৩০ ফোঁটা কাঁচা পেপের আঠা মিশাইয়া সেবন করিলে অজীর্ণরোগী সত্বর উপশম পাইতে পারে। যকৃদ্দোষজনিত অম্লপিত্তের পক্ষেও এমন মুষ্টিযোগ দুর্লভ। কামলারোগে চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ বা হরিদ্রাভ হইলে কুঁচলের কাথ সহ ৩।৪ রত্তি নিষাদল চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে উপকার হয়। অধিক কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উহাতে হরিতকীর জল মিশানো আবশ্যক।

একটী উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ—খাঁটী সর্ষপ তৈল অর্দ্ধসের, কুঁচলের টুকরা অর্দ্ধপোয়া, শূকরের চর্ব্বী এক ছটাক, আদার রস অর্দ্ধসের, সৈন্ধব লবণ এক ছটাক, কর্পূর অর্দ্ধ ছটাক একত্রে সিদ্ধ করিয়া তৈলাবশেষ করিয়া লইয়া মর্দ্দন করিলে বাত ও পক্ষাঘাতে বিশেষ উপকার দর্শায়। ধ্বজভঙ্গ রোগে শিথিল অঙ্গে এই তৈল মর্দ্দন করিলে নিস্তেজোভাব দূরীভূত হয়।

স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছাকৃত মূত্রত্যাগে কুঁচলের ব্যবহার উপকারী। অর্দ্ধটুকরা কুঁচলে, আধতোলা আমলকী ও চারি আনা কাবাবচিনি, দু আনা ফুলখড়ীচূর্ণ ও আট আনা মিশ্রী একত্রে ৮ ভরি জলে রাত্রে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত সেবন করিতে থাকিলে স্বপ্নদোষ দূরীভূত হয়। কোন কোন বালকদিগের অজ্ঞাতসারে মূত্রনিঃসরণ হইয়া থাকে,

তাহাদিগকে ।০ আনা আমলকী ও কুঁচলের অষ্টমাংশ ভিজাইয়া খাওয়াইতে হয়।

অর্শ, শূল ও রজঃ কৃচ্ছ্র রোগে কুঁচলের প্রয়োগ ফলদায়ক হইয়া থাকে। শিরোরোগেও ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দশমূলের সহিত কুঁচলে সংযুক্ত হইলে বাতশ্লেষ্মঘটিত শিরোরোগে আশ্চর্য্য উপকার দর্শায়। একটী কুঁচলে, দু আনা দারুচিনি ও দু আনা চিনি একসঙ্গে জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে আধকপালি প্রশমিত হয়। ইহার চূর্ণের মাত্রা—সিকি হইতে ২ রতি।০ প্লীহজ্বর, অপস্মার, রক্তামাশয় এবং বহুমূত্রেও ইহার শক্তি আছে। শাস্ত্রোক্ত অজীর্ণের অগ্নিতুণ্ডী বটী, শূলের শূলের শূলহরণ যোগ, এবং কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাতের বিষতিন্দুক তৈল প্রভৃতির মধ্যে কুঁচলে আবশ্যক হয়।

কুকুন্দর।

বাঙ্গালা নাম—কুকুসিমা, কুকুর শোঁকা, কুকুরমুতা, পেদো মূলো বা বনমূলো; হিন্দী—কুকুরোন্দা; ইংরাজী—সেলসিয়া করমাণ্ডিলিয়েনা, সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুকুরদ্রু মৃদুচ্ছদঃ। সংস্কৃত নাম—কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুকুরদ্রু, মৃদুচ্ছদ।

ছোট ছোট গাছ, ভূমি হইতে ডাঁটা একটু দূর উঠিয়াই চারিদিকে ছড়ানো পাতা দ্বারা বেষ্টিত থাকে, পাতাগুলি বালকের হাতের পাঞ্জার ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা একটু লম্বা. পাতা অত্যন্ত কোমল, হাত দিয়া মাড়িলে একরূপ অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হয়। পতিত জমিতে, দেওয়ালে, গৃহস্থের বাড়ীর ধারে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্ত কফাপহঃ।
রক্তপিত্ত মতিসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ॥
তন্মূল মার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ॥

রস—ঈষৎ কটুতিক্ত; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীতল; গুণ—জ্বরঘ্ন, রক্তদোষহর, কফনিঃসারক, ঘোর দাহ নাশক। প্রভাব—রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসার প্রশমকারী, আর্দ্রমূল মুখে ধৃত হইলে মুখশোষ নাশক।

প্রয়োগ—এই গাছটী নানারূপে বড়ই উপকারী। ইহার পাতার রস একটী উত্তম রক্তরোধক। তবে ঊর্দ্ধগ অপেক্ষা অধোগরক্তে অধিক কার্য্যকর। যদি রক্তস্রাব কফমিশ্রিত না হইয়া বাতপিত্ত জন্য হয়, তবে ঊর্দ্ধগ রক্তেও বেশ ফল দর্শায়। দাহজ্বরে ইহার রস সেবন করাইলে ও গাত্রে মাখাইলে উপশম পাওয়া যায়। সেব্য মাত্রা—২ তোলা। পিত্ত-প্রকোপকারণে রক্ত উত্তপ্ত হইয়া দূষিত হইলে ইহার রস সেবনে সেই দোষ দূরীভূত হয়। ঘামাচি চুলকানির উপরে রস মাখাইলে উপকার দর্শায়। ইহার পাতার রস মধু সেবন করিলে জমাট শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠে। পিপাসা কালে ইহার মূল মিশ্রীসহ মুখে রাখিলে কণ্ঠশোষ নিবারিত হয়। নূতন গনোরিয়া রোগে ইহার রস চিনিসহ পানে উপকার হইতে দেখিয়াছি।

ইহার প্রধান গুণ—রক্তাতিসারে, কুড়চির ন্যায় পেট গরম না করিয়া রক্তরোধ করে। বাতরোগীকে এক ব্যক্তি নিজ হস্তে একদিন মাত্র একটী মূল খাওয়াইয়া আরোগ্য করে—আমরা শুনিয়াছি, ইহা এই কুকসিমার মূল। ইহার সম্বন্ধে একটী ঘটনা আছে এই একজন মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক অধ্যক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া কার্য্যত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে চলিয়া যান, সেখানে গিয়া একটী দুঃসাধ্য রক্তামাশয় রোগীকে শুধু কুকসিমার রস খাও-য়াইয়া খাওয়াইয়া ভাল করেন। তজ্জন্য কিছু অর্থলাভও করেন। তাহার পরে বাঙ্গালা আয়ুর্ব্বেদ পুস্তক কিনিয়া তিনি সেই দেশে ক্রমে কবিরাজী করিতে লাগিলেন।

কুম্‌কুম।

বাঙ্গালা নাম—কুম্‌কুম; হিন্দী—জাফরাণ, কেশর; ইংরাজী—Saffron. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুম্‌কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরং। সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্। সংস্কৃত নাম—কুম্‌কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক এবং শোণিতপর্য্যায়ের সমস্ত শব্দগুলি।

অন্য নাম—ঘস্র, কুসুমাত্মক, খল, রজ, সৌরভ, কাশ্মীরজন্ম, অগ্নিশিখ, বরেণ্য, কান্ত, গৌর।

কাশ্মীর দেশে এক প্রকার ছোট গাছ জন্মে, ইহা তাহারই পুষ্পের গর্ভ-কেশর। এই গাছ দেখিতে অনেকাংশে পেঁয়াজ-গাছের ন্যায়। ঐ সকল পুষ্প আহরণ করিয়া কাগজের উপর রৌদ্রে বা উনানের উপরে অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। ইহা প্রধানতঃ কাশ্মীরেই উৎপন্ন তজ্জন্য ইহার একটী নাম কাশ্মীর বা কাশ্মীরজ। কুম্‌কুম দেখিতে রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ, এক বা দেড় ইঞ্চি লম্বা সূতার টুকরার ন্যায়, অগ্রভাগ একটু স্থূল, এবং ইহা তীব্র সদগন্ধযুক্ত, যেন ইহাতে রসুনের গন্ধের একটু আমেজ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে ঐই জিনিসের বহুল প্রচলন। যেমন এতদ্দেশে বিবাহাদি উৎসবে হরিদ্রা ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ কাশ্মীর প্রদেশে উৎসবকালে ইহার মহা সমাদর। ব্যঞ্জনাদির সুস্বাদ উৎপন্ন করিবার জন্যও ইহা উক্ত প্রদেশে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়! আমাদের দেশেও পোলাও-কালিয়া প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের খাদ্য প্রস্তুত করিবার কালে গরম মশলার উপকরণরূপে ইহা সমাদৃত হইয়া থাকে।

ইহার কাথে বস্ত্র রঞ্জিত করিলে উহাতে অতি সুন্দর বর্ণ উৎপন্ন হয়। মাখিবার তৈলে ডুবাইয়া রাখিলে উহাতে সৌগন্ধ, সদ্‌গুণ ও স্বর্ণবর্ণ উৎপাদিত হয়। কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য শীতপ্রধান দেশেও কুম্‌কুম জন্মে, কিন্তু তাহা তত ভাল নয়, যথা—

> কাশ্মীর দেশজে ক্ষেত্রে কুম্‌কুমং যদ্ ভবেদ্ধিতৎ
> সূক্ষ্মকেশমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্।
> বাহ্লীক দেশ সংজাতং কুম্‌কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতং।
> কেতকীগন্ধযুক্তং তৎ মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্।
> কুম্‌কুমং পারসীকে যন্ মধুগন্ধি তদীরিতম্।
> ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদ্ অধমং স্থূলকেশরম্।

যে কুম্‌কুম কাশ্মীর প্রদেশে জন্মে, তাহা সূক্ষ্মকেশরবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি, এই কুম্‌কুমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে কুম্‌কুম বাহ্লীক (বোখারা) প্রদেশে জন্মে, তাহা পাণ্ডুর বর্ণ, কেতকী পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত ও সূক্ষ্মকেশর বিশিষ্ট, ইহা মধ্যম এবং পারস্য প্রদেশে যে কুম্‌কুম উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, স্থূলকেশরও নিকৃষ্ট।

কুম্‌কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্‌ব্রণজন্তুজিৎ।
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং বক্তিদোষত্রয়াপহম্‌॥

রস—তিক্তকটু; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত) ব্রণঘ্ন, ক্রিমিনাশক, বমিহর, বর্ণশোধক, মেচেতানাশক ও নিদোষঘ্ন, প্রভাব—শিরোরোগে উপকারী।

প্রয়োগ—পূর্ব্বে পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা ইহার আক্ষেপ-নিবারক ও রজোনিঃসারক শক্তি দেখিয়া হিষ্টিরিয়া ও বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগে বিশেষ উপকারী মনে করিতেন। এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রদ নূতন নূতন উদ্ভিজ্জ আবিষ্কৃত হওয়ায় আজকাল ডাক্তারী চিকিৎসায় ইহার অধিক প্রচলন নাই।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার প্রধান প্রয়োগ মুখব্রণাদি চর্ম্মবিকারে ও শিরো-রোগে। ইহা কফপ্রকৃতির রোগী ইহা নিত্য নিত্য অন্নব্যঞ্জনে ব্যবহার করিলে উপকার পাইতে পারেন। মুষ্টিযোগ—(১) সিমুলের কাঁটা, জাফ্রাণ ও দুধের সর একত্রে পিষিয়া মুখে লাগাইলে মেচেতা ও মুখব্রণ দূরীভূত হয়। (২) কাঁচা হলুদের রসের সহিত জাফ্রাণ উত্তমরূপে মাড়িয়া উহাতে মাখন মিশাইয়া মস্তক মর্দ্দন করিলে মাথা-ঘুরা ও মাথার দবদবানি উপশমিত হয়। (৩) জাফ্রাণ আতপতণ্ডুল ও দারুচিনি সমানাংশে পানের রসে পিষিয়া লেপ দিলে মাথাধরা ও আধকপালে আরোগ্য হয়।

রসায়নোক্ত অমৃতপ্রাশ ঘৃত ও শিরোরোগের কুম্‌কুমাদি তৈলে জাফ্রাণ আবশ্যক হয়।

কুটজ।

বাঙ্গালা নাম—কুড়চি; হিন্দী—কুরৈয়া; ইংরাজী—Wrightia antidysentrica. সংস্কৃত পর্য্যায়:—কুটজঃ কূটজঃ কোটো বৎসকো গিরিমল্লিকা কালিঙ্গ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি। ইন্দ্রোযবফলঃ প্রাক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুর দ্রুমঃ। সংস্কৃত নাম—কুটজ, কূটজ, কোট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প।

বড় গাছ হয়, পাতা কতকটা চাঁপা-পাতার মত (ছোট হাতের পাঞ্জার

মত) ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, অতীব সুগন্ধিও দেখিতে মনোহর। পাড়া গাঁয়ে ঘন জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে।

কটুজঃ কটুকো রুক্ষো দীপন স্তুবরো হিমঃ।
অর্শোতিসার পিত্তাস্র কফ তৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ॥

রস—তিক্তকষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—হিম; গুণ—রুক্ষ, দীপন, কফ তৃষ্ণা ও কুষ্ঠনাশক। প্রভাব—অর্শ, অতিসার ও রক্তপিত্ত প্রশমক।

প্রয়োগ—কুড়চির প্রধান শক্তি রক্তরোধকতা। এইশক্তি উর্দ্ধগ অপেক্ষা অধোগরক্তেই অধিক দৃষ্ট হয়। রক্তার্শ ও রক্তাতিসারে ইহার ক্ষমতা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রক্তাতিসারে ইহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ উদ্ভিজ্জ আবিষ্কৃত হয়, নাই বলিলে বলা যায়। স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদরেও প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায় রক্তপ্রদরে ইহার সহিত আমলকী প্রভৃতি শীতবীর্য্য বস্তু যুক্ত করিলে অধিক ফল হয়। আমাশয় রোগে ইহা কখন কখন প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা রক্তমিশ্রিত হইলে কুটজপ্রয়োগে সমধিক উপকার দর্শায়। আমরক্তাতিসারে কুড়্চি নানারূপে প্রযুক্ত হয়, ইহার কাঁচা ছালের টাটকা রস, কাঁচা ছাল পোড়াইয়া তাহার রস, কাঁচা ছালের কাথ বা শুষ্ক ছালের কাথ শুষ্ক ছাল চূর্ণ পাতার কাথ, মূলের ছালের রস, ও ইহার ফল (ইন্দ্রযব) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তামাশয়রোগে যখন নাড়ীতে ঘা হইয়া নানাবর্ণের মল মিশ্রিত মাংস খসিয়া পড়িতে থাকে তখনও ইহাদ্বারা রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। নূতন ও পুরাতন উভয়প্রকার রক্তাতিসারেই কুড়্চী উপকারী, তবে পুরাতন অবস্থায় বিনাবিচারে সহসাই প্রয়োগ করা যায় কিন্তু নূতনে কখন কখন ইহা প্রয়োগার্হ নহে। পুরাতন অবস্থার সহিত দালিমের খোলা মোচরস প্রভৃতি সংকোচক বস্তু সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আমরক্ত রোগে যে ইহা দ্বারা এত উপকার হয় তাহার কারণ ইহার এই কয়টী গুণ—শোষক আমপাচক ক্ষতনাশক ও রক্তরোধক। কুড়চির সহিত বেলশুঁঠ যুক্ত করিয়া উভয়ের কাথ পান করাইলে যেন সোণায় সোহাগা হয় বলিতে হইবে। কাথ করণার্থ প্রত্যেক ১ ভরি লইতে হইবে। দুঃসাধ্য অবস্থায় এ কাথে মটরপ্রমাণ আফিং সংযুক্ত করিয়া দিবে।

কুড়চিতে ক্ষতনাশক শক্তি আছে। ইহার সূক্ষ্মচূর্ণ ঘাএর উপরে ছড়াইয়া দিলে উপকার দর্শায়। কুড়চি চূর্ণ দ্বারা দাঁতে মাজিলে মাড়ীর ঘা ও রক্ত পড়া দূর হয়। সাধারণ লোকে নিমপাতার জলে ঘা ধুইয়া থাকে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কুড়চি সিদ্ধজলের সহিত ঘা ধুয়াইলে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার হয়।

আমরক্তের কয়েকটী শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ—(১) বৎসকাদি ক্বাথ—কুটজ, আতিস, বেলশুঁঠ মুথা, বালা, সাকল্যে ২ ভরি। কুটজাদি ক্বাথ—কুটজ, দাড়িমখোলা, মুথা, বালা, লোধ, রক্ত চন্দন, ধাইফুল, আকনদ একত্রে ২ ভরি। যথাবিধি কাথ কর্ত্তব্য। (৩) কুটজ পুটপাক—টাটকা কুড়চির ছাল উত্তমরূপে তণ্ডুলজলসহ পেষণ করিয়া জামপত্র দ্বারা বেষ্টন ও কুশদ্বারা বন্ধন করিয়া বহির্ভাগে মৃত্তিকালেপন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। বহিঃস্থ লেপ অরুণবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া রস নিংড়াইয়া ২ তোলা পরিমাণে মধুসহ সেবন কর্ত্তব্য।

কুড়চির জ্বরাতিসার নাশনেও সমধিক শক্তি আছে—জ্বরাতিসারের ব্যোষ্যাদি চূর্ণের মধ্যে অর্দ্ধেকভাগই কুড়চিছালচূর্ণ কুড়চি হইতে শাস্ত্রোক্ত কুটজাষ্টক, কুটজরস ক্রিয়া, কুটজাবলেহ,কুটজারিষ্ট প্রদবারি লৌহ গ্রহণী-মিহির তৈল প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত সহর মফঃস্বলে যেখানে যে প্রসিদ্ধ রক্তামাশয়ের মুষ্টিযোগাদি আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহার অধিকাংশেরই কুড়চিই প্রাণ।

কুড়।

বাঙ্গালা নাম—ঐ; হিন্দী—কুট; ইংরাজী—Sansurea Auriculata.

সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ং চাপ্যং পারিভাব্যং তথোৎপলম্ সংস্কৃত নাম—কুষ্ঠ, রোগের সমার্থক সমস্ত শব্দ, আপ্য, পারিভাব্য, উৎপল। অন্য নাম—কদাখ্য, দুষ্ট, অরণ, কৌবের, ভাস্বর, কাকল, কুৎসিত,পাবন, পদ্মক, কিঞ্জল্ক, হরিভদ্রক।

হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম প্রদেশজাত একরূপ বৃক্ষের মূল। হরিণশৃঙ্গের টুকরার ন্যায় অমসৃণ পাতলা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় বণিকের দোকানে বিক্রীত হয়, ইহাতে বেশ একটু সুগন্ধ আছে।

কুষ্ঠং মুষ্কং কটু স্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু।
হন্তি বাতাস্র বীসর্প কাসকুষ্ঠ মরুৎ কফান্॥

রস—তিক্ত কটু স্বাদু; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—বাতশ্লেষ্মঘ্ন, লঘু কাসনাশক, বাতরক্ত কুষ্ঠ বীসর্প প্রশমক।

প্রভাব—শুক্রল (কটুতিক্তত্ব সত্বেও)

মতান্তরঃ—কুষ্ঠং শ্বাসং কাসকুষ্ঠং জ্বরং হিক্কাঞ্চ নাশয়েৎ। কুড়, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, জ্বর ও হিক্ক নিবারণ করে।

প্রয়োগ—কাস রোগে প্রধানতঃ, দ্বিতীয়তঃ চর্ম্মরোগে ইহার ব্যবহার জ্বরযুক্ত কাসেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার সৌগন্ধ্যবশতঃ ডাক্তারেরা ইহাকে কর্মিনেটিভ (Carminative) শ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। বস্তুতঃ, বাতাজীর্ণে ইহার প্রয়োগ দৃষ্টফল। শ্লোকস্থিত "বাতশ্লেষ্ম" বিশেষণ দ্বারাই ইহার এই শক্তি বুঝিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ—(১) কুড় পিপুল যষ্টিমধু, কাঁকড়াশৃঙ্গী একত্রে ২ তোলা সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ ২ বারে পান করিলে কাস আরোগ্য হয় অথবা উহাদের চূর্ণ ।/০ আনা মাত্রা মধুসহ লেহন করিবে। (২) কুড় ও মনছাল সর্ষপ তৈলে সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল লাগাইলে পাচড়া ঘা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। (৩) কুড়, গৃহধূম হরিদ্রা কুড় রাইসর্ষপ ও ইন্দ্রযব গুক্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ছুলি ও বিচর্চ্চিকা (কাউর আরোগ্য হয়। (ভৈঃ রত্ন) কাস-রোগের (বিশেষতঃ শিশুর জন্য) শাস্ত্রোক্ত সহজ অথচ অতি ফলপ্রদ যোগ পুষ্করাদি চূর্ণ—কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী পিপুল, দুরালভা প্রত্যেক সমভাগ মধুসহ লেহন কর্ত্তব্য। কুড়, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটেরকুঁড়ী মসূর দাইল একত্র জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা দূর হইয়া মুখের বর্ণ উজ্জল হয়। (ভৈ রত্ন) অগ্নিমান্দ্যরোগের, অগ্নিমুখ চূর্ণের মধ্যে কুড় বহু পরিমাণে প্রযুক্ত হয়, যথা—

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণাভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা প্রোক্তা শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্গুণা চ হরিতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠ মষ্টগুণং ভবেৎ॥

অর্থাৎ হিং ১ ভাগ বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরিতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, দধির মাত, সুরা অথবা উষ্ণজলের সহিত সেবনে উদাবর্ত্ত, বাতাজীর্ণ, আমাজীর্ণ, প্লীহা ও কাসরোগ আরোগ্য হয়। ইহা সহজ অথচ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শাস্ত্রোক্ত স্বরভঙ্গের কল্যাণাবলেহ ও ব্রহ্মীঘৃতে, কাসের দমশর্কর লৌহ ও শৃঙ্গারাভ্রে শিশুরোগের কুমার কল্যাণ ঘৃতে, চর্ম্মরোগের বৃহৎ মরিচাদি ও কন্দর্পসার তৈলে এবং বাতব্যাধির নানা তৈলে কুড় আবশ্যক হয়।

কুন্দুরু।

বাঙ্গালা নাম—কুন্দুর খোটী; হিন্দী—খেরোজা; A sort of resin. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কুন্দ ইত্যপি। সংস্কৃত নাম—কুন্দুরু, মুকুন্দ, সুগন্ধ, কুন্দ।

ইহা বসওয়েলা ফ্লোরিণ্ডা (শল্লকী) নামক বৃক্ষের ধুনাযুক্ত নির্য্যাস। এই নির্য্যাস গোলাকার, ঈষৎ পীতবর্ণ; স্বচ্ছ, ভঙ্গুর, উগ্র, রুক্ষাস্বাদ ও রুক্ষ সদ্‌গন্ধযুক্ত, অগ্নিসন্তাপ পাইলে অধিকতর সুগন্ধ নির্গত হয়। খোট্টাপশারীর দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

কুন্দুরু র্মধুর স্তিক্ত স্তীক্ষ্ণ স্ত্বাচ্যঃ কটু র্হরেৎ।
জ্বর স্বেদ গ্রহালক্ষ্মী মুখরোগকফানিলান্‌।
দাহপ্রদর পিত্তাস্রৌ লেপনাচ্ছৈত্যদঃ পরঃ॥

রস—মধুর তিক্তকটু; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—তীক্ষ্ণ ত্বক্‌দোষনাশক, কফবাতঘ্ন, জ্বর, দাহ ও পিত্তরোগহর, লেপনে শৈত্যপ্রদ (প্রদাহনাশক) প্রভাব—প্রদর (শ্বেত) নাশক ও মুখরোগহর। কোমল-স্থানের ক্ষতে বিশেষ উপকারী, তজ্জন্যই যোনি মধ্যস্থিত ক্ষত জন্য শ্বেতস্রাব ও মুখগহ্বরস্থ ক্ষতের প্রশমন করে।

প্রয়োগ—কাস, ক্ষত, ব্রণ, শ্বেতপ্রদর ও মেহে প্রযোজ্য। চূর্ণের মাত্রা (আভ্যন্তরিক) ৫ হইতে ১৫ রতি। মধু সহ লেহন করিতে হয়। চক্রদত্ত লিখিয়াছেন, গোধূম ও কন্দুর, মেষদুগ্ধসহ পেষণ ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশূল নিবারিত হয়। কুন্দুরু অর্দ্ধ ছটাক গর্জ্জন তৈল ও

মোম প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক উত্তাপ সংযোগে গলাইয়া ছাঁকিয়া লইলে ইহা সর্ব্বপ্রকার ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ হয়। গৃহে সদ্গন্ধযুক্ত ধূম দিবার সময় অন্যান্য মশলার সহিত ইহা ব্যবহার করা ভাল।

কুমড়া।

বাঙ্গালা নাম—কুমড়া; হিন্দী—কোঁহড়া; ইংরাজী—Benin casa. ইহা মনুষ্যের একটী অনায়াস-লভ্য খাদ্য, বহুল পরিমাণে জন্মে, ঘরে সঞ্চিত থাকিলে পচে না, অল্পমূল্যে অধিক ওজনে পাওয়া যায়। সুতরাং গরিব বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে মহোপকারী—অন্য কিছুর অভাবে অন্ন গলাধঃ করাইবার অধম-তারণ সহায়। ইহা রোগীর অপথ্য, কিন্তু সুস্থের পক্ষে বলপুষ্টিকর।

কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্র বাতনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্॥
বৃদ্ধং নাতি হিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ॥

সদ্যঃপক্ব কুষ্মাণ্ড (যাহা পাকা অথচ ঘরে বহুদিন রাখা হয় নাই এরূপ কুমড়া শরীরের পুষ্টিকর, শুক্রকর, ঈষৎ গুরুপাক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক। কচি কুমড়া পিত্তনাশক ও শীতল, মধ্যম কুমড়া কফকর এবং অত্যন্ত পাকা কুমড়া, অতিশীতল নহে, মিষ্টাস্বাদ, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিদীপক ও লঘুপাক, ইহা প্রস্রাবকারক, হৃদ্রোগনাশক ও ত্রিদোষহর।

cerifera. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুষ্মাণ্ডং স্যাৎ পুষ্পফলং পীতপুষ্পং বৃহৎফলম্। সংস্কৃত নাম—কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প, বৃহৎফল। অন্যনাম—ঘৃণাবাস. তিমিষ, গ্রাম্যকর্কটী, কর্কারু, শিখিবর্দ্ধক, সুফলা, নাগপুষ্পফলা।

কুমড়া গাছ সকলেই দেখিয়া থাকিবেন, ইহাকে চালকুমড়া, ছাঁচিকুমড়া সাদা কুমড়া বা দেশী কুমড়া বলে; হরিদ্রাভ মিষ্টাস্বাদ যুক্ত যে কুমড়া, যাহা মিঠেকুমড়া, সূর্য্যকুমড়া, বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়) তাহা এই জাতীয় কুমড়া হইতে সম্পূর্ণই বিভিন্ন। চাল্ কুমড়া ঘরের ছাদে বা উচ্চ মঞ্চের উপরে জন্মে, শেষোক্ত কুমড়া ভূমির উপরে উৎপন্ন হয়। এই মিষ্ট কুমড়া যদিও ঔষধোপকরণরূপে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি ইহার একটী প্রধান গুণের জন্য এস্থলে ইহার উল্লেখ করিতে হইল; সে গুণটী এই।

দুর্গা-স্তোত্রম্

(হিমালয়-কৃতম্)

(১)

মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে,
ত্বং সর্ব্বং ন হি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে।
ত্বং বিষ্ণু র্গিরিশ স্ত্বমেব হি সুরা ধাতাঽসি শক্তিঃ পরা
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্যচরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং শিবে॥

এই ত্রিসংসার মাগো! চরাচরময়
তোমারি স্বরূপ বিনা কিছু আর নয়!
তুমি বিশ্বেশ্বরী মাগো! তুমি বিশ্বধরী,
মোর প্রতি সুপ্রসন্ন হও মা শঙ্করি!
তুমিই এ ত্রিসংসারে একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাই আর!
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
তুমি পূর্ণশক্তি, তুমি দেবতা-নিকর!
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তোমার যখন
চরিত্র বর্ণিতে নাহি পারে কদাচন,
তখন অধম আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া!

(২)

ত্বং স্বাহাঽখিলদেবতৃপ্তিজনিকা পিত্রাদিষু ত্বং স্বধা
তৃপ্তেস্ত্বং জনিকা সদৈব জগতাং ত্বং দেবদেবাত্মিকা।
হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তথা দক্ষিণা
ত্বং স্বর্গাদিফলং সমস্তফলদে বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥

যাবতীয় দেবতার তৃপ্তির কারণ
যে আহুতি দেয় লোক অনলে যখন,

সেই পুণ্য হুতাহুতি, স্বাহা নাম যার,
তব নামান্তর বিনা কিছু নয় আর!
মৃত-পিতৃ-পুরুষের তৃপ্তির কারণ
পিণ্ড জল যাহা কিছু যে দেয় যখন,
সেই পুণ্য পিণ্ড জল, স্বধা যার নাম,
তব নামান্তর তাহা, সার বুঝিলাম!
তুমিই এ জগতের তৃপ্তির কারণ,
দেবদেব মহাদেব তব প্রাণধন।
তুমি হব্য, দেবলোক-তৃপ্তির কারণ,
তুমি কব্য, পিতৃলোক-তৃপ্তির সাধন।
তুমিই স্বয়ং যজ্ঞ, তুমিই দক্ষিণা,
স্বর্গাদি যা কিছু ফল, তোমারি কল্পনা।
ওমা সর্ব্ব-ফল-দাত্রি! ওমা বিশ্বেশ্বরি!
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি।

(৩)

রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎপরতরং যদ্‌ যোগিনো বিদ্যয়া
শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বিদন্তি পরমং মাতঃ সুগুপ্তং তব।
বাচাঽতীতিগমং মনোঽতিগমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে
ভক্ত্যাঽহং প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্‌॥

অতি সূক্ষ্মতম রূপ জননি! তোমার,
যাহা হ'তে শ্রেষ্ঠতর কিছু নাই আর;—
যোগবলে বলে যাকে যোগী সমুদয়
বিশুদ্ধ, সুগুপ্ত পুনঃ পূর্ণব্রহ্মময়।
বাক্য-অগোচর তুমি, চিত্ত-অগোচর,
তোমার "ত্রিলোক-বীজ" নাম নিরন্তর।
তুমি শিবময়ী, তুমি বর-প্রদায়িনী,
ভক্তিভরে নমি আমি তোমায় জননি!

বিপদে পড়েছি মাগো ! দুঃখে ফাটে প্রাণ,
ওমা বিশ্বেশ্বরি ! মোরে কর পরিত্রাণ !

(৪)

উদ্যৎসূর্য্যসহস্রভাং মম গৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া
দেবীমষ্টভুজাং বিশালনয়নাং বালেন্দুমৌলিং শুভাম্।
উদ্যৎকোটিশশাঙ্ককান্তিমমলাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং
ভক্ত্যাঽহং প্রণমামি বিশ্বজননীং দেবি প্রসীদাম্বিকে ॥

সহস্র উদীয়মান সূর্য্যের সমান
তোমার উজ্জ্বল কান্তি হয় অনুমান।
মোর ঘরে জন্ম নিলে করিয়া করুণা,
তুমি দেবী অষ্টভুজা, বিশাল-নয়না।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে তব কিবা শোভা ধরে,
পরম মঙ্গলময়ী তুমিই সংসারে।
আকাশেতে কোটী চন্দ্র হইলে উদয়,
তোমার কান্তির সনে তবে তুল্য হয়।
তুমি সুনির্ম্মলা বালা ত্রিনেত্র-ধারিণী,
একমাত্র শিবময়ী তুমিই জননি।
ওমা জগন্মাতঃ! আমি নমি ভক্তিভরে,
প্রসন্ন হও মা! সদা আমার উপরে!

(৫)

রূপং তে রজতাদ্রিসন্নিভমলং নাগেন্দ্রভূষোজ্জ্বলং
ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈ র্ভীমৈঃ সমুদ্ভাসিতম্।
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকং ধৃতজটাজূটং শরণ্যে শিবে
ভক্ত্যাঽহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে ॥

তোমার রূপের কথা কি বলিব আর,
রজত-পর্ব্বত সম শুভ্র অনিবার।

নাগেন্দ্র তোমার মাগো ভূষণ উজ্জ্বল,
তব শিরে রহে পঞ্চ বদন-কমল।
ভীষণ ত্রিনেত্র-মূর্ত্তি করেছ ধারণ,
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে তব শোভে সর্ব্বক্ষণ।
জটাভার ধরিয়াছ মস্তকে জননি!
তুমি শুভময়ী, তুমি আশ্রয়-দায়িনী।
ওমা জগন্মাতঃ! আমি নমি ভক্তিভরে,
প্রসন্ন হও মা! নিত্য আমার উপরে,

(৬)

রূপং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং
দিব্যৈরাভরণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
দিব্যৈর্বাহুচতুষ্টয়ৈঃ সুমিলিতং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ
পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিলব্রহ্মাদিদেবস্তুতে॥

তোমার রূপের ছটা নিত্য বিদ্যমান,
কোটী শরতের চন্দ্র ব'লে অনুমান।
পরম সুন্দর বস্ত্র কর মা ধারণ,
কিছুই সুন্দর নাই তোমার মতন!
দিব্য আভরণে তব শোভা অনিবার,
রূপের ছটায় তব ভুলে ত্রিসংসার।
ধারণ করেছ তুমি বাহু-চতুষ্টয়,
করে মা! তোমার পূজা দেবতা-নিচয়।
ভক্তিভরে পূজি তব চরণ-কমল,
মোর প্রতি তুষ্ট মাগো! হও অবিরল!

(৭)

রূপং তে নবনীরদদ্যুতিধরং ফুল্লাব্জনেত্রোজ্জ্বলং
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতম্।

বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিলসিতোরস্কং জগত্তারিণি
ভক্ত্যাঽহং প্রণতোঽস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে ॥

নবীন নীরদ সম তোমার বরণ,
প্রস্ফুটিত পদ্ম সম তোমার নয়ন।
ভুলায় তোমার কান্তি এই ত্রিসংসার,
মৃদু মন্দ হাস্য তব মুখে অনিবার।
রতন-কেয়ূরে তুমি শোভিছ সুন্দর,
বনমালা বক্ষে তব কিবা মনোহর।
রক্ষা করিতেছ তুমি এই ত্রিভুবন,
ভক্তিভরে পূজা করি তোমার চরণ।
করিয়া আমার প্রতি করুণা সদাই
সুপ্রসন্ন থাক মাগো! এই ভিক্ষা চাই!

(৮)

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মিকং
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগৈ র্দেবোঽথবা মানুষঃ।
যৎ কিং স্বল্পমতির্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈ র্গুণৈ
র্নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ ॥

কিবা দেব, কিবা নর, এই ত্রিসংসারে
যত্ন করিলেও যুগযুগান্তর ধ'রে,
তথাপি তোমার গুণ, বিশ্বরূপ আর
বর্ণন করিতে পারে হেন সাধ্য কার?
তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া!
নিজগুণে কৃপাবিন্দু করিয়া সঞ্চার
মায়াপাশে বদ্ধ মোরে করিও না আর।
মায়ার সমুদ্রে আছি মগ্ন অবিরাম,
ওমা বিশ্বেশ্বরি! তব চরণে প্রণাম!

(৯)

অদ্য মে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
যৎ ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বমুপাগতা॥

এতদিনে হলো মোর জনম সফল,
এতদিনে সিদ্ধ মোর তপস্যার ফল।
ত্রিজগন্মাতা তুমি আসি মোর ঘরে
কন্যা-রূপে জন্ম নিলে মোরে কৃপা ক'রে!

(১০)

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যশ্চ মাতস্ত্বং নিজলীলয়া।
নিত্যাপি মৎগৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ॥

ধন্য ধন্য ধন্য মাগো! জনম আমার,
সার্থক জীবন মোর, বুঝিলাম সার!
তাহা যদি না হবে মা! তবে কি কারণ
হইয়াও এ সংসারে তুমি নিত্য ধন,
লীলাচ্ছলে তুমি মোর কন্যারূপ ধরি
পিতা ব'লে ডাকিলে মা! মোরে কৃপা করি।

(১১)

কিং ব্রূমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতম্‌।
যতস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাঽভবত্তব॥

ধন্য ধন্য ধন্য মাগো! ভাগ্য মেনকার,
শতজন্মে কত পুণ্য ছিল মা! তাহার।
ত্রিজগন্মাতা হ'য়ে কন্যারূপ ধরি
মাতা ব'লে ডাকিলে মা! তারে কৃপা করি!

দুর্জ্জন-নিন্দা।

(১)

দুর্জ্জনং প্রথমং বন্দে সুজনং তদনন্তরম্।
মুখপ্রক্ষালনাৎ পূর্ব্বং গুহ্যপ্রক্ষালনং যথা॥

আগেই বন্দনা করি দুর্জ্জন-চরণ,
শেষে সুজনের পদ করিব বন্দন।
প্রমাণ দেখ না কেন, লোকে শৌচে গিয়া
আগে ধোয় গুহ্যদেশ মুখ পা ধুইয়া।

(২)

দুর্জ্জনঃ সুজনো ন স্যাদুপায়ানাং শতৈরপি।
অপানং মৃৎসহস্রেণ ধৌতং চাস্যং কথং ভবেৎ॥

করুক যতই চেষ্টা লোকে সর্ব্বক্ষণ,
তথাপি দুর্জ্জন কভু না হয় সুজন।
হাজার লাগাও মাটী মার্গেতে লেপিয়া,
যে মার্গ সে মার্গ রয়, মুখ না হইয়া!

(৩)

খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।
দশাননোঽহরৎ সীতাং বন্ধনন্তু মহোদধেঃ॥

দুর্জ্জন করিবে দোষ, একি সর্ব্বনাশ!
কুফল তাহার সাধু ভোগে বারমাস!
সীতারে করিল চুরি দুষ্ট দশানন,
সমুদ্রের ভাগ্যে কিন্তু ঘটিল বন্ধন!

(৪)

নিক্ষাতোঽপি চ বেদান্তে সাধুত্বং নৈতি দুর্জ্জনঃ।
চিরং জলনিধৌ মগ্নো মৈনাক ইব মার্দবম্॥

যতই বেদান্ত পাঠ করুক দুর্জ্জন,
তথাপি কিছুতে সে না হইবে সুজন।
হায় রে মৈনাক গিরি সমুদ্র ভিতরে
ডুবিয়া রয়েছে দেখ চিরদিন ধ'রে;
কিন্তু মনে ভেবে দেখ তুমি অবিরল,
কিছুতেই কভু তাহা না হ'লো কোমল!

(৫)

ন বিনা পরবাদেন রমতে দুর্জ্জনো জনঃ।
শ্বা হি সর্ব্বরসান্ ভুক্ত্বা বিনা মেধ্যং ন তৃপ্যতি॥

পরনিন্দা বিনা আর যেজন দুর্জ্জন
কিছুতেই মনে সুখ না পায় কখন।
কুকুর সুমিষ্ট দ্রব্য করে পরিহার,
বিষ্ঠা খাইলেই কিন্তু তৃপ্তি হয় তার!

(৬)

নিমিত্তমুদ্দিশ্য হি যঃ প্রকুপ্যতি ধ্রুবং স তস্যাপগমে প্রসীদতি।
অকারণদ্বেষি মনোহস্তি যস্য বৈ কথং জনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি॥

কারণ দেখিলে তবে ক্রোধ যার হয়,
সে কারণ গেলে, তাহা নাহি আর রয়।
নাহি যার কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ,
অথচ যদ্যপি ক্রোধ করে সেই জন,
হেন জন কেবা কোথা রয় এসংসারে,
যেজন তাহারে তুষ্ট করিতে বা পারে!

(৭)

সংবর্দ্ধিতোহপি ভুজগঃ পয়সা ন বশ্য
স্তৎপালকানপি নিহন্তি বলেন সিংহঃ।
দুষ্টঃ পরৈরুপকৃতস্তদনিষ্টকারী
বিশ্বাসলেশ ইহ নৈব বুধৈর্বিধেয়ঃ॥

দুধ দিয়া সর্পে তুমি করহ পালন,
তবু সে তোমার বশে না আসে কখন।
সিংহকে পালন কর পুষিয়া তাহায়,
তবু সে তোমারে খাবে বাগে যদি পায়।
দুর্জনের উপকার করে যেই জন,
তাহারি অনিষ্ট করে দুর্জন তখন।
যেই জন বুদ্ধিমান্ হয় এ সংসারে,
সেজন কারেও যেন বিশ্বাস না করে!

(৮)

অকরুণত্বমকারণবিগ্রহঃ পরধনে পরযোষিতি চ স্পৃহা।
সুজনবন্ধুজনেষ্বসহিষ্ণুতা প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি দুরাত্মনাম্॥

কিছুমাত্র দয়া মায়া কভু না রাখিবে;
কারণ না থাকিলেও বিবাদ করিবে,
দেখিলে পরের ধন নিতে ইচ্ছা যায়,
দেখিলে পরের নারী ইচ্ছা করে তায়,
কিবা সাধু জন, কিবা নিজ বন্ধু জন
কারো প্রতি সহ্য গুণ না রাখে কখন;
যেজন পরম দুষ্ট এ সংসারে হয়,
হাড়ে হাড়ে এই সব দোষ তার রয়!

(৯)

গজতুরগশতৈঃ প্রযান্তু মূর্খা ধনরহিতা বিবুধা প্রযান্তু পদ্ভ্যাম্।
গিরিশিখরগতাপি কাকপালী পুলিনগতৈর্ন সমেতি রাজহংসৈঃ॥

হাতী ঘোড়া চড়িয়াও যথায় তথায়
গমন করুক মূর্খ সুখ কিবা তায়?
দরিদ্র পণ্ডিত যদি পায়ে হেঁটে যান,
তবু তাঁর তাহে সুখ, হেন অনুমান।

কাক যদি ব'সে রয় পর্ব্বত-শিখরে,
তবু তার "কাক" নাম চিরদিন ধ'রে।
চড়াতেও রাজহংস যদি করে বাস,
তবু তার "রাজহংস" নাম বারমাস।
একবার ভেবে দেখ তুমি মনে মনে,
কাকের তুলনা হয় রাজহংস সনে?

(১০)

প্রায়ঃ স্বভাবমলিনো মহতাং সমীপে
তিষ্ঠন্ খলঃ প্রকুরুতেঽর্থিজনোপঘাতম্।
শীতার্দ্দিতৈঃ সকললোকসুখাবহোঽপি
ধূমে স্থিতে নহি সুখেন নিষেব্যতেঽগ্নিঃ॥

মলিন-স্বভাব যার সেই খল জন
মহৎ লোকের কাছে থাকি সর্ব্বক্ষণ,
খারাপ করিয়া দিয়া কাণ দুটী তার,
ভিক্ষুক জনের কত করে অপকার।
আগুণ পোহায়ে সুখ শীতের সময়,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যদি ধূম তথা রয়,
সে আগুণ পোহাইয়া শীতার্ত্ত যেজন,
কিছু মাত্র সুখ নাহি পাইবে তখন!

(১১)

ধূমঃ পয়োধরপদং কথমপ্যবাপ্য বর্ষাম্বুভিঃ শময়তি জ্বলনস্য তেজঃ।
দৈবাদবাপ্য কলুষপ্রকৃতি র্মহত্ত্বং প্রায়ঃ স্ববন্ধুজনমেব তিরস্করোতি॥

অগ্নি হ'তে যত ধূম উঠিয়া গগনে
মেঘরূপে জন্ম লয়, জানে সর্ব্বজনে।

তার পর সেই মেঘ ঘোর বৃষ্টি দিয়া
সেই অগ্নিকেই দেয় নির্ব্বাণ করিয়া।
যে জনের স্বভাবতঃ অতি ক্ষুদ্র মন,
পায় যদি উচ্চপদ কভু সেই জন,
অমনি নিজের শক্তি করিয়া বিস্তার,
সর্ব্বনাশ ক'রে দেয় আত্মীয় জনার!

(২২)

বন্দ্যান্নিন্দতি দুঃখিতানুপহসত্যাবাধতে বান্ধবান্
শূরান্ দ্বেষ্টি ধনচ্যুতান্ পরিভবত্যাজ্ঞাপয়ত্যাশ্রিতান্।
গুহ্যানি প্রকটীকরোতি ঘটয়ন্ যত্নেন বৈরাশয়ং
ব্রূতে শীঘ্রমবাচ্যমুজ্ঝতি গুণান্ গৃহ্ণাতি দোষান্ খলঃ॥

পূজ্য জনে নিন্দা করে দুষ্ট বারমাস,
দুঃখীর দেখিয়া দুঃখ করে উপহাস,
বন্ধুর উপরে দেয় বিপত্তি অশেষ,
সাহসী লোকেরে দেখি ক'রে থাকে দ্বেষ;
পূর্ব্বে ধনী ছিল, কিন্তু ধন গেছে সব,
এ হেন লোকেরে দেখি করে পরাভব।
জুলুম করিবে তারে যেজন আশ্রিত,
প্রকাশ করিয়া দিবে গুপ্ত কথা যত।
পথের ঝগড়া কিনে ল'য়ে আসে ঘরে,
অবাচ্যও যাহা তাহা মুখ হ'তে সরে,
গুণ দেখিলেও তাহা না বলে কখন,
দোষ পাইলেই কিন্তু হন্ পঞ্চানন!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে বি, এ।

২৬।২ বৃন্দাবন পালের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।